NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EPA

PAPER V
MODULES 17-20

ELECTIVE PUBLIC
ADMINISTRATION
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয় পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক জন-প্রশাসন (পঞ্চম পত্র), সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এ. — ১৭

রচনা
অধ্যাপিকা সোমা ঘোষ

সম্পাদনা
অধ্যাপক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এ. —১৮

রচনা
অধ্যাপিকা সোমা ঘোষ

সম্পাদনা
অধ্যাপক অমিয় চৌধুরী

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এ. —১৯

রচনা
অধ্যাপিকা সর্বানী গুহ ঘোষাল

সম্পাদনা
অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ই. পি. এ. —২০

রচনা
অধ্যাপিকা মৈত্রেয়ী বর্দ্ধন রায়

সম্পাদনা
অধ্যাপক অমিয় চৌধুরী

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ই. পি. এ. —5

জন-প্রশাসনের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়

17

একক	1	মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রেক্ষিতে কর্মীগোষ্ঠীর প্রকৃতি ও গুরুত্ব	**7 - 15**
একক	2	কর্মীব্যবস্থাপনার গঠন ও কাঠামো	**16 - 35**
একক	3	কর্মীব্যবস্থাসমূহের ভিত্তিসমূহ	**36 - 51**
একক	4	ভারতবর্ষে কর্মীব্যবস্থার বিকাশ ও প্রকৃতি	**52 - 68**

পর্যায়

18

একক	1	কর্মীব্যবস্থার বিকাশ ঃ ভারতে কর্মীব্যবস্থা	**70 - 82**
একক	2	কর্মী নিয়োগ ঃ স্বতন্ত্র নিয়োগকারী সংস্থা	**83 - 90**
একক	3	প্রশিক্ষণ ও কর্মী উন্নয়ন	**91 - 99**
একক	4	কর্মীব্যবস্থা—সাংগঠনিক কাঠামো	**100 - 116**

পর্যায়

19

একক 1 কর্মস্পৃহা ঃ সংগঠনের প্রেক্ষিতে কর্মস্পৃহার তাৎপর্য্য 118 - 124

একক 2 সাংগঠনিক অভিযোগ ঃ অভিযোগ প্রতিকারের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াসমূহ 125 -130

একক 3 কর্মী কর্তৃপক্ষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা ঃ ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ 131-135

একক 4 ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ—কর্মী কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক উন্নয়ন সংক্রান্ত 136 -141

পর্যায়

20

একক 1 অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ এবং ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনুশাসন ও দায়বদ্ধতার নীতি 143 -155

একক 2 শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা 156 -166

একক 3 কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ 167 -178

একক ১ ☐ মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রেক্ষিতে কর্মীগোষ্ঠীর প্রকৃতি ও গুরুত্ব

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ আধুনিক রাষ্ট্রকৃত্যক ও কর্মীব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১.৩ কর্মীব্যবস্থাপনার লক্ষ্য
১.৪ সারাংশ
১.৫ অনুশীলনী
১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনারা জানতে পারবেন আধুনিক রাষ্ট্রকৃত্যকে কর্মীব্যবস্থাপনার গুরুত্ব কতখানি।

রাষ্ট্রকৃত্যকীয় কর্মীদের প্রধান দায়িত্ব হল সরকারি নীতিকে কার্যে পরিণত করা। জটিল আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল কর্মী এই কঠিন কাজে ব্যাপৃত হবেন তাঁদের যোগ্যতা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি সুনিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। স্থায়ী কৃত্যকই হল প্রশাসনের কেন্দ্রীয় শক্তি। উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি, সংস্কার ও সামাজিক সেবাকার্যে রাষ্ট্রকৃত্যকের একটি গঠনশীল ভূমিকাও উল্লেখের দাবি রাখে। এখানে প্রশাসনিক কর্মচারী একদিকে সংস্কারক ও অন্যদিকে সংগঠক। বাজার অর্থনীতি ও বৈদ্যুতিন (electronic) প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান চাপ রাষ্ট্রকৃত্যকের সামনে বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থিত। সুতরাং কর্মীব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে কর্মীব্যবস্থাপনার এই গুরুত্বই এই অংশের আলোচ্য বিষয়সূচি।

১.১ প্রস্তাবনা

প্রশাসন শব্দটি একটি সার্বিক ভাবে প্রযোজ্য জটিল ধারণা। ইংরাজি 'administer' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন 'ad' এবং 'ministrare' শব্দদুটি থেকে, যার বুৎপত্তিগত অর্থ হল 'সাহায্যার্থে' বা সুবিধার্থে কাজ করা। ফলে প্রশাসনের অর্থকে এল. ডি. হোয়াইটের ভাষায় এই ভাবে বলা যায়—'প্রশাসন হ'ল কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য বহু কর্মীকে নির্দেশ প্রদান, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ'। এই অর্থে প্রশাসন কোনও অবস্থাতেই একক কর্মপ্রচেষ্টা নয়। সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু পরিচালনাই প্রশাসন। ব্যক্তির জ্ঞান, উদ্যম কৌশল, প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা, নিষ্ঠা, কর্মপ্রয়াস প্রভৃতি প্রশাসনের কার্যকারিতাকে সুনিশ্চিত করে।

উন্নত, উন্নয়নশীল, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সকল রাষ্ট্রেই প্রশাসনের নিজস্ব গতিপ্রকৃতি আছে এবং কোনো ক্ষেত্রেই প্রশাসনের গুরুত্ব কম নয়। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কাজ এত বহুমুখী যে প্রশাসনের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা ও গুণগত মান ও যোগ্যতা নিয়ে নিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ সৃষ্টি হচ্ছে। এই কারণেই কর্মীদের ব্যবস্থাপনার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম আলোচনা পাঠ্যসুচির অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই অনুভূত হয়েছে। এর ফলে একদিকে ভবিষ্যৎ প্রশাসককে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে এবং অন্যদিকে শিক্ষিত জনমানসে প্রশাসনের নানান দিক সম্বন্ধে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে উঠবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রশাসন সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা নিজের দেশের পরিস্থিতির গুণাগুণ বিচারে সহায়ক হবে। এই কারণেই কর্মী-পরিচালনা এই জনপ্রশাসন পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১.২ আধুনিক রাষ্ট্রকৃত্যক ও কর্মীব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, পশাসন প্রভৃতি শব্দগুলি নিছক বিমূর্ত ধারণার প্রতিফলন। এই শব্দগুলি সচলতা লাভ করে এমন কিছু ব্যক্তির স্পর্শে যারা সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবে মূর্ত করে তোলে। যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রেক্ষিতে চিন্তা করা যায়, তাহলে এই সকল ব্যক্তিদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—একদিকে থাকেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যাঁরা সক্রিয় ভাবে সরকার গঠন করেন এবং অন্যদিকে থাকেন সেই সকল স্থায়ী কর্মীবৃন্দ যাঁরা তাদের নিরলস কর্মকাণ্ডের দ্বারা সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করেন। গণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট বা অকমিউনিস্ট কিংবা ফ্যাসিস্ট—কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই এই কর্মীবৃন্দের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এঁরা সম্মিলিত ভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অরাজনৈতিক অংশ বলে চিহ্নিত হন এবং এঁরা যে কোনও সংগঠনের হৃদয়স্বরূপ। সাবেক প্রশাসন যন্ত্রই হোক বা ই-গভর্ন্যান্স তথা অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দ্বারা পরিচালিত সরকারই হোক এই স্থায়ী কর্মীবৃন্দের গুরুত্ব কমবেশি অনস্বীকার্য। এঁদের দক্ষতা ও কার্যকারিতার ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতা। কট্টর মার্কসীয় সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা যদি সম্ভবও হয়, তাহলেও এই কর্মীবৃন্দকে বাদ দিয়ে প্রশাসন বা সংগঠন পরিচালনা করা যাবে না।

বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বে সর্বপ্রথম কর্মীব্যবস্থাপনার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ফ্রেডেরিক টেলর (Frederick Taylor) প্রথম সক্রিয় ভাবে স্বীকার করেন যে সংগঠনের মুল চালিকাশক্তি হল মানুষ। সুষ্ঠ মানব সম্পর্ক যে সংগঠনের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করতে পারে তা তাঁর কার্যকারী তত্ত্বাবধায়কতা বা functional foremanship এর ধারণা থেকে বোঝা যায়। একটি সংগঠনের মধ্যে কর্মরত ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত কর্মীদের মধে মানবিক সম্পর্ক নির্ধারণের ভিত্তিতে সংগঠনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করাই কর্মীব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। পরামর্শদাতার ভূমিকায় কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব প্রথম উপলুব্ধ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আচরণবাদী বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে যেসব আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা শিল্প সম্পর্কে গবেষণায়

রত তাঁরাও কর্মীব্যবস্থাপনার ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উপযোগিতাবাদী অর্থনীতি তথা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত সংগঠনেও কর্মীব্যবস্থাপনা যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। প্রত্যেক কর্মী কর্মদক্ষতার যথাযথ ব্যবহার করায় মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মীদের সর্বাধিক কার্যকরী অবদানকে সুনিশ্চিত করায় কর্মীব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। সুযোগ্য কর্মীব্যবস্থাপনা মানবসম্পদ ও বস্তু সম্পদের অপচয় রোধ করে সংগঠনের উদ্দেশ্য পুরণের সহায়ক হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থায়ী রাষ্ট্রকৃত্যকের গুরুত্ব অপরিসীম। কর্মীব্যবস্থাপনায়ও স্থায়ী প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পন্ন রাষ্ট্রকৃত্যকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রকৃত্যকের দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে কর্মীব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নতুন তালিকা সংযোজিত হয়েছে। সাধারণ কর্মী ও বিশেষজ্ঞ কর্মী উভয়ের গুরুত্বই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হারমান ফাইনার (Herman Finer) পেশাদারী, স্থায়ী, বেতনভোগী ও দক্ষ রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—প্রশাসনিক, কৌশলগত বা প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক কর্মীমণ্ডলী। প্রশাসনিক কর্মীরা নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে সহায়তা করেন। প্রয়োগিক কর্মীগণ যেমন—চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক প্রমুখেরা বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব পালন করেন। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যবহারিক কর্মীগণ প্রথম দুই শ্রেণীর দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত বাস্তবে প্রয়োগ করেন। এই সুবিশাল কার্যভার যথাযথ ভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য যোগ্য কর্মীমণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই কর্মীমণ্ডলী যাতে নিরপেক্ষ, প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পন্ন, অরাজনৈতিক ও সামাজিক পরিষেবার উপযুক্ত হয়, সেই কারণে এদের নিয়োগে সবিশেষ যত্নবান হওয়া দরকার।

প্রাচীন চীন, ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষে রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থার কিছু সাবেকি ঐতিহ্য পরিলক্ষিত হলেও চাকুরি হিসাবে রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থার বিকাশ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিকতম ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ও ওই শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও স্থায়ী রাষ্ট্রকৃত্যকে দেখা যায়নি। ইংল্যাণ্ডে পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থা (Patronage System) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Spoils System অর্থাৎ জয়ী রাজনৈতিক দলের অনুগত সদস্যদের কৃত্যকে নিয়োগের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই দুটি ব্যবস্থাতেই উন্নতিমূলক উপজীবিকা বা পেশা (career) হিসাবে কৃত্যকের ধারণা বিকশিত হয়নি।

এল. ডি. হোয়াইট (L. D. White) তাঁর The Civil Service in the Modern State[2] বইতে উল্লেখ করেছেন যে ফ্রান্সে রিশলিউঁ (Great Elector) ইংল্যাণ্ডে অষ্টম হেনরি ও প্রথম এলিজাবেথ, প্রাশিয়ায় গ্রেট ইলেকটর (Great Elector) প্রমুখরা রাষ্ট্র, দপ্তর, পৌরজীবন, স্থায়ী কর্মচারী প্রভৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার পূর্ণবিকাশ ঘটান। ড. হারমান ফাইনার তাঁর Theory and Practice of Modern Government[3] গ্রন্থে বলেন যে, পেশাদারী রাষ্ট্রকৃত্যকে গড়ে ওঠার পশ্চাতে কতকগুলি নীতির বিকাশকে দায়ী করা যেতে পারে। মনে করা হয় যে, এই নীতিগুলি ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা অসম্ভব এবং রাষ্ট্রকৃত্যদের পেশাদারিত্ব ব্যতিরেকে এই নীতিগুলির বাস্তবায়ন অসম্ভব। এই নীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বিশেষীকরণ, শ্রম বিভাজন, যোগ্যতার ভিত্তিতে কৃত্যকে নিয়োগ ইত্যাদি।

রাষ্ট্রের ইচ্ছার বাস্তব প্রয়োগ ঘটে রাষ্ট্রকৃত্যকের মাধ্যমে। ফেলিক্স নিগ্রোর (Felix Negro) ভাষায় 'The relationship between good adminstration and high quality personnel is by no means a discovery of the modern age.' (ভালো প্রাশাসন এবং উচ্চ উৎকর্ষবিশিষ্ট কর্মীদের সম্পর্ক কোনোভাবেই আধুনিক যুগের আবিষ্কার নয়।) কর্মীবৃন্দের দক্ষতার ওপর প্রশাসনের দক্ষতা নির্ভর করে। বর্তমানের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জননীতির যথাযোগ্য বাস্তবায়নের জন্য এই কর্মীবৃন্দের অবদান অনস্বীকার্য। পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি, যোগাযোগ, সমন্বয়, প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক, এমনকী সামাজিক কর্মধারাকেও সচল রাখে এই স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিগ্রো বলেন যে 'Personnel administration is the art of selecting new employees and making use of old ones in such a manner that the maximum quality and quantity of output and service are obtained from the working force,'[4] অর্থাৎ যোগ্যকর্মী নিয়োগ ও তাদের গুণগত মান বজায় রাখা কর্মীব্যবস্থাপনার দায়িত্ব।

N. Joseph Cayer তাঁর Public Persoanel Administration in the United States (1986) বইতে বলেছেন, কর্মীব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহে কর্মরত মানুষদের সম্পর্কে সকল কার্যকলাপকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এটা যতখানি সম্ভব দক্ষ বা কার্যকরীভাবে সংগঠনের মানবসম্পদগুলিকে উপযোজিত বা ব্যবহার করাকে বোঝায়। কর্মীব্যবস্থাপকদের জানতে হবে কেমন করে কর্মচারীদের নিয়োগ, নির্বাচন মূল্যায়ন, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলাবদ্ধকরণ ইত্যাদি করা যাবে। কর্মীদের অনুপ্রেরিত করায়, তাঁদের পরামর্শ দেওয়ায়, তাঁদের সঙ্গে দরকষাকষি করায় তাঁদের নিপুণ হতে হবে। এর সঙ্গেই তাঁদের বিভিন্ন পদকে শ্রেণী বিভাজিত করতে, বেতন পরিকল্পনা তৈরি করতে, উৎপাদনশীলতা মাপতে এবং অভাব-অভিযোগের মোকাবিলা করতে জানতে হবে। এক কথায় কর্মীব্যবস্থাপনার মধ্যে পড়ে সংগঠনের মানবিক সম্পদগুলিকে সামলানোর সবদিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মীব্যবস্থাপনা উল্লেখ করে সরাকরি সংস্থাসমূহের মধ্যে সেই কাজটির (In short personnel administration involves all aspects of managing the organizations human resources, and public personnel administration requires to that function in governmental entities.)।

প্রায় একইভাবে Steven W. Hays এবং T. Zane Reeves তাঁদের Personnel Management in the Public Sector (1984) বইতে বলেছেন যে এক অর্থে কর্মীপরিচালনা ক্রিয়ার কোনো সীমানা নেই। সব লোক যাঁরা ব্যবস্থাপনায় নিরত হন তাঁরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কর্মীপরিচালনা প্রক্রিয়ার মধ্যেও জড়িয়ে পড়েন। একইভাবে অন্য সব ব্যবস্থাপনার কাজই কোনো না কোনো ভাবে কর্মীপরিচালনব্যবস্থার কার্যকরী সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। Simon, Smithburg এবং Thompson একইভাবে বলেছিলেন "In a broad sense since all administration is concerned with people and their behaviour, all administration might be described as personnel administration—and some specialists in personnel work would like to use this broad defini :on of their speciality."

আবার 1920 সালে কর্মীপরিচালনা তত্ত্বের দুই পথিকৃৎ Tead এবং Metcayr বলেছিলেন কর্মীপরিচালনা বা কর্মীপ্রশাসন হ'ল কোনো সংগঠনের মানবিক সম্পদগুলিকে এমন দিশা দেওয়া যাতে সাধারণ কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখার সঙ্গে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

উপরের তিনটি বক্তব্য থেকেই সংগঠনে কর্মীব্যবস্থাপনার ব্যাপকতা, কেন্দ্রীয়তা এবং গুরুত্বের আভাস পাওয়া যায়।

উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ব্যবস্থাতেই রাষ্ট্রের বর্ধিত কর্মভার ও দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রকৃত্যকের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কাজের জন্য দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন বলে অনুভূত হয়েছে, তেমনি পেশাদারিত্ব, সংগঠনের প্রতি আনুগত্য, কর্মীর সততা ও নিরপেক্ষতার প্রশ্নগুলিও বিবেচিত হতে শুরু করেছে। অতঃপর কর্মীব্যবস্থাপনার (Personnel Administration) তাৎপর্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপযুক্ত কর্মীদের দ্বারা, সংগঠনের উৎপাদন ও পরিষেবার মান উন্নত করার লক্ষ্যে কর্মীব্যবস্থাপনায় নতুন চিন্তাভাবনার সংযোজন ঘটেছে।

কর্মীব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে অন্যতম হল নিয়োগ, বিভিন্ন কৃত্যকের শ্রেণী বিভাজন করা ও তদনুসারে নিয়োগের ব্যবস্থা করা, কর্মীদের পদোন্নতি, কর্মী প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, বেতন কাঠামো নির্ধারণ, কর্মীদের চাকরির অন্যান্য শর্ত পূরণের ব্যবস্থা করা, তাদের ছুটি, কাজের সর্বাধিক সময় নির্ধারণ, তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, কর্মী শৃঙ্খলা রক্ষা করা, কর্মীদের কাছে শ্রমনীতি ব্যাখ্যা করা, শ্রমিকসংঘের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা, শ্রমিক অসন্তোষ মীমাংসা করা, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ইত্যাদি।

নিয়োগের প্রথম পর্যায় হল মানবসম্পদের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ। একটি সংগঠনের চাহিদার পরিমাপ করতে গেলে সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। 1960-এর দশক থেকে ব্যক্তির জন্য কাজের সীমা নির্দিষ্টকরণ এবং ব্যক্তিকে উক্ত কাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্য মানবসম্পদ পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংগঠনের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সঠিক জায়গায়, সঠিক সময়ে সঠিক কর্মী নির্বাচন, নতুন নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতির মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ কর্মীব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম গুরুদায়িত্ব এবং এই কারণেই মানবসম্পদ পরিকল্পনার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়ে থাকে। 'Manpower Planning is the process by which an organisation ensures that it has the right number of people and the right kind of people at the right places, at the right time, doing things for which they are economically most useful.'[5] যে পরিকল্পনার মাধ্যমে যথা সময়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে সঠিক সংখ্যায় যথার্থ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়, তাকে মানবসম্পদ পরিকল্পনা বলা হয়।

ভোগবাদী অর্থনীতি বিশ্বায়নের নবরূপায়নের ফসে নিজেও নবকলেবর ধারণ করেছে। ভোগবাদ কেবল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকেই নয়, উন্নত পশ্চিমি রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে বাধ্য করেছে। বে-সরকারি উদ্যোগ সর্বত্রই পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সমাদৃত হতে শুরু করেছে। এই সঙ্গেই রয়েছে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেলের জয় জয়কার। অটোমেশন কর্মীব্যবস্থাপনায় একটি নতুন সংকটের সৃষ্টি করেছে। উদ্বৃত্ত শ্রমিক ও কর্মী দক্ষ ও মিতব্যয়ী পরিচালনার (efficient and economic) পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অবসর প্রদান, অনিয়মিত ও অংশকালীন কর্মী (casual & part time) ছাঁটাই, কর্মী নিয়োগ বন্ধ রাখা প্রভৃতির ওপর মানবসম্পদ পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাজের মূল্যায়ণ তথা কার্যকরী অবদান (effective output) পরিমাপের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। নিয়োগের প্রাক্কালে যে দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়, কর্মরত অবস্থায় সেই দক্ষতা যাতে বৃদ্ধি পেয়ে সংগঠনের মুনাফা বৃদ্ধির সহায়ক হয়, তার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের কথা ভাবা হচ্ছে। দক্ষতা ও কার্যকারিতা (efficiency and effectiveness) উভয়েই এই পরিকল্পনায় সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব কর্মীব্যবস্থাপনার ওপর অর্পিত থাকে। অদূর ভবিষ্যতে সংগঠন কি ধরনের কাজ করতে চলেছে, কি ধরনের কৃৎকৌশল ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কোন্ দিকে প্রবাহিত হতে পারে, সংগঠনের আর্থিক অবস্থা কিরূপ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা ও সূদুর প্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মানবসম্পদ পরিকল্পনার রূপায়ণও কর্মীব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুদায়িত্ব।

এর পরবর্তী পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থীকে আকৃষ্ট করা, তাদের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় প্রার্থী নির্বাচন ও উপযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠা করার গুরুদায়িত্ব কর্মীব্যবস্থাপক গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষি অর্থনীতি বা মার্কসীয় পরিভাষায় সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কিছু জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের হাত ধরে আসে রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ। জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান ইউরোপের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে জটিলতা বৃদ্ধি করে। যুক্তিবাদী বুর্জোয়া শ্রেণী প্রশাসনিক দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে দক্ষ প্রশাসন যন্ত্রের কথা ভাবতে শুরু করে। টেলরের ফোরম্যান, ওয়েবারের আমলাতন্ত্র, রিগসের সালাক্রেসি প্রভৃতি ক্রমে তাদের সংকীর্ণ পরিসর অতিক্রম করে বিস্তৃত রাষ্ট্রকৃত্যকের রূপ পরিগ্রহ করে।

রাষ্ট্র ও বৃহদায়তন সংগঠনের কাজের জটিলতা, পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক ও কলাকৌশলগত মান বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত ও দক্ষ কর্মীকে মেধা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করার প্রশ্নটি প্রাধান্য পায়। কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যাতে পৃষ্ঠপোষকতা বা স্বজন পোষণের নীতি প্রাধান্য না পায় সেই জন্য কর্মীব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির কথা ভাবা হয়। কর্মীব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যে সংস্থা যুক্ত তার সদস্যরা যাতে সততা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথা চিন্তা করা হয়। অতঃপর প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতে কর্মীব্যবস্থাপনার সঞ্চালনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১.৩ কর্মীব্যবস্থাপনার লক্ষ্য

- কৃত্যকের কর্মচারীদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা, আনুগত্য ও দায়বদ্ধতা বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করা।
- যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ ও তাদের অবস্থান চিহ্নিত করা।
- কর্মীদের জন্য কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি।
- বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে কর্মীদের সচেতন করা ও সমস্যার সমাধানের জন্য উপযুক্ত মানসিকতা তৈরি করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- কর্মীব্যবস্থাপনায় কৌশলগত মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ।
- বিভিন্নস্তরের কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়।
- কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন ও প্রয়োজনে পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা করা।

এই গুরুদায়িত্বের কথা মাথায় রেখে কর্মীব্যবস্থাপনায় কর্মরত পরিচালক ও তত্ত্বধায়কের বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের কথা অনেক দেশেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। শুধুমাত্র কৌশলগত জ্ঞান বৃদ্ধিই নয়, কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলাও এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য। রাষ্ট্রকৃত্যদের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যও কর্মকুশলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মীব্যবস্থাপনায়ও দক্ষতা বৃদ্ধির কথা ভাবা হয়েছে এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অমানবিক, অগণতান্ত্রিক, অনুভূতিহীন যান্ত্রিক সংগঠনের পরিবর্তে সংস্কারমুখী, গণতান্ত্রিক, মানবিক ও কল্যাণকামী সংগঠন গড়ে তোলাই কর্মীব্যবস্থাপনার বর্তমান উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যেই সর্বস্তরে গণমুখী প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

১.৪ সারাংশ

আধুনিক সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও কাজের চাপ সরকারি প্রশাসনে নিত্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহায়তায় এই সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমাধানের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশাসক ও কর্মচারীর। উন্নতমানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দ্বারা পরিচালিত, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, কর্তব্যপরায়ন, দায়িত্বশীল ও অনুগত কর্মীবৃন্দ উদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মীব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বেতন কাঠামো সুপারিশ, কাজের মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ে সদাসতর্ক দৃষ্টি রেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কর্মীব্যবস্থাপনাতেও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ফিফনার প্রেসথাসের (Fifner and Presthus) ভাষায়—'The emphasis will be not only on finding, but on building men who are capable of performing the complex tasks of co-ordinating institution growing even more complex অর্থাৎ, কর্মীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জটিল প্রশাসনিক চাহিদা পুরণ করা এই মুহূর্তে কর্মীব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

১.৫ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কর্মীব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২। কর্মীব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৩। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থায়ী প্রশাসনিক কর্মীর ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

৪। সুদক্ষ ও কার্যকরী প্রশাসনিক কাঠামো গঠনে কর্মীব্যবস্থাপনার ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। মানবসম্পদ পরিকল্পনায় কর্মীব্যবস্থাপনার ভূমিকা কী?

২। আমাদের সংগতি রেখে কর্মীব্যবস্থার প্রকৃতি ও গুরুত্ব কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

৩। কর্মীব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন কেন?

৪। কর্মীব্যবস্থাপনার দায়িত্বগুলি সম্বন্ধে একটি টীকা লিখুন।

বোধমূলক/নৈর্ব্যক্তিক

১। কার্যকরী তত্ত্বাবধায়কের ধারণার স্রষ্টা কে?

২। কর্মীব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্বগুলি কী কী?

৩। মানবসম্পদ পরিকল্পনা বলতে কী বোঝেন।

৪। সুযোগ্য কর্মীব্যবস্থাপনার উপযোগিতা কী?

৫। এইচ. ফাইনার কর্মীদের যে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন তার উল্লেখ করুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1. White, L. D. *Introduction to the Study of Public Administration,* referred from Bhambhri, C. P., *Public Administration, Theory and Practice,* p. 6.

2. White, L. D., *The Civil Service in the Modern State,* p. 11.

3. Finer, Herman, *Theory and practice of Modern Gvoernment,* p. 172.

4. Nigro, F., *Public Personnel Administration,* p. 197.

5. ভট্টাচার্য, মোহিত, *জন প্রশাসন,* p. 168

6. Pfiffner and Presthus, *Public Administration*, p. 294, referred from Basu Rumki, *Public Administration,* (Concepts and Theories), p. 299.

7. Cayer, N. Joseph, *Public Personnel Administration in the United States* (New York). St. Martins, 1986). p. 1.

8. Hays, Steven W., and Reeves, T. Zane : *Personnel Management in the Public Sector* (Baston : Allyn and Bacon, 1984). p. 73.

9. Tead, Ordway and Metcafe, Henry C., *Personnel Administration* (1920), as quoted by Leonard D. White in *Classic of Public Personnel Policy,* by Ed. Frank. J. Thompson (Oak Park, Ill. Moore, 1979), p. 28

10. Simon, Herbert A., Smithburg, Donal W., and Thompson, Victor A., Public Administration (New Yourk : Knopf, 1950), p. 312.

একক ২ ❑ কর্মী ব্যবস্থাপনার গঠন ও কাঠামো

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ বৃত্তি তথা উন্নতিমূলক উপজীবিকা হিসাবে রাষ্ট্রকৃত্যক
২.৩ শ্রেণীবিভাজন—সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
২.৩.১ কর্মী ব্যবস্থাপনায় শ্রেণী বিভাগের গুরুত্ব
২.৪ ক্ষতিপূরণ
২.৪.১ বেতন ও ভাতা
২.৪.২ পদোন্নতি
২.৫ সারাংশ
২.৬ অনুশীলনী
২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককে আপনারা কর্মী ব্যবহার, গঠন, কাঠামো এবং উপাদানগুলি সম্পর্কে জানবেন।

এই অংশের আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে লুথার গুলিকের সংগঠন সম্বন্ধে ধারনার মাধ্যমে। তাঁর মতে 'Organisation is the formal structure of authority through which work sub-divisions are arranged, defined and co-ordinated for the defined objectives'.[1] সংগঠনে বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে যোগসূত্র রচিত হয়, যারা প্রতিনিয়ত সংগঠনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিরলস দায়িত্ব পালন করে চলেছে। রাষ্ট্রও এরূপ একটি সংগঠন যা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মানবসম্পদ ও বস্তু সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে বিশ্বায়ন ও উদারনৈতিকীরণের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ও তার সঙ্গে প্রশাসনিক কর্মীদের দায়িত্ব নানাভাবে বিবর্তিব হয়েছে। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রই হোক বা বিশ্বায়নের চাপে ক্লিষ্ট রাষ্ট্রই হোক বা চাপ সৃষ্টিকারী উন্নত রাষ্ট্রই হোক প্রশাসনিক কর্মীদের গুরুত্ব যে ক্রমবর্ধমান, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। এই কারণেই পেশাদারী কৃত্যক সকল রাষ্ট্রের প্রশাসনেরই সর্বজনীন চাহিদা। এই পেশাদারিত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য যে সকল বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন এই এককে তারই বিস্তারিত আলোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

২.১ প্রস্তাবনা

হারমোন ফাইনার উন্নতিমূলক উপজীবিকা হিসাবে রাষ্ট্রকৃত্যকের উদ্ভব সম্বন্ধে বলেন যে আধুনিক সভ্যতার কিছু মৌলিক ও প্রশ্নাতীত নীতি পেশাদার কৃত্যকের জন্ম দিয়েছে এবং রাষ্ট্রকৃত্যক ছাড়া এই নীতিগুলি উপলব্ধি ও বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। এরূপ কয়েকটি নীতি হল বিশেষীকরণ, শ্রম বিভাজন এবং 'Career Open to Talents'[2]-এর গণতান্ত্রিক ধারণা।

রাষ্ট্রের জননীতিকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকৃত্যক একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়। পুলিশী রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে রাষ্ট্রের কাজের পরিধি সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ যখন জনমানসে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে, পুঁজিবাদী চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রনায়কগণ তখন এই ক্ষোভের আগুন স্তিমিত করার জন্য রাষ্ট্রকে সামাজিক উপযোগিতামূলক কাজের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। রাজনৈতিক এই সদিচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় দক্ষ কর্মীবৃন্দের, যারা নীতিকে কাজে পরিণত করবে। পরিকল্পনা, আয় ব্যয় নির্ণয়, প্রতিবেদন পেশ, তত্ত্বাবধান, সমন্বয়, যোগাযোগ রক্ষা, নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করার জন্য দক্ষ, বিশেষজ্ঞ, উদ্যমী বিপুল সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনভিজ্ঞতা, কার্যকালের অস্থায়িত্ব এই প্রয়োজনীয়তাকে আরো দৃঢ় করেছে। একদিকে সুসংহত ভাবে জনকল্যাণকে সুনির্দিষ্ট করা ও অন্যদিকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রকৃত্যক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে উন্নত ও উন্নতিশীল দেশে পেশা বা বৃত্তি হিসাবে রাষ্ট্রকৃত্যককে গড়ে তোলার কথা চিন্তা করা হয়েছে। প্রতিটি কাজের জন্য যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিকে যাতে নিয়োগ করা যায় সেজন্য কর্মী ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃত্তি হিসাবে যাতে রাষ্ট্রকৃত্যকের কাজ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে লোভনীয় হয়ে ওঠে সেজন্য বিশেষ যত্নবান হওয়ার প্রচেষ্টা বিভিন্ন রাষ্ট্রেই লক্ষ্য করা গেছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রই উপলব্ধি করেছে যে, 'The welfare of the people will, to an increasing extent, depend on the imagination and sympathy and the efficiency—with which work is understood and done by the civil servants.'[3] (ক্রমবর্ধমান-ভাবে জনগণের কল্যাণ নির্ভর করে কতখানি কল্পনা, সহযোগিতা এবং দক্ষতার সঙ্গে জনপালন নির্বাহীরা (Civil Servants) তাঁদের কাজকে বোঝেন ও করেন তার উপর)।

বর্তমানে কেবল দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনায়ও রাষ্ট্রকৃত্যক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্রজেশ মিশ্র বা নিরুপমা রাওরা স্বীয় যোগ্যতা প্রদর্শন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থায় নিজেদের যেভাবে অপরিহার্য করে তোলেন, তা রাষ্ট্রকৃত্যকের উত্তরোত্তর গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। পরের বিভাগে আমরা Career System হিসেবে আমলাতন্ত্রের কথা বলবো।

২.২ বৃত্তি তথা উন্নতিমূলক উপজীবিকা হিসাবে রাষ্ট্রকৃত্যক (Career System)

আমলাতন্ত্র তথা রাষ্ট্রকৃত্যককে একটা স্থায়ী পেশা ব্যবস্থা বা Career System হিসেবে দেখেছিলেন। 1911-13 সালেই তাঁর 'Economy and Society' বইটি লেখবার সময় যেটি তাঁর মৃত্যুর পর 1920 সালে প্রকাশিত হয়। তিনি বৃত্তিমূলক উপজীবিকা হিসেবে আমলাতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে দেখেছিলেন পল্লবগ্রাহীদের দ্বারা প্রশাসন ('administration by dilettantes')-কে। Nicholas Henry তাঁর Public Administration and Public Affairs বইতে (1995) দেখিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'Professional Career System' আত্মপ্রকাশ করার আগে সেখানে মার্কিন মানবিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resource Management) যা কর্মী ব্যবস্থাপনারই অন্য নাম—অনেকগুলি স্তর বা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে এসেছিলো। এগুলি হল : (ক) Guardian Period (1789-1829) যাকে বলা হয় ভদ্রলোকের সরকার ('government by gentle-men')। (খ) Spoils Period (1829-1883), যেখানে সরকারি পদ রাষ্ট্রপতির দ্বারা যুদ্ধের লুণ্ঠনদ্রব্য বা spoils হিসেবে বিতরিত হত। (গ) Reform Period (1883-1906) যেখানে রাষ্ট্রকৃত্যকে মেধার (merit) ব্রিটিশ ধারণা পরম আদৃত হয়। (ঘ) Scientific Management Period (1906-37) যেখানে ফ্রেডেরিক টেলর এবং ফ্র্যাঙ্ক ও লিলিয়ান গিলব্রেথ (Frank and Lilian Gilbreth)-এর প্রভাবে সময়গতি সমীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে দক্ষতার ধারণা প্রধান মূল্যবোধ হিসেবে আসে। দক্ষতা বলতে বোঝাতো সব চেয়ে কম সম্পদসমূহের সাহায্যে কোনো কাজ করা।

এর পর আসে Administrative Mangement Period (1937-55)। এই পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট-এর Committee on Administrative Management (যা ব্রাউনলো কমিটি Brownlow Committee নামে খ্যাত) প্রভাবে প্রশাসনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যবস্থাপনা (mangement)। কারণ সরকারকে হতে বলা হয় আরো সক্রিয়, আক্রমক ও সদর্থক। তার পর আসে 1955-1970 সময়কালে Professional Period, তথা Professional Career System। এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে এখানে প্রধান ঝোঁকটা দেওয়া হয় ব্যক্তির (Person) উপর, Civil Service System-এর মত তার পদের (Position) উপর নয়।

Nicholes Henry বলেন যে কোনো বৃত্তিব্যবস্থা (Career System) হিসেবে আমলাতন্ত্রে কোনো ব্যক্তি কর্মচারীর পেশাকে অত্যন্ত পরিকল্পিত পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হয়। আশা করা হয় যে তিনি অনেকগুলি ক্রমোচ্চবিন্যস্ত পদের মধ্যে দিয়ে উপরে উঠবেন, যাদের প্রত্যেকটিতে তিনি তাঁর পেশাগত দক্ষতাকে ক্রমবর্ধমানভাবে দায়িত্বশীল এবং কার্যকরী পথে প্রয়োগ করবেন। Professional Career System বা পেশাগত স্থায়ী, উপজীবিকা ব্যবস্থাগুলি 'profssionalism', 'specialization' এবং 'exper-tise'-এর ধারণাগুলির উপর অতিরিক্ত মূল্য আরোপ করে। জনপালন নির্বাহে (Public Service) এই উত্থান সাবেকি রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থার পক্ষে অনেক গভীর এবং অস্বস্তিকর প্রভাবের জন্ম দিয়েছে।

পেশা বা বৃত্তি হিসেবে রাষ্ট্রকৃত্যক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় বহন করে—

(ক) উচ্চ পদমর্যাদা, সম্মান ও সরকারি স্বীকৃতি।

(খ) উপযুক্ত ও উন্মুক্ত নিয়োগ পদ্ধতির দ্বারা নির্বাচন।

(গ) বদলি ও পদোন্নতির সম্ভাবনা।

(ঘ) সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো।

(ঙ) নির্দিষ্ট সময়ে অবসর ও অবসরকালীন সুবিধা।

উইলওবি (W. F. Willonghby) পেশাগত রাষ্ট্রকৃত্যকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন যে, রাষ্ট্রকৃত্যক হল সরকারি পরিষেবায় সমান বুদ্ধি ও ক্ষমতার নিরিখে সকল নাগরিক সমান সুযোগ প্রদানকারী, সমান বেতন ও উন্নতির সুযোগ সৃষ্টিকারী, সমান পরিবেশ সৃষ্টিকারী, সকল কর্মীকে সমান ভাবে অবসরকালীন সুযোগ প্রদানকারী এবং সকল কর্মীর কাছ থেকে সমান পরিষেবার দাবিদার একটি ব্যবস্থা। **(A System that offers equal opportunities to all citizens to enter the government service, equal pay to all employees doing work requiring the same degree of intelligence and capacity, equal opportunities for advancement, equally favourable conditions and equal participation in retirement allowances and makes equal demands upon the employees.)**[4]

প্রতিভাধর, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক যুবতীরা তাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করে রাষ্ট্রকৃত্যককে সমৃদ্ধ করবে এই প্রত্যাশায় প্রায় প্রতিটি দেশে রাষ্ট্রকৃত্যককে বৃত্তিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক সরকারি সংগঠনের নিজস্ব স্থায়ী কর্মীবৃন্দ আছে। সংগঠনের কাজ ও দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই রাষ্ট্রকৃত্যকের আয়তন ও দায়িত্ব নির্ধারিত হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নস্তরে উপযুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চপদ দেওয়া হয়। তবে বিশেষজ্ঞ ও কৌশলগত বা প্রায়োগিক (technical) জ্ঞান যেখানে বিশেষভাবে প্রয়োজন সেখানে উচ্চপদেই সরাসরি নিয়োগ করা হয়। নিয়োগ যোগ্যতার ভিত্তিতে হলেও এই রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ নিতে হয় এবং কর্মস্থলেও কর্মকুশলতা প্রদর্শন করতে হয়। বর্তমানে সাধারণ প্রশাসক ও প্রযুক্তিবিদ উভয়ের গুরুত্বই রাষ্ট্রকৃত্যকে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে।

বৃত্তি হিসাবে যখন কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রকৃত্যকে প্রবেশ করতে আগ্রহী হয়, তখন সে ধরে নেয় যে তার নিয়োগ কেবলমাত্র যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে হবে এবং তার কর্মকুশলতা যথাযথভাবে স্বীকৃতি পাবে। পদোন্নতি ও বদলির সম্ভাবনা একই সঙ্গে রাষ্ট্রকৃত্যকে কর্মীর মনে আশা ও আশংকার সৃষ্টি করে। ফলে কর্মী তাঁর কর্মকুশলতা বজায় রাখবে এরূপ প্রত্যাশা করা হয়। রাষ্ট্রকৃত্যকে যখন পেশা বা বৃত্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন এই প্রত্যাশা জাগরিত হয় যে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতেই নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি হবে, কোনও বিশেষ রাজনৈতিক পক্ষপাতের ভিত্তিতে নয়। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত বলেও

স্বীকৃত। J. D. Kingsley বলেন যে—'Public recruitment may be defined as that process through which suitable candidates are included to compete for appointments to the public services. It is thus an integral part of a more inclusive process-selection-which also includes the process of examination and certification.'[5] রাষ্ট্রীয় বা সার্বজনিক নিয়োগকে সংজ্ঞা দেওয়া যায় সেই প্রক্রিয়া হিসেবে যার মাধ্যমে মানানসই প্রার্থীদের জনপালন নির্বাহের বিভিন্ন পদে নিযুক্তির জন্য প্রতিযোগিতার মধ্যে আনা হয়। সুতরাং এই নিয়োগ আরো পরিবেষ্টক একটি প্রক্রিয়ার অংশ। তার নাম selection বা বাছাই। তার মধ্যে পরীক্ষা (Examination) এবং শংসায়ন (Certification) পড়ে। কিংসলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ সুনিশ্চিত করতে বলেছেন। ফিফনার ও প্রেসথাস আরো বলেন যে, কেবলমাত্র যোগ্য কর্মী নিয়োগই নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে সেই কর্মীকে জটিল কার্যনির্বাহের উপযুক্ত করে তোলা পেশাগত রাষ্ট্রকৃত্যকের গুরুদায়িত্ব।

এই গুরুদায়িত্ব নির্বাহের জন্য কয়েকটি ধাপে রাষ্ট্রকৃত্যকে কর্মী নিয়োগের বিষয়টি পরিচালনা করতে হয় ঃ

(ক) কোন সংগঠনে কতসংখ্যক কর্মী প্রয়োজন তা নির্ণয়।

(খ) সংগঠনের দায়িত্ব ও কাজের পরিমাণ নির্ধারণ।

(গ) সেই অনুপাতে প্রস্তাবিত কর্মীর যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয়।

(ঘ) বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ঘোষণা।

(ঙ) প্রার্থীদের আবেদনপত্র বিবেচনা।

(চ) উপযুক্ত প্রার্থীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

(ছ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(জ) প্রার্থীদের নিয়োগ সুপারিশ করা।

(ঝ) যোগ্য কর্মীদের উপযুক্ত পদে অবস্থান সুনিশ্চিত করা।

(ঞ) নির্দিষ্ট সময়ান্তরে কর্মীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন।

(ট) কর্মীদের বদলি ও পদোন্নতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

প্রতিটি পর্যায়েই যথেষ্ট জটিলতা ও সমস্যার অবকাশ থাকে বলে উচ্চপর্যায়ে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনেক রাষ্ট্রে যেমন ভারতবর্ষে এই জটিল কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় একটি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ সংস্থার হাতে। ভারতে এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রকৃত্যকে কমিশনের সৃষ্টি হয়েছে।

নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে তা হল—সরাসরি নিয়োগ বনাম পদোন্নতি। পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চপদের নিয়োগ সুনিশ্চিত হলে কর্মীদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, অভিজ্ঞ কর্মীদের

সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়, সংগঠনের প্রতি কর্মীর আনুগত্যের প্রশ্নে অনেক নিশ্চিত হওয়া যায়। কাজের মাধ্যমেই কর্মীর কর্মদক্ষতার শ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন হয় বলে সংগঠনের মান বজায় থাকে এবং সর্বোপরি সরকারের ব্যয় হ্রাস পায়।

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে নতুন কর্মী না এলে নবীন উদ্যমকে স্বাগত জানানো হয় না, আরো বেশি প্রতিভাকে সুযোগ দেওয়া যায় না এবং গণতান্ত্রিকভাবে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা গুরুত্ব পায় না। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কৌশলগত পরিবর্তন এত দ্রুত হচ্ছে যে প্রশাসনে নতুন শিক্ষায় শিক্ষিতদের স্বাগত জানানো উচিৎ। যেমন একজন কর্মী যতই দক্ষ হন, তাঁর ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান না থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে নতুন কর্মী নিয়োগ করা উচিৎ। এর ফলে পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে প্রশাসনকেও সচল রাখা সম্ভব হবে।

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা হয়। উপরন্তু প্রশাসনের সচলতাকে অব্যাহত রাখার জন্য কর্মীর কাজের মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাকে নতুন প্রযুক্তি ও শিক্ষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রকৃত্যকে পরিষেবাকে পেশায় উত্তীর্ণ করার ক্ষেত্রে অন্যতম পূর্ব শর্ত হল কর্মীর যোগ্যতার মান নির্ধারণ করা। রাষ্ট্রকৃত্যকে প্রবেশিকা পরীক্ষা কেবলমাত্র নাগরিকের জন্যই সুরক্ষিত থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নারী পুরুষ উভয়েই এই পরীক্ষায় বসতে পারে। নির্দিষ্ট বয়সসীমা উত্তীর্ণ হলেও নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে এই পরীক্ষায় বসা যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কৌশলগত যোগ্যতার ওপরে জোর দেওয়া হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হয়। তাদের নিষ্ঠা, স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রভৃতি বিবেচনা করা হয়। তবে এ সম্বন্ধে সমালোচনা করে বলা যায় যে, দশ পনেরো মিনিটের সাক্ষাৎকার কখনই যথেষ্ট হতে পারে না। এ. ডি. গোরওয়ালা মন্তব্য করেন যে, 'রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনগুলির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিয়মিত যোগাযোগ কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্বন্ধে কমিশনকে আরো বেশি অবহিত করতে পারে'।[6]

২.৩ শ্রেণীবিভাজন—সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

এই অংশে আমরা কর্মী ও ব্যবস্থাপনায় শ্রেণীবিভাজনের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, তাৎপর্য, সুবিধা, অসুবিধা ইত্যাদির আলোচনা করবো।

Nicholas Henry বলেন যে সরকারি স্তর নির্বিশেষে জনপালন নির্বাহের (civil service) ভিত্তি হল শ্রেণীবিভাজনের ব্যবস্থা ("The basic of civil service, irrespective of governmental level is the position classification system")। রাষ্ট্রীয় কর্মীদের শ্রেণীবিভাজনের প্রকৌশলগুলি রাষ্ট্রীয় কর্মী

পরিচালনা তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) কালপর্বে উৎসাহিত হয়। 1923 সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মী বিভাজনে নীতিগুলির দার্ঢ্যের (rigour) অভাব সম্পর্কে সমালোচনার ফলে এবং "equal pay for equal work" (সমান কাজের জন্য সমান বেতন)-এর নীতিতে বর্তমান বিশ্বাসের ফলে মার্কিন কংগ্রেস একটি classification act পাশ করে যা আবার একটি personal Classification Board প্রতিষ্ঠা করে। এই পর্ষৎ-এর কাজ ছিল প্রত্যেক কাজের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ, তুলনীয় কর্তব্যসমূহ এবং দায়িত্বসমূহ এই সবের ভিত্তিতে কর্মীদের শ্রেণীবিভাজিত করা। একটি নতুন এবং ব্যাপক আইন প্রণীত হয় 1949 সালে শ্রেণীবিভাজনকে যুক্তিনিষ্ঠ এবং বাস্তবানুগ করে তোলার জন্য।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে শ্রেণীবিভাজনের একক হল পদ (Position), পদাধিকারী ব্যক্তি নয়। ম্যাক্স ওয়েবার আমলাতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে পদ এবং পদাধিকারীর (Incumbent) যে বিচ্ছিন্নতার উল্লেখ করেছিলেন তার থেকেই এটা বেরিয়ে আসে। এবার দেখা যাক শ্রেণীবিভাজন বলতে কী বোঝায়। অধ্যাপক মিল্টন এম্ ম্যাণ্ডেল (Milton M. Mandel)-এর মতে এর অর্থ হল কর্তব্যসমূহের এবং যোগ্যতাসমূহের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পদের গোষ্ঠীবদ্ধকরন (grouping) । মার্শাল ই. ডিমক-এর মতে এটা হল তুলনামূলক কঠিনতা এবং দায়িত্বের ভিত্তিতে একটি ক্রমোচ্চ বিন্যস্ত পর্যায়ে পদসমূহের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যস্তকরণ। ("The systematic sorting out and ranking of positions on the basis of similarity of duties in a hierarchical sequence according to comparative diffcutly and responsibility")। হোয়াইট আরো বিশদভাবে বলেছেন অন্তিম চূড়ান্ত চেহারায় কোনো শ্রেণীবিভাজনে প্রকল্প গঠিত হয় অনেকগুলি শ্রেণী নিয়ে, যারা প্রত্যেকটি পদকে জায়গা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সংখ্যক। সেই পদগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ উপায়ে বিন্যস্ত থাকবে এবং সেই প্রকল্পের প্রয়োগ ব্যাখ্যা এবং সংশোধনের জন্য অনেক রকমের নিয়ম, প্রবিধানের (regulations) একটি গুচ্ছ থাকবে ("In its final form, a classification plan consists of a number of classes adequate to enable a place to be found for each existing position, arranged in orderly fashion with respect to each other, and supplemented by a set of rules and regulations for its administration, interpretation and amendment")। আবার Civil Service Assembly of the United States and Canada কর্তৃক 1945 সালে নিযুক্ত The Committee on Position Classification in the Civil service মনে করেছিল যে শ্রেণীবিভাজনের অর্থ খুঁজে বের করা "What different kinds of 'classes' are positions, for different treatment in personnel processes, there are in the services ... a systematic record of the ... particular positions found to be of each classes".

সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কর্মীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন কর্মী বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত হলেও যদি তাঁরা একই ধরনের দায়িত্ব পালন করেন তাহলে তাঁদের একই

শ্রেণীভুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সচিব, উপসচিব, যুগ্মসচিব, সহকারী সচিব থেকে শুরু করে সাধারণ করণিকগন পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাঁদের দায়িত্বের ভিত্তিতে একই পদভুক্ত বলে বিবেচিত হন। তাঁদের বিভাগ আলাদা হলেও তারা সামগ্রিকভাবে করণিক শ্রেণী বা প্রশাসক শ্রেণী রূপে চিহ্নিত হন। অনেক সময় যোগ্যতা, বেতনকাঠামো বা বিভাগের ভিত্তিতেও শ্রেণীবিভাজন করা হয়ে থাকে, কিন্তু কর্মী ব্যবস্থাপনায় এই ধরনের শ্রেণীবিভাজনের গুরুত্ব কম। কর্মীব্যবস্থাপনায় শ্রেণীবিভাজনের গুরুত্ব হল পদ, পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তি নয়। যদি টাইপিস্ট পদে দুই জন ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন এবং একজন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ও অপরজন স্নাতক হন, তথাপি তাঁরা উভয়েই টাইপিস্ট হিসাবেই চিহ্নিত হবেন।

শ্রেণীবিভাজন বিভিন্ন পর্যায়ে হয়ে থাকে। পরিষেবা (Service), শ্রেণী (Class) ও স্তর (Grade)। এই শ্রেণীবিভাজন ক্রমোচ্চ পর্যায়ে বিশ্লেষিত হতে পারে। প্রথমে কাজের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজন করা হয়ে থাকে। এরপর বিভিন্ন শ্রেণীতে কর্মীদের অবস্থান চিহ্নিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত কর্মীদের মধ্যে স্তর বিন্যাস করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ভারতের প্রশাসনিক কৃত্যক, ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যক সচিবালয় প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজের ভিত্তিতে চিহ্নিত হয়। এই কৃত্যকগুলির প্রত্যেকটিতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত আধিকারিক ও কর্মীরা থাকেন। প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তর বিন্যাস থাকতে পারে এবং প্রত্যেকটি স্তরে বেতন কাঠামো ভিন্ন হয়।

যে সকল বিষয়গুলি এই শ্রেণীবিভাজনে নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে, তার মধ্যে অন্যতম হল—

1. বিষয়গত ও কার্যগত বিভিন্নতা, যেমন—ইঞ্জিনিয়ারিং চিকিৎসা বিভাগ, প্রশাসনিক দপ্তর ইত্যাদি।
2. কোন্ শ্রেণীকে কি ধরনের আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয় ও তার ব্যাপ্তি কিরূপ। যেমন যেসব শ্রেণীভুক্ত কর্মীদের ওপরের স্তরগুলির ওপর অধিক নির্ভর করতে হয় ও ব্যাপক নিয়ন্ত্রন মেনে চলতে হয় সেগুলি অপেক্ষাকৃত অধস্তন শ্রেণী বলে বিবেচিত হতে পারে।
3. যে সকল শ্রেণী অধিকতর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ করে, তাদের অপেক্ষাকৃত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।
4. তদারকি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের দায়িত্বের ভিত্তিতেও শ্রেণীবিভাজন করা হয়।
5. কাজের প্রকৃতি অর্থাৎ সারল্য ও জটিলতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজন করা যেতে পারে।
6. কোনও নির্দিষ্ট পদের জন্য যে যোগ্যতার মাপকাঠি থাকে, তাও শ্রেণীবিভাজনের অন্যতম নির্ধারক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। যেমন সর্বভারতীয় কৃত্যকের সদস্যদের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কর্তৃক আয়োজিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একসময়কার Directory of the Bureau of Public Personnel Administration ছিলেন Fred Telfard। তিনি শ্রেণীবিভাজন ব্যবস্থার যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় শর্তগুলির কথা বলেন তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতা। এগুলি হল :

(ক) প্রত্যেক পদের কর্তব্যসমূহ, সংগঠনের সংশ্লিষ্ট এককে তার স্থান এবং সংগঠিক এককটির প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ তথ্যসংগ্রহ।

(খ) এই তথ্যের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র পদগুলিকে শ্রেণীতে সাজানো।

(গ) প্রত্যেক পদশ্রেণীর লিখিত সংজ্ঞা বা বর্ণনা, যার মধ্যে শ্রেণীগত কর্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ থাকবে।

(ঘ) প্রত্যেক পদের কর্তব্যগুলি সম্পাদনের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার লিখিত বিবৃতি।

(ঙ) প্রত্যেক পদশ্রেণীর এমন নামকরণ যাতে সংগঠনে তার কাজ এবং অবস্থান বোঝা যায়।

(চ) প্রত্যেক পদে এবং পদশ্রেণীতে পদোন্নতি পথগুলি বলে দেওয়া, যাতে কোনো পদশ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেক পদের অবস্থান এবং শ্রেণীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বোঝা যায়।

(ছ) প্রত্যেক শ্রেণীর বেতন তপশীলগুলি (Compensation Schedules) বিশদ করে দেওয়া, যাতে কর্মীরা জানতে পারে ঐ শ্রেণীর মধ্যে কতখানি যেতে পারবে।

কর্মী ব্যবস্থাপনায় শ্রেণী বিন্যাস অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিকতম সংযোজন। 1874-75 সালে প্লেফেয়ার কমিশন (Playfair Commission) এবং 1886-95-তে রিড্‌লে কমিশন (Ridley Commssion) কর্মী ব্যবস্থাপনায় শ্রেণী বিন্যাসের সুপারিশ করেন। বিভাগীয় সীমারেখা অতিক্রম করে বিভিন্ন দায়িত্ব ও স্তরের কর্মীদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন করার কথা বলা হয়। এই মর্মে দ্বিতীয় বিভাগীয় করণিক, সহকারী করণিক, মধ্যবর্তী শ্রেণীপদের সৃষ্টি হয়। 1914 সালে ম্যাকডোনাল্ড কমিশন (MacDonald Commission) বিভিন্ন কৃত্যকের জন্য তিনটি সাধারণ শ্রেণী সুপারিশ করেন। এই তিনটি শ্রেণী হল—জুনিয়র করণিক শ্রেণী, সিনিয়র করণিক এবং প্রশাসক শ্রেণী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার ফলে এই সুপারিশ কার্যকর হয় নি। 1920 সালে ন্যাশনাল (হোয়াইটলে) কাউন্সিল কমিটি উক্ত সুপারিশটি পুনর্বিবেচনা করে এবং এই কমিটি ছয়টি শ্রেণী সৃষ্টির কথা বলে—

1. প্রশাসক শ্রেণী (Administrative Class)
2. প্রয়োগকারী অধিকর্তা (An Executive Class)
3. করণিক শ্রেণী (A Clerical Class)
4. অপেক্ষামান সহকারী শ্রেণী (Waiting Assistant Class)
5. সর্টহ্যান্ড টাইপিস্ট শ্রেণী (A Shorthand Typist Class)
6. টাইপিস্ট শ্রেণী (A Typist Class)

এই পুনর্বিন্যাস কিন্তু সমস্ত বিভাগ ও কৃত্যকের চাহিদা পূরণ করতে পারে নি। শ্রমদপ্তর, প্রতিরক্ষা, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতিদের নিজস্ব বিভাগীয় শ্রেণী প্রয়োজন। যা প্রকৃতিগত ভাবে স্বতন্ত্র। এছাড়া বৃত্তিগত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ, শুল্ক বিভাগের পরিদর্শক, অফিস কিপার, নিরাপত্তাকর্মী প্রভৃতিদের শ্রেণী বিন্যাস বিভিন্ন কৃত্যক ও বিভাগীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কৃত্যকে শ্রেণীবিন্যাসের সূচনা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে 1923 সালে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মী বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ—

1. বৃত্তিগত ও বৈজ্ঞানিক শ্রেণী (Professional & Scientific Class)
2. সহযোগী বৃত্তিগত শ্রেণী (Sub-professional Class)
3. করণিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণী (Clerical Administrative and Fiscal Class)
4. অছি সংক্রান্ত দায়িত্বশীল শ্রেণী (Custodial Class)
5. করণিক যান্ত্রিক শ্রেণী (Clerical Mechanical Class)

এই শ্রেণীবিন্যাস সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়, যেখানে প্রতিটি শ্রেণীর নাম, কর্তব্য ও দায়িত্ব, দৃষ্টান্ত সহকারে দায়িত্বের ব্যাখ্যা, ন্যূনতম যোগ্যতার উল্লেখ, বেতন কাঠামো, পদোন্নতি প্রভৃতির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়।

ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কালে আইনসিদ্ধ সাংবিধানিক ও আইন বর্হিভূত অসাংবিধানিক (covenanted & uncovenanted) পদের সৃষ্টি হয়। The Aitchison Commission (1996-98) ভারতীয় প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃত্যকের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাজন করেন— রাজকীয় (Imperial), আঞ্চলিক (Provincial) ও অধস্তন কর্মী। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাজন যথেষ্ট বাস্তবোচিত হয় নি। কারণ আঞ্চলিক স্তরের কর্মীরা অনেক সময়ই রাজকীয় কর্মীদের ন্যায় দায়িত্ব পালন করত এবং সরাসরি তদানীন্তন ভারত সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। অতঃপর 1912-15 সালে ইস্‌লিংটন কমিশন (Islington Commission) রাজকীয় ও আঞ্চলিক স্তরের সংযোগ ঘটিয়ে দুটি শ্রেণীতে কর্মীদের পদ বিন্যাসের সুপারিশ করেন। সম্ভবত পরবর্তীকালে Class I এবং Class II শ্রেণীর উৎপত্তি এই ধারণা থেকেই হয়। 1930 সালের পর থেকে সর্বভারতীয় কৃত্যকের ধারণা প্রচলিত হয় এবং ICS (Indian Civil Service) এবং IFS (Indian Foreign Service) ছাড়াও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কৃত্যকের উদ্ভব হয়। বাকী পদগুলি অধস্তন পদ হিসাবে চিহ্নিত হয়। 1947 সালে অধস্তন নামকরণের পরিবর্তে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে নামকরণ করা হয়।

1930 সালে প্রণীত Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules অনুযায়ী সরকারি কর্মীবৃন্দের শ্রেণীবিভাজন করা হয়। এই শ্রেণীগুলি হল ঃ

1. The All India Service (সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক)

2. The Central (Union) Services Class I (কেন্দ্রীয় কৃত্যক প্রথম শ্রেণী)

3. The Central (Union) Service Class II (কেন্দ্রীয় কৃত্যক দ্বিতীয় শ্রেণী)

4. The Provincial (State) Service (আঞ্চলিক (রাজ্য) কৃত্যক)

5. The Specialist Services (বিশেষজ্ঞ কৃত্যক)

6. The Central Services Class III (কেন্দ্রীয় কৃত্যক, তৃতীয় শ্রেণী)

7. The Central Services Class IV (কেন্দ্রীয় কৃত্যক, চতুর্থ শ্রেণী)

8. The Central Secretariat Services, Class I, II, III, IV (কেন্দ্রীয় সচিবালয় কৃত্যক, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী)

একই শ্রেণীর কর্মীরা বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন, যেমন সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের কর্মীরা ICS, IFS বা IPS হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক এবং কেন্দ্রীয় কৃত্যকের মধ্যে প্রচলিত শ্রেণী বিভাজন সর্ব ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হয় না। বিশেষত রেল, ডাক ও তার, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি প্রচলিত সরল শ্রেণীবিভাজনে কিছু তারতম্য করা হয়।

২.৩.১ কর্মীব্যবস্থাপনায় শ্রেণীবিভাজনের গুরুত্ব

এ যাবৎ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টতই প্রমাণিত যে সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনার জন্য কর্মীব্যবস্থাপনায় শ্রেণীবিভাজন একান্ত আবশ্যক এবং এই শ্রেণীবিভাজনের গুরুত্ব উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশেই স্বীকৃত। কর্মীব্যবস্থাপনার জটিল দায়িত্ব শ্রেণীবিভাজনের ফলে সরলীকৃত এবং সুসম্বদ্ধ করা সম্ভব হয়। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারি প্রশাসনের কাজের পরিধি এত বিস্তার লাভ করেছে যে বহু সহস্র কর্মী প্রশাসনের সহায়তায় কর্মরত। এদের প্রত্যেকের নিয়োগ পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ, বেতন কাঠামো, পদোন্নতি, কাজের মূল্যায়ন প্রভৃতি নিয়ে কর্মী ব্যবস্থাপকদের বিব্রত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ থেকে যেত, যদি না ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী এই সকল কর্মীবৃন্দকে তাদের কাজের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনুসারে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করা না যেত। কোনও একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত কর্মীদের জন্য সর্ব অবস্থায় একই নিয়ম প্রযোজ্য হয় বলে কর্মী ব্যবস্থাপকদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

বিপুল সংখ্যক বেতন ও ভাতা প্রদান কেবলমাত্র সরকারি কোষাগারের ওপর চাপ সৃষ্টিই নয়, বাজেট ও হিসাব পরীক্ষার ক্ষেত্রেও অস্বাভাবিক জটিলতা সৃষ্টি করে। শ্রেণীবিভাজন এই জটিলতা কিছু পরিমাণে হ্রাস করে। একই শ্রেণীভুক্ত কর্মীদের বেতন কাঠামো একইভাবে নির্ধারিত হয় বলে বাজেট প্রস্তুত এবং হিসাব পরীক্ষার কাজ তুলনামূলক ভাবে সরলীকৃত হয়। এছাড়াও একই কাজের জন্য একই বেতন কাঠামো স্থিরীকৃত থাকে বলে কোনও পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায্য সুযোগ প্রদানের প্রশ্ন থাকে না।

শ্রেণীবিভাজনের ফলে একটি সুনির্দিষ্ট স্তর বিন্যাস বা শৃঙ্খল (Scalar Chain) থাকে। ফেয়ল যে শৃঙ্খলের কথা বলেছিলেন, একদিকে তা যেমন কর্মীদের মধ্যে শৃংখলা রক্ষায় সহায়ক, অন্যদিকে এই শৃঙ্খল কৃত্যকে নিয়মানুবর্তিতা ও নিরপেক্ষতার বাতাবরণ রক্ষা করে। শ্রেণী বিভাজনও তেমন স্তর বিন্যাসের সহায়ক হিসাবে কর্মী ব্যবস্থাপনাকে জটিলতা মুক্ত করে এবং দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের প্রবেশ রোধ করে। পদোন্নতি নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ও নির্দিষ্ট অবস্থানে হওয়ার ফলে স্বজন পোষণের সুযোগ হ্রাস পায়।

সর্বোপরি শ্রেণীবিভাজনের ফলে সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সমন্বয় সাধিত হয়। প্রত্যেক শ্রেণীতে কাজ ও দায়িত্ব সুচিহ্নিত থাকার ফলে কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রশাসনের পক্ষে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সহজ সাধ্য হয়।

কিন্তু শ্রেণীবিভাজনের কয়েকটি নেতিবাচক পরিণামকেও অস্বীকার করা যায় না। অত্যধিক শ্রেণী সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অনেক সময় কর্মীদের মধ্যে অগণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে ওঠে। ঊর্ধ্বতন শ্রেণীভুক্ত কর্মীদের মধ্যে নিম্নস্থ শ্রেণীগুলির প্রতি অবজ্ঞার মানসিকতা গড়ে উঠলে সমন্বয় বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কাজের গতি নষ্ট হয়। তাছাড়া একথা মনে রাখা আবশ্যক শ্রেণীবিভাজন অবশ্যম্ভাবী হলেও সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনমত এই শ্রেণীবিভাজনে শিথিলতা আবশ্যক। যেমন অকর্মণ্য দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মীকে যদি যথানিয়মে শ্রেণীবিভাজনের স্বার্থে পদোন্নতি দেওয়া হয়, তাহলে সংগঠনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। সেক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম করা আবশ্যক। যে কোনও সংগঠন এবং প্রশাসনের এমন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যাতে দক্ষতা ও কার্যকারিতার সমন্বয় ঘটিয়ে দ্রুত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

২.৪ ক্ষতিপূরণ

এই অংশে আমরা কর্মীব্যবস্থাপনার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে Compensation তথা বেতন দানের কথা বলবো। কর্মীপ্রশাসন তত্ত্বে Compensation কথাটি 'Remmuneration'-এর সমার্থক। এর মধ্যে বেতন ও পদোন্নতি দুইই আছে।

নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের পর নির্ধারিত যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোনও কর্মী যখন তার উপযুক্ত পদে আসীন হয় তখন সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতন ও ভাতা সে যেমন প্রত্যাশা করে তেমন স্তরবিন্যাসের ক্রমোচ্চ ধাপে তার পদোন্নতি পাওয়ারও আশা থাকে। তার কর্মতৎপর, কুশলতা ও দক্ষতা যে হারে ব্যবহৃত হয়, সেই হারেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অনুযায়ী তার বেতন ও পদোন্নতি সুনিশ্চিত হয়।

২.৪.১ বেতন ও ভাতা

বেতন কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি নীতি প্রযোজ্য হয় :

প্রথমতঃ—পরিপূরক নীতি অনুযায়ী বেসরকারি সংগঠন ও শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত একই শ্রেণীভুক্ত কর্মীদের সঙ্গে সমহারে সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয়। অন্যথায় সরকারি কৃত্যকের

প্রতি আকৃষ্ট হবে না। অপ্রতিযোগী অবস্থান নীতি কর্মীদের বেতন, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিৎ যাতে তা বেসরকারি ক্ষেত্রের থেকে অধিক লাভজনক হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রতিরক্ষা, পুলিশ প্রভৃতি বিভাগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের কাজে ধর্মঘট, কাজবন্ধের প্রবণতা প্রভৃতি নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রথমেই ছুটি, বেতন, ভাতা, অবসরকালীন বিশেষ সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল হুইটলে কাউন্সিল (National Whitely Councils) এই মর্মে টমলিন কমিশন (Tomlin Commission)-কে জানায় যে, রাষ্ট্রকৃত্যক যেহেতু বিশেষভাবে নিযুক্ত উচ্চমানের কর্মীদের নিয়ে গঠিত, সেহেতু বেসরকারি ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের তুলনায় রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আরো উন্নত মানের হওয়া উচিৎ।

টমলিন কমিশন উল্লেখ করে যে রাষ্ট্রের উচিৎ আদর্শ নিয়োগকর্তা হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করা। যে রাষ্ট্র তার সম্পদ ও করদাতাদের প্রতি তার দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ রেখে কর্মীদের চাকুরির শর্তাদি ও বেতন নির্ধারণ করে তাকে 'আদর্শ নিয়োগকর্তা' বলা যেতে পারে।

অ্যাণ্ডারসন কমিটি (1923) অভিমত পোষণ করে যে, দক্ষ কর্মীকে আকৃষ্ট করার জন্য তার দায়িত্ব, জীবনযাত্রার মান, সামাজিক পদমর্যাদা প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতন, ভাতা প্রভৃতি নির্ধারণ করা উচিৎ। এই সুপারিশের যৌক্তিকতা থাকলেও বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে। যে কোনও কর্মীর দক্ষতার ধারবাহিক মুল্যায়ন করে সেই হারে তার বেতন, ভাতা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 1949 সালের Classification Act যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বেতন কাঠামোর ভিত্তির যোগান দেয়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার রকমের প্রধান বেতন ব্যবস্থা বর্তমান। এগুলি হল :— General Schedule বা সাধারণ তপশীল (যা যুক্তরাষ্ট্রীয় অসামরিক কর্মচারীদের প্রায় অর্ধেকের পক্ষে প্রযোজ্য), 'wage board system', 'postal field service system' (যেগুলি হ'ল সবচেয়ে কম বেতনের ব্যবস্থা, এবং সীমিত পরিধির অনেক বেতন ব্যবস্থা, যেমন Foreign Service-এর জন্য)। Federal Salary Reform Act of 1962, Federal Executive Salary Act of 1964, Pay Comparablity Act of 1970, Federal Employees Pay Comparability of 1990 ইত্যাদির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বেতন স্থিরীকৃত হয়। ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ে বিভিন্ন বেতন কমিশন কর্মচারীদের বেতন স্থির করে।

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও দেশের জাতীয় আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মীদের বেতন ভাতা নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী উচ্চপর্যায়ের কর্মীদের বেতন মান তুলনামূলকভাবে কম বলে সমালোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (1959) নিকট কেউ কেউ বলেন যে গণতান্ত্রিক সমতার নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন কাঠামো নির্ধারিত হওয়া উচিৎ। কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের কাছে এই সুপারিশের যৌক্তিকতা খুব একটা গ্রহণযোগ্য হয় নি। সমান কাজের জন্য সমপরিমাণ বেতন নীতিও যথেষ্ট জনপ্রিয় বলে বিবেচিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীদের বেতন কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমস্ত দেশেই কমবেশি যে নীতিগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল নিম্নরূপ ঃ

রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীদের বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাকরীর অন্যান্য শর্তাদি যথা—কার্যাকালে স্থায়িত্ব, পদোন্নতির সুযোগ, ছুটি, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা প্রভৃতির দিকে নজর দেওয়া হয়। লক্ষ্য রাখা হয় যাতে বেতন হার কোনও ভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রের তুলনায় কম না হয় বা এমন না হয় যাতে দক্ষ কর্মীর অভাব দেখা দেয়।

ভারতের পঞ্চম বেতন কমিশন কাজের ও পদের মূল্যায়ন, বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা, সমান কাজের জন্য সমপরিমাণ ভাতা প্রভৃতি নীতির পরীক্ষাপূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, এর কোনোটিই ভারতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ যোগ্য নয়। দক্ষতা, কাজের পরিবেশ, যোগত্য, ক্ষমতা, মর্যাদা ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাসে অবস্থান প্রভৃতির নিরিখে কেন্দ্রীয় স্তরে বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে বলে কমিশন তার রিপোর্টে জানায়।[7]

২.৪.২ পদোন্নতি

রাষ্ট্রকৃত্যকের দক্ষতার মান বজায় রাখার জন্য পদোন্নতির ব্যবস্থাও স্বীকৃত। পদোন্নতির ফলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে উচ্চপদে আসীন করা যেতে পরে। উচ্চপদের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য কর্মীদের কাজের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মীদের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পায়।

এল. ডি. হোয়াইট পদোন্নতি বলতে বুঝিয়েছেন—'an appointment from a given position to a position of higher grade, involving a charge of duties to a more difficult type of work and greater responsibility accompanied by change of title and usually an increase in pay.'[8] (অর্থাৎ একটি অবস্থান বা পদ থেকে উচ্চতর গ্রেডের একটি পদে কমনিয়োগ, যার সঙ্গে জড়িত আরো কঠিন ধরনের কাজের দিকে এবং আরো বেশি দায়িত্বের দিকে কর্তব্যসমূহের বদল, আর তার সঙ্গেই পদের নামের পরিবর্তন ও বেতন বৃদ্ধি)। সুতরাং পদোন্নতি কর্মীর অবস্থান, বেতন, মর্যাদা ও কাজের দায়িত্ব বৃদ্ধি করে। ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসের সিঁড়ির ওপরে ওঠার উৎসাহে কর্মী অধিক দক্ষতা ও সামর্থ্যের প্রদর্শন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। পদোন্নতির সুযোগ উচ্চাকাঙ্ক্ষী, প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করবে বলে মনে করা হয়। পদোন্নতির ব্যবস্থা ব্যক্তিগতভাবে কর্মীকে যেমন প্রলুব্ধ করে, তেমনি প্রশাসনের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। কিন্তু পদোন্নতির ক্ষেত্রে সমতা, নীতিনিষ্ঠা প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি প্রভৃতি হিতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

ডব্লিউ. এফ. উইলাওবি পদোন্নতি ব্যবস্থার সাফল্যের কয়েকটি শর্ত নির্দেশ করেছেন—

1. সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে পদোন্নতি সুনিশ্চিত করা উচিৎ।

2. প্রতিটি অবস্থানকে শ্রেণী, স্তর ও পরিষেবা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাজন করা উচিৎ।

3. নীতি নির্ধারণকারী অবস্থানগুলি ছাড়া অন্যান্যগুলিকে এই শ্রেণীবিভাজনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

4. উচ্চপদের জন্য সংগঠনের অভ্যন্তর থেকেই পদোন্নতির মাধ্যমে যথাসম্ভব নিয়োগ করা উচিৎ।

5. পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা উচিৎ।

6. পদোন্নতির জন্য নির্বাচিত কর্মীদের যোগ্যতার মূল্যায়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিৎ।

পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মীর ব্যক্তিগত শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, পেশাগত প্রশিক্ষণ, শারীরিক ক্ষমতা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিভাগের অভ্যন্তরেই পদোন্নতির বিষয়টিকে সীমিত রাখা হয়, আবার কিছু ক্ষেত্রে বিভাগের বাইরে থেকেও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পদোন্নতিকে উৎসাহিত করা হয়।

পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি নীতি অনুসরণ করা হয়। উচ্চপদাধিষ্ঠান (Seniority) নীতি অনুযায়ী স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমোচ্চস্তরের ওপরের ধাপে কর্মীকে উত্তীর্ণ করা হয়। এই নীতি অনুসরণের ফলে স্বজন পোষন, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি এড়ানো যায়।

তবে এই নীতি অনুসরণ করলে যোগ্যতার মাপকাঠিতে ঘাটতি দেখা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন লোককে উচ্চপদে উত্তীর্ণ করলে কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। উপরন্তু যথানিয়মে পদোন্নতি হবে এই প্রত্যাশা কর্মীদের কাজে শৈথিল্য সৃষ্টি করতে পারে এবং অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীদের নিরুৎসাহিত করতে পারে। সুতরাং নিম্নস্তরভূক্ত পদগুলির জন্য এই নীতি অনুসরণ সুবিধাজনক হলেও উচ্চপদের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত নয়।

যোগ্যতা পরিমাণ নীতি অনুযায়ী যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি সুনিশ্চিত করা হয়। সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির বিচারে যোগ্যতম ব্যক্তিকে পদোন্নতি দিতে প্রশাসনের কর্মকুশলতা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু কর্মীদের উৎসাহ বৃদ্ধিতে এই নীতি যথেষ্ট কার্যকর হিসাবে বিবেচিত হয়।

যোগ্যতার পরিমাপক হিসাবে যে পদ্ধতির ওপর সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল সংগঠন প্রধানের ব্যক্তিগত অভিমত। কর্মীদের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত গুণাগুণ ও দক্ষতা প্রধান প্রতিনিয়ত অনুভব করেন ও সেই অর্থে কোনও যোগ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক হলেন তিনি। এই ব্যবস্থার ফলে প্রধানের পক্ষে সংগঠনে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা সহজসাধ্য হয়।

কিন্তু এই ব্যবস্থার কতকগুলি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় ঃ

প্রথমত, বিভাগের আয়তন বেশি হলে প্রধানের পক্ষে সমস্ত কর্মীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিভাগীয় প্রধানের ব্যক্তিগত চাপ ও পক্ষপাতিত্ব কর্মীদের একাংশের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করতে পারে অথবা একাংশ প্রধানকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্যায়ের আশ্রয় নিতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা প্রধানের মধ্যে থাকলে কর্মীরা কাজে দক্ষতা দেখানোর পরিবর্তে প্রধানকে খুশি করার কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তৃতীয়ত, সংগঠনে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব শুরু হতে পারে।

এই ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য কতকগুলি বন্দোবস্ত করা যেতে পারে ঃ

1. পদোন্নতি কোনও প্রকল্প প্রধানের হাতে কেন্দ্রীভূত না রেখে, কয়েকজন উচ্চপদাধিকারী অধিকর্তাদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করে তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পাবে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রকৃত্যকদের ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

2. অনেকে সুপারিশ করেন যে প্রধানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করার অধিকার কর্মীর থাকা উচিৎ। এই আবেদন বিবেচনা ও কর্মীর যোগ্যতার পুনর্মূল্যায়ন করার দায়িত্ব বিভাগের বাইরের কোনও সংস্থার ওপর ন্যস্ত হওয়া উচিৎ।

3. পদোন্নতির জন্য নির্ধারিত ফর্ম থাকলে কর্তৃপক্ষ কর্মীর আচরণবিধি, বিভাগের প্রতি আনুগত্য, কর্মনিষ্ঠা, উদ্যম, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক মূল্যায়ন করতে পারেন। প্রতিটি মতামতের যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ থাকলে নিরপেক্ষতার সঙ্গে পদোন্নতি বিবেচনার সুযোগ থাকবে।

যোগ্যতা পরিমাপক হিসাবে পরীক্ষা ব্যবস্থাও যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে।

দক্ষতার হার নির্ধারণ পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কর্মীর সার্ভিস রেকর্ড দেখা যায়। Efficiency rating বা হার নির্ধারণের জন্য কর্মীর উৎপাদনশীলতা, ব্যক্তিগত গুণাগুণ, জ্ঞান, উদ্যম, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং ধারাবাহিক অবদানের ওপর জোর দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষে 'গোপন প্রতিবেদন' (Confidential Report) কর্মীর পদোন্নতির প্রথম মাপকাঠি। উচ্চপদাধিকারীদের জন্য এর পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সাহায্য নেওয়া হয়। উচ্চপদাধিষ্ঠান নীতি ও যোগ্যতা পরিমাপক নীতি উভয়েই ভারতবর্ষে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। উচ্চপদের ক্ষেত্রে যোগ্যতার ওপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মধ্যবর্তী পর্যায়ে দুটি নীতিই কার্যকর হতে পারে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ক্ষেত্রে উচ্চপদাধিষ্ঠান নীতিই সাধারণভাবে কার্যকরী হয়।

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই উচ্চপদাধিষ্ঠান নীতি ও যোগ্যতা পরিমাপক নীতিউভয়ই পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেনডেলটন আইন (Pendleton Act, 1883) ও ব্রিটেন ফুলটন কমিটির (Fulton Committee) সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষ যোগ্যতা পরিমাপক নীতিই অধিক গুরুত্ব পায়।

২.৫ সারাংশ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিবর্তিত হয়ে গড়ে ওঠে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, আবার সাম্রাজ্যবাদ পরিবর্তিত হয়ে আসে নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদ। একবিংশ শতাব্দীতে নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদ নতুন নামে, নবকলেবরে বিশ্বায়ন নাম নিয়ে তথাকথিত উদারনৈতিক অর্থনীতির জয়যাত্রা ঘোষণা করে। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক দায়িত্বভারের আপাতদৃষ্টিতে লাঘব হয়, কারণ রাষ্ট্র আর উৎপাদক নয়। কিন্তু উন্নত রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই মর্মে বৃদ্ধি পায় যে আন্তর্জাতিক সমাজে রাষ্ট্রের প্রভাব বাড়াতে হবে, বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি যাতে উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। উন্নয়নশীল দেশে সন্ত্রাসবাদ, জাতিদ্বন্দ্ব প্রভৃতি সমস্যাগুলি অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা, মন্দা, দারিদ্র্য, বেকারত্বের হাত ধরে আসে, সেখানে রাষ্ট্রকে একদিকে এইসব অসুখের প্রতিরোধ্যে উদ্যোগী হতে হবে। এইসব কারণে down sizing সত্ত্বেও রাষ্ট্রের কৃত্যকগুলি যথেষ্টই বিপুলায়তন রয়ে গেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও, রাষ্ট্রের পাততাড়ি গোটানোর (roll back) মধ্যে প্রশাসনের কাজ ও দায়িত্ব মাত্রারিক্ত জটিল রয়ে গিয়েছে। তাই পঞ্চম বেতন কমিশন যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে 'It (State) has instead to ensure that there is a level playing field for both domestic and international players. At the same time, it would have to play a major part in promoting infrastructural and social services as also in combating poverty and unemployment.'[9] (রাষ্ট্রকে নিশ্চিৎ করতে হবে যে তার মধ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের বা কুশীলবদের জন্য একটা সমতাভিত্তিক ক্রীড়াক্ষেত্র আছে। একই সময়ে পরিকাঠামোমূলক এবং সামাজিক পরিষেবা উন্নতি করার জন্য এবং দারিদ্র্য ও বেকারত্বের মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রকে বড় ভূমিকা নিতে হবে)।

এই বহুমুখী গুরুত্বের কথা মনে রেখে বিভিন্ন রাষ্ট্রেই নিরন্তর প্রয়াস চলেছে যাতে প্রশাসনকে অপেশাদারি মনোভাব থেকে মুক্ত করে, যোগ্যতার নিরিখে কর্মী নিয়োগ করা যায় এবং প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যোগ্য ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করার জন্য পদের শ্রেণীবিভাজন, বেতন কাঠামো নির্ধারণ, পদোন্নতি ও বদলি প্রভৃতি ব্যবস্থা নিয়ে নিত্য গবেষণা ও আলোচনা বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এই কাজকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য কর্মী ব্যবস্থাপকের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

২.৬ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলি

১। বৃত্তি তথা উন্নতিমূলক উপজীবিকা হিসাবে রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

২। কর্মী ব্যবস্থাপনায় শ্রেণীবিভাজনের প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৩। কর্মী ব্যবস্থাপনায় ক্ষতিপূরণ বলতে কি বোঝায়?

৪। কর্মী ব্যবস্থাপনায় বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয় কিভাবে?

৫। পদোন্নতির জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন নীতির তুলনামূলক গুণাগুণ বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলি

১। পেশা বা বৃত্তি হিসেবে রাষ্ট্রকৃত্যকের বৈশিষ্ট্য কি?

২। পেশাগত রাষ্ট্রকৃত্যক বলতে কি বোঝেন?

৩। পেশাগত রাষ্ট্রকৃত্যককে গণতন্ত্রসম্মত বলা হয় কেন?

৪। রাষ্ট্রকৃত্যকে কর্মী নিয়োগের পর্যায়গুলি কি কি?

৫। উচ্চপদে সরাসরি নিয়োগ না পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ—কোন্‌টি অধিক সমর্থনযোগ্য? যুক্তি দিন।

৬। কর্মী শ্রেণীবিভাজনে নির্ধারক বিষয়গুলি কি কি?

৭। ন্যাশনাল (হোয়াইটলে) কাউন্সিলের সুপারিশ কি ছিল? এই সুপারিশের দুর্বলতা উল্লেখ করুন।

৮। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে শ্রেণীবিন্যাস কবে শুরু হয় ও তা কীরূপ ছিল?

৯। ব্রিটিশ ভারতে কর্মীব্যবস্থায় শ্রেণীবিভাজনের সূচনা হয় কীরূপে?

১০। Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules কবে প্রণীত হয় এবং কর্মীদের কিভাবে শ্রেণী চিহ্নিত করা হয়?

১১। শ্রেণীবিভাজনের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিন।

১২। বেতনকাঠামো নির্ধারণে পরিপূরক নীতি ও অপ্রতিযোগী অবস্থান নীতি ব্যাখ্যা করুন।

১৩। পদোন্নতির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

১৪। পদোন্নতির জন্য স্বীকৃত যোগ্যতা পরিমাপক নীতির ত্রুটিগুলি কি কি? এই ত্রুটি কিভাবে সংশোধন করা যেতে পারে?

বোধমূলক/নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলি

১। কর্মীব্যবস্থাপনায় শ্রেণীবিভাজন কাকে বলে?

২। কর্মীব্যবস্থাপনায় শ্রেণীবিন্যাসের সুপারিশ কে ও কবে করেন?

৩। ফেয়লের শৃঙ্খল বা Scaler Chain বলতে কি বোঝেন?

৪। ক্ষতিপূরণ বলতে কি বোঝায়?

৫। কোন্ রাষ্ট্রকে 'আদর্শ নিয়োগকর্তা' বলা যেতে পারে?

৬। (দক্ষতার হার) কিভাবে নির্ধারিত হয়?

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Gullick, L. Notes on the Theory of Organisation, Papers on the Science of Administration, p. 13.
2. Finer, Herman, *Theory and Practice of Modern Government*, p. 172.
3. "Organisation Theory and Civil Service, Reform in Public Administration", Journal of the Royal Institute of Public Administration, Vol. 43, pp. 313-316, referred from Basu, Rumki, *Public Administration* (concepts and theories), p. 296
4. Willoughby, W. F. *Principles of Public Administration*, p. 203
5. Basu, Rumki, *OP cit.*, p. 299
6. *Ibid.*, p. 309
7. Mark, Fritz Marstein, Eluments of Public Administration (New York, Prentice-Hall, 1946) *Report of Fifth Pay Commission*, p. 13. ; White, L. D. *Introduction to the Study of Public Administration*, p. 274. ; Report of Fifth Pay Commission, pp. 10.
8. Dimock Marshall E., Dimock Gladys O., and Koening, Lous W., *Public Administration* (New York : Rine hart and Co. Inc. 1959).

9. White L. D., *Introduction to tne Study of Public Administration* (New York : MacMillan Company, Fourth Edn., 1958)

10. Report of the Committee of Position Classification and Plans in Public Service of the Civil Service Assembly of U. S. and Canada, quoted in Vishnoo Bhagwan and Vidya Bhusan, *Public Administration*, (New Delhi : S. Chand, 1996)

11. Henry Nicholes, *Public Administration and Public Affairs* (New Delhi : Prentice-Hall of India, 1999), especially chapter 9. "Managing Human Resources in the Public Sector", pp. 236-90.

একক ৩ ❑ কর্মীব্যবস্থাসমূহের ভিত্তিসমূহ

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ কর্মীব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ

৩.২.১ পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থা

৩.২.২ উন্নতব্যবস্থার পথে উত্তরণ

৩.৩ লণ্ঠনভাগ

৩.৪ স্থায়ীকার্যকাল ভিত্তিক কর্মীব্যবস্থা

৩.৪.১ যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন

- আধুনিক কর্মীব্যবস্থাগুলির ভিত্তি কীভাবে স্থাপিত হয়।
- কীভাবে Spoils System থেকে Tenure System হয়ে আধুনিক কর্মীব্যবস্থা একটি Merit System হয়ে উঠেছে।
- এই ক্রমবিকাশের পিছনে কী কী প্রশাসনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল।

৩.১ প্রস্তাবনা

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থান বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়। উপনিবেশগুলোতে কর্তৃত্ব বিস্তার, অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও স্বদেশে জনকল্যাণকামী হয়ে ওঠার দ্বৈত চাপে পশ্চিমী রাষ্ট্রে প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়, প্রয়োজন হয় সুদক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের। ঔপনিবেশকতার অবসান হলে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে জাতি গঠনের (National building) সমস্যা দেখা দেয়। নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদ উন্নত দেশে ও উন্নয়নশীল দেশে দু'রকম সমস্যা সৃষ্টি করে। বিশ্বায়নের নবরূপে সজ্জিত হয়ে এই নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদ নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। উনবিংশ থেকে একবিংশ

শতকের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নানান পর্যায়ে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মীব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সময়ের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মীর দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আলোচ্য এককে কর্মীব্যবস্থার সূচনা থেকে শুরু অদ্যাবধি যে প্রকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, তা সবিস্তারে বিশ্লেষিত হয়েছে।

সরকারি প্রশাসন পরিচালিত হয় একটি জটিল ও বিস্তৃত সাংগঠনিক পরিকাঠামোর দ্বারা প্রত্যেকটি পর্যায়ে নির্দিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই পরিকাঠামোকে সচলতা প্রদান করে। এই সকল কর্মীরা পরস্পরের সঙ্গে একটি সরকারি নির্দেশের ও ব্যবস্থার সূত্রে গ্রথিত থাকে। তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাজেট তৈরি, পরামর্শ প্রদান, সমন্বয় থেকে শুরু করে সরকারি নীতির বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে কর্মীবৃন্দের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সার্বিকভাবে সরকারি সংগঠন কয়েকটি বিভাগীয় একক তথা মন্ত্রকে বিন্যস্ত। সরকারের বহুমুখী দায়িত্ব ও কর্মপ্রকল্প যাতে সুষ্টুভাবে বাস্তবায়িত হয়, সেইজন্য দায়িত্ব বন্টনের এই ব্যবস্থা গুরুত্ব পেয়েছে। প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে সুস্পষ্ট ক্ষমতা বিভাজন সরকারি কর্মপ্রচেষ্টায় দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা সুনিশ্চিত করে। উপরন্তু এর ফলে কাজের এলাকা চিহ্নিত থাকায় সংঘাতের সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং অনেকক্ষেত্রেই বিভাগগুলি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। এইরূপ সুনিপুণ কার্যসম্পাদনের জন্য মন্ত্রীমহোদয়ের কর্মকুশলতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার না করেও বলা যায়, মূলত অথচ স্তরবিন্যস্ত স্থায়ী কর্মীবৃন্দের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে প্রশাসনের কার্যকারিতা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট দল ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ অনেক প্রত্যক্ষ ও শক্ত হলেও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কর্মীদের স্বাতন্ত্র্য তুলনামূলকভাবে বেশি। উচ্চপদস্থ কর্মীরা এখানে নিজেরাই একটি শ্রেণীবিশেষ। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, যেমন মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে ও ভারতে আঞ্চলিক স্তরে কর্মীদের সক্রিয়তা একটি বিশেষ প্রয়োজন হিসাবে স্বীকৃত। উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সম্পদের অপ্রতুলতা, রাজনৈতিক অজ্ঞতা, অসচেতনতা, সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা প্রভৃতি দুর্বলতা দূরীকরণে যে গতিশীল ও উচ্চকাঙক্ষী কর্মীসংগঠনের প্রয়োজন তার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মীব্যবস্থার বুনিয়াদ নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

দক্ষ কর্মীর অপরিহার্যতা প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনুভূত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসেও এদের ভূমিকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এশিয়ার অন্যান্য দেশে যেমন চীনেও প্রশাসন পরিচালনায় কর্মীবৃন্দের ভূমিকার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। সামন্ততন্ত্রের অবসান ও ধনতন্ত্রের সূচনা বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সর্বস্তরেই দক্ষ কর্মসম্পাদনের তাগিদ অনুভূত হয়। অতঃপর প্রয়োজন হয় শৃঙ্খলাপরায়ণ, স্থায়ী, নিরপেক্ষ ও যোগ্য কর্মীবৃন্দের, যাদের মাধ্যমে প্রশাসনিক দায়িত্ব নির্বাহ সহজসাধ্য হবে এবং যাদের কর্মপ্রচেষ্টা ও দক্ষতা গণতান্ত্রিক সরকারকে কল্যাণকামী হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

৩.২ কর্মীব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ

বৃহদায়তন প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে যে কর্মীব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তা এক রাত্রে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেনি। The Civil Service, as Grahan Wallace said, "is one great political invention in nineteenth century England.

৩.২.১ পৃষ্ঠপোষকতামুলক ব্যবস্থা

ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের গৌরবময় অধ্যায়ে রাজপরিবারের সদস্যরাই সরকারি কাজ সম্পাদন করতেন। সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পরে Patronage System তথা পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থা উদ্ভুত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা কোনও অবস্থাতেই মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের বা সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের বদলের ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল না। অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কর্মচারী বদলের নীতি বা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের সরকারিপদে নিয়োগের নীতি অনুসৃত হয়নি। একজন কর্মচারী বা অধিকর্তা একবার নিযুক্ত হলে সুস্বাস্থ্য ও দক্ষতা বজায় থাকলে কর্মে আসীন থাকতে পারতেন। ব্যক্তিগত আনুকূল্য ও রাজনৈতিক সুবিধার ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থাকে পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থা বলা হয়, যা গ্রেটব্রিটেনে 1853 সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

৩.২.২ উন্নত ব্যবস্থার পথে উত্তরণ

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বার্ক, বেন্থাম, কার্লাইল প্রমুখরা এই ব্যবস্থার সমালোচনা শুরু করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

ডঃ ফাইনারের মতে 1833 সালের চার্টার আইনেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। 1853 সালের 23 জুন লর্ড মেকলে মুক্ত প্রতিযোগিতার বিষয়টি কমন্সসভায় সমর্থন করেন। 1854 সালের জুলাই মাসে মেকলের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। পরিশেষে পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থার বিলোপ, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ, নির্দিষ্ট বয়সসীমা নির্ধারণ, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠন, প্রশাসনিক ও করণিক কাজের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ ইত্যাদির সমর্থনে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের দিকে তাকিয়েই পরীক্ষার কাঠামো নির্নীত হয়।

প্রথমে ব্রিটিশ-ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক ও 1870 সালে ব্রিটিশ রাষ্ট্রকৃত্যক এই পরীক্ষার আওতায় আসে। গ্ল্যাডস্টোনের উদ্যোগে একটি রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠিত হয়। দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ, কৃত্যকে স্তরবিন্যাস, দায়িত্ব বিভাজন, মহিলাদের সুযোগ প্রদান, বেতনকাঠামো নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।

1966 সালে ব্রিটেনের সরকার সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লর্ড ফুলটনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কর্মীব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় বিষয় তথা কর্মীব্যবস্থার গঠন, কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বেতন প্রভৃতি নিয়ে এই কমিটি আলোচনা ও বিতর্ক করে। 1968 সালের জুন মাসে কমিটি তার প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিটি প্রথম সাধারণ কৃত্যক বনাম বিশেষজ্ঞ কৃত্যকের বিতর্ককে উৎসাহিত করে। ফুলটন কমিটিই প্রথম রাষ্ট্রকৃত্যককে পেশা বা বৃত্তিতে উত্তীর্ণ করার কথা বলে। সংগঠনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মী নিয়োগের সুপারিশ করে ফুলটন কমিটি। এই কমিটির প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠা করে যে, রাষ্ট্রকৃত্যক আর শৌখিনতা নয়, একটি বৃত্তি। প্রশাসনে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন বেশি ও পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে সাধারণ প্রশাসকরা যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ফ্রেডারিক সি. মোশার (Frederick C. Mosher) পল অ্যাপেলবি (Paul Appleby) প্রমুখরা এই ধারণার বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে বিশেষজ্ঞদের প্রাধান্য বৃদ্ধি গণতন্ত্রের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উন্নয়নশীল দেশেও বিশেষজ্ঞদের প্রাধান্য বৃদ্ধি সমাজের স্বার্থে শুভ বলে গণ্য হয় না।

ফুলটন কমিটির সুপারিশক্রমে 1968 সালের নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাষ্ট্রকৃত্যক বিভাগ গড়ে ওঠে। 1970 সালের জুন মাসে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে দুটি রাষ্ট্রকৃত্যকে মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠে। 1971 সালের জানুয়ারি মাসে করণিক শ্রেণী থেকে প্রশাসনিক অধিকর্তা পর্যন্ত সকল কর্মীকে স্থায়ীভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ কাঠামোর পুনর্বিন্যাস হয়।

1920 সালে জাতীয় পরিষদের পুণর্গঠন কমিটির (Reorganisation Committee) সুপারিশ অনুযায়ী প্রশাসনিক ও করণিক স্তরে মধ্যবর্তী পর্যায়ে একটি কার্যনির্বাহী স্তর সৃষ্টি করা হয়। প্রশাসনিক স্তরকে 'Permanent Brains Trust' বলা হত। অর্থাৎ এই স্থায়ী কৃত্যক সরকারকে পরামর্শ প্রদান করত এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে নির্দেশ প্রেরণ ও নানান প্রশাসনিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করত।

এই ভাবে যে স্থায়ী কৃত্যক গড়ে ওঠে তার কর্তব্য সম্বন্ধে স্যার ওয়ারেন ফিশার বলেন যে 'নীতি নির্ধারণ মন্ত্রীর কাজ এবং একবার কোনও নীতি নির্ধারিত হলে রাষ্ট্রকৃত্যকের পক্ষে তা বিনাপ্রশ্নে কার্যকর করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু নীতি নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রকৃত্যকের কর্তব্য হল মন্ত্রী মহোদয়কে যাবতীয় তথ্যাদি সযত্নে সরবরাহ করা এবং স্থায়িত্বের সুবাদে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রধানকে পরামর্শ প্রদান করা।' জেনিংস স্থায়ী, রাষ্ট্রকৃত্যকের কাজ বলতে 'পরামর্শ দেওয়া, সতর্ক করা, সরকারি নীতি ও বক্তব্যের খসড়া প্রস্তুত করা, নীতি প্রয়োগের সঙ্গে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত করা প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন।

পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থা থেকে স্থায়ী কার্যকাল সম্পন্ন কৃত্যক ব্যবস্থায় উত্তরণের এই দীর্ঘ পর্যায়ে রাষ্ট্রকৃত্যকের কাজ বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। এমন নয় যে ব্রিটেনে আর কোনও অবস্থাতেই রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত প্রভাবে কর্মী নিযুক্ত হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রকৃত্যকের আনুগত্য, নীতিনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা, দক্ষতা প্রভৃতি স্থায়ী রাষ্ট্রকৃত্যকের উপযোগিতা বৃদ্ধি করায় পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থার গুরুত্ব ক্রমহ্রাসমান।

৩.৩ লণ্ঠনভাগ

মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের রাষ্ট্রকৃত্যকে নিয়োগের যে ব্যবস্থা স্বীকৃত তাকে Spoils System বলা হয়। এই ব্যবস্থাকে 'Hiring, and Firing' ও বলা হয়। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগে রাষ্ট্রপতির ভূমিকাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। কৃত্যকের একাংশ সংবিধান বা কংগ্রেস প্রণীত আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতির দ্বারা সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে নিযুক্ত হয়। অপর একটি অংশ আইনানুযায়ী একক ভাবে রাষ্ট্রপতির দ্বারা বা অন্য কোনও ভাবে নিযুক্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Spoils System কথাটির একটি ঐতিহাসিকতা আছে। এই ব্যবস্থাটি চালু হয় 1829 সালে Andrew Jackson রাষ্ট্রপতি হবার পর। Leonerd W. White তাঁর The Jaeksowiens গ্রন্থে (1954) দেখিয়েছেন যে এই ব্যবস্থার নামটি আসে নিউইয়র্কের সেনেটের William L. Mercy-র একটি উক্তি থেকে। তিনি বলেছিলেন মার্কিনী রাজনীতিবিদরা "see nothing wrong in the rule that to the victor belongs the spoils of the enemy", spoils system ব্যবহারের পিছনে যে যৌক্তিকতা ক্রিয়াশীল ছিল সেটা হল এই যে রাষ্ট্রপতিরা যদি Jackson-এর মতো একটি শ্রেণী থেকে আত্মপ্রকাশ করেন, যেটিতে নিজের জীবিকা নিজেকেই অর্জন করতে হবে, তবে রাজনীতিকেও লাভজনক হতে হবে। কিন্তু সরকারি আমলাতন্ত্রে spoils system ব্যবহারের সঙ্গে জ্যাকসনের নাম জড়িয়ে গিয়ে থাকলেও তিনি একেবারে নতুন কিছু করেননি। F. C. Mosher তাঁর Democracy and the Public Service গ্রন্থে (1968) দেখিয়েছেন যে জ্যাকসন রাষ্ট্রপতি হবার পর তাঁর পূর্বসূরী John Quinery Adams-এর দ্বারা নিযুক্ত যত উচ্চতম প্রশাসনিক আধিকারিককে অপসারিত করেছিলেন তাদের সংখ্যা জেফারসনের কাছাকাছি। জ্যাকসনের দ্বারা অপসারিত ব্যক্তির সংখ্যা প্রথম নিয়োগের 90%। আর জেফারসনের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ছিল 80%।

তাছাড়া এখনও কয়েক হাজার উচ্চপদস্থ অধিকর্তা রাষ্ট্রপতি ও সেনেটের দ্বারা বিনাবাধায় নিযুক্ত হয়। The Tenure Office Act এদের কার্যকাল চার বছর বলে স্থির করেছে। যে সকল ক্ষেত্রে এই কার্যকাল নির্দিষ্ট নয়, সেক্ষেত্রেও চারবছর পরে কর্মীবদল হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রপতি সেনেটের অনুমোদন নিয়ে সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্রে নিজের পছন্দের লোককে নিয়োগ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত পছন্দগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই সেনেটের দ্বারা অনুমোদিত হয়। সেনেটারীয় সৌজন্যবিধি (Senatorial Courtesy) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির এই পৃষ্টপোষকতা বিতরণের কাজে সাধারণভাবে বাধা দেওয়া হয় না।

অধস্তন কর্মীদের মধ্যেও 20 থেকে 30 শতাংশ পৃষ্ঠপোষকতা বা অনুগ্রহের ওপর ভিত্তি করে নিযুক্ত হয়। কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতি একই দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করলে, এই ব্যক্তিগত নিয়োগগুলি আরো সহজসাধ্য হয়।

পূর্বে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বা অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে, উচ্চপদাধিকারীকে আর্থিকভাবে বা অন্য কোনও ভাবে সন্তুষ্ট করে সরকারি চাকুরিতে বহাল হওয়া যেত। শুধু মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র নয়, ফ্রান্সে এই ব্যবস্থা রীতিতে পরিণত হয়েছিল। ফাইনার বলেছেন যে ফরাসি বিপ্লবের আগে সমস্ত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় দপ্তর ক্রয়যোগ্য বা দানসামগ্রী বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ হিসাবে গণ্য হত। পারিবারিক বা আর্থিক আনুকূল্য ছাড়া কেবল যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রায় অনুপস্থিত ছিল।

1883 সালে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে পেনডেলটন আইন (Pendleton Act) প্রণীত হয়। সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ বিতরণের ব্যবস্থার বদলে প্রার্থীর যোগ্যতার নিরিখে তাকে নিয়োগের ব্যবস্থা চালু করা হয় এই আইনের দ্বারা। তদানিন্তন মার্কিন সেনেটের সদস্য জর্জ পেনডেলটন তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ঃ নিয়োগের পূর্বে যোগ্যতা পরিমাপের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রচলন, সরকারি কৃত্যকে চাকুরির স্থায়ীত্ব তথা কর্মীর নিরাপত্তা, ও নিরপেক্ষতা। বর্তমানে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে 20-30 শতাংশ ক্ষেত্রে Spoils System কাজ করলেও মূলত Tenure system অর্থাৎ যোগ্যতা ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীর স্থায়ী কার্যকাল সুনিশ্চিত করার গণতান্ত্রিক নীতিই অধিক কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন উভয়েই সরাসরি কর্মী নিয়োগের নীতিকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমর্থন করে। অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতেও Spoils System সাহায্য নেওয়া হয়।

কালক্রমে Spoils System-এর ত্রুটিগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। প্রশাসনিক অদক্ষতা, দলবাজি, দুর্নীতি, অসততা প্রভৃতির উৎস হিসাবে একে দায়ী করা হয়। তবে 1888 সালেই প্রধানত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার প্রচলন হয়। অতি ক্ষুদ্র একটি অংশকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। 1905 ও 1916 সাল নাগাদ অর্ধেকের বেশি কর্মীকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

জয়ী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের প্রশাসনে নিয়োগ ও অস্থায়ী কার্যকাল যে Spoils ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল, তা প্রথম ধাক্কা খায় 1881 সালে রাষ্ট্রপতি গ্যারফিল্ডের হত্যার ফলে। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতিদের নিরাপত্তার স্বার্থেই পেনডেলটন আইন প্রণীত হয়। অদক্ষতা, রাজনৈতিক দুর্নীতি, দলগত অনৈতিকতা, কর্মশৈথিল্য, অনভিজ্ঞতা, প্রশাসনের রাজনীতিকরণ প্রভৃতি দুর্বলতাগুলি Spoils ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

রাজনৈতিক জীবনে বিশুদ্ধিকরণ, উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথার্থ অবস্থানে নিয়োগ, প্রশাসনে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীর ব্যবহার, নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে স্থায়ী কার্যকাল সম্পন্ন কর্মী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৩.৪ স্থায়ী কার্যকাল ভিত্তিক কর্মীব্যবস্থা (Tenure System)

Tenure বা স্থায়ী কার্যকালভিত্তিক ব্যবস্থা কেন Patronage ও Spoil ব্যবস্থাকে সরিয়ে দিল তার ব্যাখা আদৌ কঠিন নয়। সরকারি প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য সুদক্ষ, সুবিবেচক, বিচক্ষণ, কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল ও অভিজ্ঞ, বিশ্বাসযোগ্য কর্মীর প্রয়োজন। এই সকল গুণের সমন্বয় করতে গেলে কার্যকালের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। কার্যকালের স্থায়িত্ব একদিকে যেমন কর্মীর মনে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মীর সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীর আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। কর্মীবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত উন্নত হওয়ায় সহযোগিতা ও সমন্বয় সহজসভ্য হয়ে ওঠে ও পরিচালকের সঙ্গে কর্মীর একাত্মতাবোধ গড়ে ওঠে। স্থায়ী কর্মীর অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে।

সমালোচকরা মন্তব্য করেন, কর্মীর স্থায়িত্ব তার দুর্নীতি প্রবণতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। একই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন থাকার ফলে কায়েমি স্বার্থ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অযোগ্য কর্মীর স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠানে কার্যকারিতা বিনষ্ট করতে পারে। সার্বিকভাবে স্থায়ী কর্মীর চাপে নতুন নিয়োগের সুযোগ সীমিত হয়ে যায়, ফলে সংগঠনের আধুনিকীকরণ সমস্যার বিষয় হয়ে ওঠে বলেও সমালোচনা করা হয়। কিন্তু পদোন্নতি, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা, বদলি প্রভৃতি এমন কিছু রীতি সব রাষ্ট্রেই ব্যবহৃত হয়, যার দ্বারা এই ত্রুটিগুলি দুর করা যেতে পারে। ব্রিটেনে স্থায়ী কর্মীদের সততা, আনুগত্য ও নৈতিকতা উদাহরণযোগ্য। ভারতে সার্বিক অবক্ষয় রাষ্ট্রকৃত্যককেও প্রভাবিত করেছে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব, রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছা ও নৈতিকতা প্রভৃতি নানান বিষয়ের ওপর রাষ্ট্রকৃত্যকের গুণগতমান নির্ভর করে। কার্যকালের স্থায়িত্ব এমন একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ যে এই সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে তাকে স্বাগত জানানই একমাত্র বিকল্প।

Oxford Advanced Learner's Dictionary 'tenure' বলতে বোঝায় "holding of (e.g. political) officer or land or other property" এবং 'period or manner of this'। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে, অভিধানটি অনুযায়ী এর অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষকের 'permanent appointment', Tenure System বলতে বোঝাবে এমন প্রশাসন ব্যবস্থা যেখানে কর্মীর নির্দিষ্ট কার্যকাল আছে। এর অর্থ 'tenure during good behaviour'। এই tenure না থাকলে আধিকারিকদের কী অবস্থা হয় তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন উইলোবি : "About the time officers and employers have thoroughly learned the duties of their positions and have acquired proficiency in their performance, they will drop out and their places will be taken by new and talented employees."।

ভারতবর্ষে সচিবালয়ে কর্মী নিয়োগে tenure ব্যবস্থা পবিত্র নিয়মে পরিণত হয় Lord Curzon-এর সময়ে, 1905 থেকে। সেখানে রাজ্যগুলি থেকে এবং কখনও কখনও কেন্দ্রীয় কৃত্যকগুলি থেকে আধিকারিকদের সচিবালয়ে আনা হত, এবং তাঁদের 'tenure' শেষ হবার পর আবার স্বস্থানে ফেরত পাঠানো হত। Simon Commission (1930), Maxwell Committee (1937), ইত্যাদি এই ব্যবস্থার সমর্থন করেন। কিন্তু ব্রিটিশ আমলেও Foreign and Political, Indian Audit and Accounts, Posts and Telegraphs, Customs and Income Tax ইত্যাদি দফতরে 'tenure' ব্যবস্থা চালু ছিল না। আবার Central Secretarial Service এর, 1938 সালে Finance-Commerce Pool-এর এবং 1957 সালে Central Administration Pool-এর সৃষ্টি এই ব্যবস্থাকে গভীর চ্যালেঞ্জর মুখে ফেলে দেয়। তবুও 1945 সালে Bengal Administration Enquiry Committee (Rowlands Committee) বলেছিল যে সচিবালয়ে কোনো পদে কোনো আধিকারিক আসতে পারবেন 12 বছর field experience-এর, অর্থাৎ মাটির কাছাকাছি অভিজ্ঞতার পর। সচিবালয়ে আসতে রাজি হলে বাকি সময় তাঁরা কেন্দ্রীয় সচিবালয়েই কাটাতে পারবেন।

ভারতবর্ষে Tenure System চালু হয়েছিল প্রধানত এই কারণে যে ব্রিটিশ আমলে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা চালু ছিল। আর মাহেশ্বরীর ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকার ছিল ভারতবর্ষের সরকারগুলির সরকার, ভারত সরকার নয় ("the Central Government was a Government of the Government in India rather than a Government of India")। আর প্রয়োগিক অর্থে ভারত সরকারের তখন কোনো নিজের স্থায়ী রাষ্ট্রকৃত্যক ছিল না, আর এখনও Central Secretariat Service বাদে নেই। ফলে মধ্যস্তরীয় এবং উর্ধ্বস্তরীয় প্রশাসকদের পদগুলি রাজ্য থেকে নির্দিষ্ট 'tenure'-এর ভিত্তিতে deputation এ আসা IAS আধিকারিকদের দিয়ে ভরতেই হত। এখনও অনেক বিকৃতি সত্ত্বেও এবং বিভিন্ন 'pool' এর আত্মপ্রকাশের ফলে অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও 'tenure' ব্যবস্থা টিকে আছে। অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে Central Staffing Scheme অনুযায়ী অনেক আধিকারিক কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে যান এবং নিজেদের ক্যাডারে ফিরেও আসেন।

মেধাব্যবস্থা বা Merit System হল আধুনিক রাষ্ট্রকৃত্যকের সর্বস্বীকৃত প্রথা। প্রখ্যাত কর্মী-সংস্থানতাত্ত্বিক Glenm O Stahl তাঁর Public Personel Administration বইতে বলেছেন প্রসারিততম অর্থে সরকারের মেধাব্যবস্থা বলতে বোঝায় "a personal system in which comparative merit on achievement governs each individual's selection and progress in the service and in which the conditions and rewards of performance contribute to the competency [sic] and continuity of the service". (এমন কর্মী ব্যবস্থা যেখানে তুলনামূলক মেধা বা কৃতিত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কৃত্যকে বাছাই এবং অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং যেখানে কর্মসম্পাদনের শর্তগুলি এবং পুরস্কারগুলি কৃত্যকের দক্ষতা ও ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে)। ভারতবর্ষের প্রশাসনব্যবস্থায় কর্মীর অবস্থান কেবল স্থায়ীই নয়, মেধানির্ভর। পরের উপ এককে আমরা তার আলোচনা করব।

৩.৪.১ যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চীন সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করে। 1857 সালের পরে প্রাশিয়ায় পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে ধীরে ধীরে বিধিবদ্ধ নিয়োগের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। 1883 সালে 'রাষ্ট্রকৃত্যক আইন' প্রবর্তনের মাধ্যমে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে Spoils ব্যবস্থার প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে 'যোগ্যতা নীতি'র গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়। 1853 সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার যোগ্যতা নীতির প্রবর্তন করেন।

বর্তমান গণতন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এমন একটি কর্মীসংগঠনের প্রয়োজন, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান, নিয়মনিষ্ঠ, সুদক্ষ ও স্থায়ী এবং কার্য সম্পাদনে সুনিপুণ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সীমিত ও অনিশ্চিৎ কার্যকাল, তাদের অনভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক জটিলতা সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞানতা রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থার ওপর প্রশাসনের নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলে। উন্নয়নশীল দেশেও দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সম্পদের অপ্রতুলতা। রাজনৈতিক অজ্ঞতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা, সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা প্রভৃতি, যোগ্য ও সুদক্ষ কর্মীবৃন্দের অপরিহার্যতার কথাই স্মরণ করায়।

'রাজনৈতিক অর্থনীতির বিকাশের আধুনিক ধারায় ব্যক্তির পছন্দ ও ব্যক্তির স্বার্থের বিষয়টি উত্তরোত্তর গুরুত্ব পেতে থাকে। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নীতি সংকীর্ণ আইনগত গণ্ডীর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার স্বতঃস্ফুর্ত আবেদনে সাড়া দেবে, পাব্লিক চয়েস (Publice Choice) তাত্ত্বিকরা এই প্রত্যাশা করেন। অস্ট্রোম, ক্লস অফ, ইয়েটস, ইভা এট্জায়নি হেলভি প্রমুখরা প্রশাসনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেন, যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগবাদী এমন একটি অর্থনীতির বিকাশে সহযোগিতা করবে, যা ব্যক্তিগত স্তরে সর্বাধিক উপযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেবে।

বিশ্বায়নের নবকলেবর বিশ্ববাজারে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে নতুন ভাবনাচিন্তার সূচনা করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, আন্তঃরাষ্ট্র নির্ভরতা, পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সহযোগিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতা ও সতর্কতার সঙ্গে কার্যনির্বাহ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন (computer internet) প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকে এক অত্যাবশ্যক বিষয়ে পরিণত করেছে। এমতাবস্থায় যোগ্য, গঠনমুলক, সংবেদনশীল কর্মী প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। যোগ্য কর্মী নিয়োগ ও পরবর্তী প্রতিটি পর্যায়ে তার দক্ষতার মুল্যায়ন ও দক্ষতার বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ কর্মীব্যবস্থাপনার মুল্য লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

কর্মীব্যবস্থাপনায় যে বিষয়গুলির ওপর বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা হল :

- স্থায়ী কার্যকাল ও নিশ্চয়তা।
- গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রকৃত্যকে নিয়োগের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমযোগ্যতা সম্পন্ন সকলকে সমান সুযোগ প্রদান।
- যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং পদোন্নতির সময়ে দক্ষতা ও ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় মুল্যায়ন।
- নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণের সুপারিশ করা।
- কর্মরত অবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

প্রশাসনের নিম্ন থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বত্র পেশাভিত্তিক রাষ্ট্রকৃত্যকে যোগ্যতা পরীক্ষা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরের প্রত্যেকটি পদে যোগ্যতার নিরিখে কর্মী নিয়োগ সব রাষ্ট্রেই রীতিতে পরিণত হয়েছে। নিয়োগ ও পদোন্নতির সময়ে কর্মীর যোগ্যতার স্বীকৃতি কর্মীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তাকে কাজে উৎসাহিত করে ও সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে। কর্মীর তৃপ্তি, উদ্যম ও আনুগত্য বৃদ্ধি পেলে সার্বিকভাবে প্রশাসন লাভবান হয়।

যোগ্যতা বিচারের জন্য প্রধানত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে একদিকে যেমন প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা পরিমাপ করা সম্ভব, অন্যদিকে প্রার্থীদের সেরাদের বেছে নেওয়ার কাজও সহজসাধ্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক সাক্ষাৎকার ও ব্যবহারিক প্রদর্শন যোগ্যতা পরিমাপের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গুরুত্বপূর্ণ পদে শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক শ্রেষ্ঠতাও পরিমাপ করা হয়।

লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান, যুক্তিবোধ, উপস্থিত বুদ্ধি, কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয় এবং বিষয়ের ওপর প্রার্থীর জ্ঞান পরিমাপ করা হয়। গ্রেটব্রিটেন ও ভারতবর্ষে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য বিষয়াদির ওপর জ্ঞান পরীক্ষাও করা হয়। এই ব্যবস্থার মুখ্য প্রবক্তা মেকলের (Macaulay) মতে, '... the intellectual capacity of a candidate was also a proof of his moral worthiness ...'[7] ফ্রান্স ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কৃত্যকের চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষার বিষয় নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন পুলিশ পরিষেবার জন্য আইন, ভূগোল, অপরাধ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান পরিমাপ করা হয়। অর্থনৈতিক বিভাগের জন্য অর্থনীতি, হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। ভারতে যেমন অনেক ক্ষেত্রে All India Service বা সর্বভারতীয় কৃত্যকের এক সঙ্গে পরীক্ষা হয়, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে বা ফ্রান্সে তা সম্ভব নয়।

লিখিত পরীক্ষায় মৌলিক, ছোট ও বড় উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের সমন্বয় করা হয়। ভারতে প্রবন্ধ রচনার ওপর জোর দেওয়া হয়, যাতে তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞানের সঙ্গে যথার্থভাবে তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতাও পরীক্ষিত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক মূল্যায়ন (Negative marking) অর্থাৎ ভুল উত্তরের জন্য নেতিবাচক নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, যাতে প্রার্থীর জ্ঞানের যথার্থতা বিবেচনা করা যেতে পারে।

মৌখিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থীর ব্যক্তিসত্ত্বা পরীক্ষিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও যদি প্রার্থী সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযোগী, উদ্যমী, উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন, স্থিরপ্রতিজ্ঞ প্রমাণিত না হয়, তা হলে সে বাতিল বলে বিবেচিত হয়। গ্রেটব্রিটেনে রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগ পরিষদ মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনা করে।

মৌখিক পরীক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলা হয় :

- অল্প সময়ের মধ্যে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলি নির্ণয় করা যায় না।
- পরীক্ষা কর্তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
- প্রার্থীর আপাত সপ্রতিভতা, বেশভূষা, চাকচিক্য মূল্যায়নকারীদের প্রভাবিত করতে পারে।
- মৌখিক পরীক্ষা অনেক সময়েই নিয়োগ নয়, বাতিলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ডঃ এইচ ফাইনার এই ত্রুটি দুর করার জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেছেন ঃ

- অন্তত আধঘন্টা পরীক্ষার ব্যবস্থা।
- পাঠ্য বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন।
- চূড়ান্ত নয়, সহায়ক পরীক্ষা হিসাবে স্বীকৃতি।
- পরীক্ষা পরিষদে ব্যবসায়িক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সদস্যদের অন্তর্ভূক্তি।
- লিখিত পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষা।
- পরীক্ষকের আত্মসংযম।
- অল্প নম্বরে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।

ভারতে সম্পূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, ও রাজ্যস্তরে রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন IAS, IPS, IFS প্রভৃতি গ্রুপ 'এ' তালিকাভুক্ত এবং কেন্দ্রীয় সচিবালয় পরিষেবা, রেলওয়ে সচিবালয় পরিষেবা প্রভৃতি গ্রুপ 'বি' তালিকাভুক্ত। এই সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলিতে আবেদন করতে হলে যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও ভারতীয় নাগরিক হওয়া আবশ্যক। প্রাথমিক (Preliminary) ও প্রধান (Main) এই দুইপর্বে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে থাকে মৌলিক ছোটপ্রশ্ন ও পরবর্তী পর্বে থাকে প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন ও মৌখিক সাক্ষাৎকার। প্রাথমিক পর্বে 450 নম্বর ও প্রধান পর্বে প্রতিটি বিষয়ের ওপর 300 নম্বর ধার্য থাকে। 250 নম্বরের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

গ্রেটব্রিটেনে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন এই দায়িত্বে থাকে। সকল দেশেই এই কমিশনের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। কোনও ভাবে যাতে এই কমিশন শাসন বিভাগ বা অন্য কোনও সংস্থার দ্বারা প্রভাবিত না হয়, সে জন্য এর সদস্যদের নিয়োগের সময়ে সর্তকতা অবলম্বন করা হয়।

ভারতীয় সংবিধানের 316-319 ধারায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠন ও সদস্যদের কার্যকাল, কাজের শর্ত ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী কমিশনের সদস্যরা তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হ'ন। সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ 6 বৎসর। কিন্তু এর মধ্যে যদি কোনও সদস্যের বয়স 65 অতিক্রম করে, তাহলে তাকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। 317 (1) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কোনও সদস্যকে অসদাচারণের জন্য সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী অপসারণ করতে পারেন। কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোনও সদস্য ঐ পদে পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন না। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যরা কেন্দ্রীয় রাজ্য কমিশনের চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হতে পারলেও অন্য

কোনও সরকারি পদে যোগ দিতে পারেন না। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের চেয়ারম্যান অন্য কোনও পদেই যোগ দিতে পারেন না। কর্মীব্যবস্থাপনায় কর্মীর যথার্থ মূল্যায়ন যাতে সম্ভব হয়, সেজন্য কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা সকল রাষ্ট্রেই যথাসম্ভব সুরক্ষিত হয়েছে। বর্তমান জটিল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রশাসনের দায়িত্বভার এত বিস্তৃত হয়েছে, যে প্রশাসনিক গতিশীলতার জন্য প্রয়োজন প্রতিভাধর ও মেধাবী কর্মী। কমিশন যদি সৎ ও নিরপেক্ষ না হয়, তাহলে সে প্রকৃত মেধার সন্ধান করতে পারবে না। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন আংশিক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী নিয়োগের দায়িত্ব পালন করে। **The Union Public Service Commission only partially shoulders (in a passive fashion), the staffing responsibility in the central government.**

৩.৫ সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকদের আর্থ-সামাজিক কৌলিন্য

আই. এস. এস. মূলত ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার আই. সি. এস. উত্তরসূরি। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় আই. সি. এস. এর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, যে সব ভারতীয় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন, তারা সকলেই ভারতীয় সমাজের Elite সম্প্রদায়ভুক্ত। পারিবারিক ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা এই সমস্ত দিক থেকেই তারা ছিলেন সর্ব অর্থেই অভিজাত শ্রেণী। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভ করার পর প্রথম দশকে লক্ষ্য করা গেছে যে, যারা আই. এ. এস. হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিলেন, ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষিত, হিন্দুধর্মের উচ্চবর্ণভুক্ত শহরের অধিবাসী। 1967 সালের এ. আর. সি. এর প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা যায়। কিন্তু শুরুর থেকেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি প্রচেষ্টা ছিল যে, এই পরীক্ষাটির মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে কেবলমাত্র মেধার ভিত্তিতেই উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীরা যাতে এই চাকরীটিতে যোগদান করতে পারে। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা এই বিষয়ের ওপর করা হয়। যার থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আভিজাত্যের সীমানাকে ভেঙে মেধা সম্পন্ন সমাজের সাধারণ ব্যক্তিরা এই চাকরীতে যোগদান করেছেন।

1958 সালে আই. এ. এস. আধিকারিকদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন! সন্তোষ গয়ালতার সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, আই. এ. এস. অফিসারদের সিংহভাগই এখনও পর্যন্ত পুরুষদের হাতে 92.03% আই. এ. এস. অফিসারই পুরুষ অপরদিকে 7.07% মহিলা আধিকারিক বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখেছেন, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর থেকে যারা আই. এ. এস. হয়েছেন তাদের মধ্য থেকে 10% এর বেশি মহিলা পশ্চিমবঙ্গে 6.10% মহিলা আই. এ. এস. আধিকারিক।

ধর্মের প্রেক্ষাপটে গয়ালের সমীক্ষা দেখাচ্ছে যে, 75·5% হিন্দু 2·1% মুসলিম 2·0% খ্রীষ্টান, 5·3 % শিখ এবং 1% এরও কম জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় এমন কোন ধর্ম নির্ধারণ করা যাচ্ছে না এমন ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব 14·2%।

এই সমীক্ষার মাধ্যমে লক্ষণীয় যে, ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধিত্ব 37·6% এছাড়া শিক্ষিত হিসাবে (Literate Cust) তাদের প্রতিনিধিত্ব 68% অপরদিকে শূদ্রদের প্রতিনিধিত্ব 2%। এছাড়া সেই সময়ে এস. সি.দের জন্য 15% সংরক্ষণ ও এস. টি.দের জন্য 7·5% সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও তপসিলী জাতিদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র $^1/_3$ অংশ এবং এস. টি. দের ক্ষেত্রে $^1/_7$ অংশ সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করতে পেরেছিলো।

বয়সের (Age) প্রেক্ষাপটে গয়ালের সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, 63·6% 19-26 বয়সের মধ্যে, 10·9% 27-30 বয়সের মধ্যে এবং 24·7% 31-এর ওপরের বয়সের থেকে যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

গয়ালের সমীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 1985 সাল পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ছিল মুলত হিন্দু ধর্মের শিক্ষিত গোষ্ঠীর অল্প বয়স্ক পুরুষদের প্রাধান্য। সংরক্ষণের সুবিধা থাকলেও এবং কিছুটা এস. সি. রা সুবিধা লাভ করলেও এস. টি.দের প্রতিনিধিত্ব এই চাকরীটির ক্ষেত্রে খুবই সামান্য ছিল।

৩.৬ সারাংশ

1887 সালে উড্রো উইলসন জনপ্রশাসনের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার সুত্রপাত করেন। নীতি নির্ধারণ নীতি প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে তিনি জনপ্রশাসন পরিচালনায় দক্ষ কর্মীর অপরিহার্যতার ইঙ্গিত দেন। ম্যাক্স ওয়েবার ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির কথা বলেন। রিগস্ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রেক্ষিতে গতিশীল, নমনীয় প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। অস্ট্রোম, এটজায়নি, ক্লস অফ প্রমুখরা বাজারকেন্দ্রিক ভোগবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রশাসনের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করেন। তত্ত্বের জগতে যেমন প্রশাসনিক কর্মীর উপযোগিতা নানানভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মী পরিচালনার ধারণা বিবর্তিত হয়েছে, বাস্তব রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গনেও কর্মীব্যবস্থা নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে অনুগত কর্মীনিয়োগ বা রাজনৈতিক পুরস্কার হিসেবে কর্মীনিয়োগের ধারণা ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে স্থায়ী ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে কর্মীনিয়োগ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। জনকল্যাণকামী উন্নত বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির তাগিদ অনুভূত হয়। অস্থায়ী রাজনৈতিক নেতাদের নীতিনির্ধারণ ও প্রয়োগে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজন হয় স্থায়ী কর্মীবৃন্দের। ক্রমে ব্রিটেন, আমেরিকা থেকে শুরু করে ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সর্বত্রই বিভিন্ন পর্যায়ে স্থায়ী কর্মীরা প্রশাসনে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

যোগ্য কর্মীনিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয় নিরপেক্ষ ও দক্ষ সংস্থার হাতে। এই সংস্থাগুলির সুপারিশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত আইন ও সংবিধান অনুযায়ী স্থায়ী ও দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা হতে থাকে। নিযুক্ত কর্মীদের যোগ্যতা যাতে বজায় থাকে, সেই উদ্দেশ্যে তাদের 'On the Job Training' বা 'In Service Traning'-এর ব্যবস্থা করা হয়। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের অ্যাশেটন কমিটির সুপারিশ কম বেশি অধিকাংশ রাষ্ট্রে নিজস্ব পরিকাঠামো অনুযায়ী গৃহীত হয়।

নব্বই-এর দশকে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক সংস্কারের জোয়ার এসেছে, তা পরিণামে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বেসরকারি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রের দায়ভার লাঘব করলেও বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে সার্বিক জনকল্যাণ তথা স্বাস্থ্য শিক্ষা, জনকল্যাণ, পরিবেশ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও তার উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সমাজে কূটনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্বে পরিণত হয়েছে।

সাইবারনেটিক (Cybernetic) রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। বেসরকারি উদোগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজার অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা প্রদর্শন করতে হবে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অধিকতর দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বায়নের ধারাকে অপ্রতিহত করতে হবে। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা, সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তুলে প্রশাসনকে অনেক বেশি লক্ষ্য অভিমুখী আত্মনিয়ন্ত্রক ও গতিশীল হয়ে উঠতে হবে। তথ্য ও প্রযুক্তি যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ ব্যবস্থাকে অধিকতর দক্ষ ও যুক্তিনির্ভর করে তুলতে পারে, সেদিকে কর্মীব্যবস্থাপনাকে লক্ষ্যে রাখতে হবে। এই সব কারণে পেশাদারী, সুদক্ষ, গতিশীল ও নিয়ন্ত্রিত কর্মী সংগঠনই সাইবারনেটিক রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ। কর্মী সংখ্যার সংকোচন ও কর্মীর যোগ্যতা সুনিশ্চিতকরণই সাইবারনেটিক রাষ্ট্রের জনগণের চাহিদা।

৩.৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থা থেকে আধুনিক স্থায়ী ও মেধাভিত্তিক ব্যবস্থায় কর্মীপ্রশাসনের উত্তরণের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস লিখুন।

২। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক স্থায়ী কার্যকালভিত্তিক কর্মী ব্যবস্থা কীভাবে বিকশিত হয়?

৩। যোগ্যতার নিরিখে কর্মীনিয়োগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝেন?

২। ফুলটন কমিটির সুপারিশ কী ছিল ও তা কীভাবে কার্যকর হয়?

৩। পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থার থেকে স্থায়ী কার্যকাল সম্পন্ন কৃত্যক ব্যবস্থা শ্রেয় কেন?

৪। পেনডেলটন আইনের মুখ্য বিষয় কী ছিল?

৫। 'Spoils' ব্যবস্থা ও পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি কী কী?

৬। স্থায়ী কার্যকালভিত্তিক কর্মী ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিন।

৭। জনকল্যাণকামী আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কী ধরনের প্রশাসনিক কর্মী প্রয়োজন?

৮। আধুনিক কর্মী ব্যবস্থায় কী কী বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়?

৯। মৌখিক পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থায় দুর্বলতা ও তা দূর করার উপায় কী কী?

১০। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কী?

বোধমূলক/নৈর্ব্যক্তিক

১। পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থার সমালোচনা কারা করেন?

২। মেকলে কমিটি কবে ও কেন গঠিত হয়?

৩। ফুলটন কমিটি কবে ও কী উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল?

৪। 'Permanent Brains Trust' কাকে বলা হত?

৫। পেনডেলটন আইন কবে ও কেন প্রণীত হয়?

৬। 'Spoils' ব্যবস্থা কাকে বলে?

৭। 'Hiring and Firing' ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

৮। ভারতে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে ও গ্রেটব্রিটেনে কর্মীনিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করার বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলি কী নামে পরিচিত?

৯। নিয়োগকারী সংস্থার নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা প্রয়োজন কেন?

১০। ভারতে স্থায়ী কার্যকাল সম্পন্ন কর্মী ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তি কী?

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Finer, H., The British Civil Service (1937) P. 51.
2. Jennings, W. L., Cabinet Government, P. 114-115
3. Ibid, P. 116
4. Finer, H., The Theory and Practice of Modern Government. P. 17

5. Basu, Rumki, Public Administration, (Concepts and theories.), P. 299

6. Ghosh, Soma, 'কালের বিবর্তনে আমলাতন্ত্র', RBU Journal of Political Service, Vol. 4, 2001, R. B. U, P. 109

7. Sharma, M. P. Sadana, M. P., Public Administration I. Theory and Practice, 1996. P. 410

8. Ibid, P. 414

9. Maheswari, S. Indian Administration, P. 272.

10. Avasti and Maleswavi, Public Administration, P. 308

11. Henry Nicholas Public Administration and Public Affairs.

একক ৪ ❑ ভারতবর্ষে কর্মীব্যবস্থার বিকাশ ও প্রকৃতি

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ প্রাচীন ভারতে প্রশাসনিক কর্মীব্যবস্থা
৪.৩ মুঘল প্রশাসনিক কাঠামো
৪.৪ ব্রিটিশ ভারতে কর্মীব্যবস্থাপনা
৪.৫ স্বাধীন ভারতের কর্মীব্যবস্থা
৪.৬ সারাংশ
৪.৭ অনুশীলনী
৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ঃ

(ক) প্রাচীন ভারতবর্ষে কর্মীব্যবস্থার ও কর্মী প্রশাসনের কোন্ কোন্ দিকে বিকাশ ঘটেছিল।

(খ) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে কর্মীব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কী কী অগ্রগতি হয়েছিল?

(গ) ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে কর্মীব্যবস্থাপনার উদ্ভব কেন হয় এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ছিল?

(ঘ) স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে কর্মীব্যবস্থাপনা কী অর্থে ব্রিটিশ ঐতিহ্যের কাছে ঋণী।

(ঙ) সাম্প্রতিকতমকালে উদারনৈতিকায়ন—বেসরকারিকরণ—বিশ্বায়ন কর্মীব্যবস্থাপনার উপর কী কী ছাপ ফেলেছে?

৪.১ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষে প্রশাসন পরিচালনায় রাষ্ট্রকৃত্যক এবং সেই সঙ্গে কর্মীব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সব সময়েই বিবেচিত হয়েছে। প্রজাকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা ভারতে নতুন নয়। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, স্মৃতি, শ্রুতি, সংহিতা থেকে শুরু করে বৌদ্ধ সাহিত্য, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থে রাজা বা প্রশাসকের যে ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়, তা প্রধানত প্রজাবৎসল রাজার ভূমিকা। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র—রাষ্ট্রের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, প্রজানুরঞ্জন রাজার অন্যতম কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। অতএব নিঃসন্দেহে রাজ্যপাট পরিচালনায় রাজাকে দক্ষ কর্মীদের সাহায্য নিতে হত।

মহাভারতে শান্তিপর্বের 87 অধ্যায়ে এবং সভাপর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে A. S. Altekar internal administration (আভ্যন্তরিক প্রশাসন) এবং আদর্শ প্রশাসনের উল্লেখ পেয়েছেন। মহাকাব্যটি সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন রকমের বর্গের কথা বলে। যথা রাজযুক্ত (Rajayukta), রাজোপসেবিন (Rajopasevin) ইত্যাদি। এঁরা বোধহয় বাজারের আশেপাশে থাকতেন। তবে রাজপুরুষ (Rajyapurusha) যাঁদের বলা হোতো তাঁরা ঠিক অর্থে রাজার দেহ, সম্পদ ইত্যাদি রক্ষী নন, সরকারি কর্মচারী, জনপালন নির্বাহীদের জন্য নানান অভিধা ব্যবহৃত হয়েছিল। যথা—'ভৃত্য', 'সহায়বান', 'পরিপার্শ্বিকার' ও 'বহিশ্চর'। তৃতীয়োক্তরা রাজধানীতে থেকে এবং চতুর্থোক্তরা রাজধানীর বাইরে থেকে রাজাকে সাহায্য করতেন। তাদের যথেষ্ট বেতন দান করার এবং বেতন আটকে রেখে ধনসঞ্চয় না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল রাজাকে। তবে এই সময়কার কর্মীপ্রশাসনকে আধুনিকতর কালের সঙ্গে তুলনা করাই উচিত নয়।

মৌর্য গুপ্ত এবং মুঘল সাম্রাজ্য কর্মীব্যবস্থাপনা ভ্রূণাবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশরা ভারতে এসে কর্মীব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক রূপ প্রদান করেন। ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাঁরা দক্ষ কর্মীদের ওপর অনেকাংশে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগের গুরুভার অর্পণ করেন। স্বাধীনভারতের প্রশাসনে গণতন্ত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণের ধারায় প্রচলিত কর্মীব্যবস্থা নবরূপে রূপায়িত হয়। অর্থনৈতিক নিষ্কাশনের (দাদাভাই নৌরজীর পরিভাষা) ধাক্কায় বিপর্যস্ত ভারতবর্ষের পুনরুত্থান, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের অদম্য বাসনা, রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা রক্ষা, আন্তর্জাতিক সমাজে ভারতের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করা প্রভৃতি বহুমুখী চাপের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে রাজনৈতিক নেতাদের কাঁধে ও তাদের সাহায্য করার জন্য প্রচলিত ঔপনিবেশিক কর্মীব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হয়। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে যেভাবে কর্মীব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে, তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

৪.২ প্রাচীন ভারতে প্রশাসনিক কর্মীব্যবস্থা

ঋক্ ও অথর্ববেদে সেনানী, গ্রামনী ও পুরোহিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যজুর্বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে রাজকার্যের জটিলতা বৃদ্ধি পেলে রাজকর্মচারীর গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। 'গ্রামনী' ('Village Headman), 'সংগ্রহিতা' (Collector General) 'ভাগধুক' প্রভৃতি রাজকর্মচারীর উল্লেখ এই সময়ে পাওয়া যায়। শুক্রনীতি সার-এ 'সচিব', 'প্রাদবিবাক' (প্রধান বিচারক), সুমন্ত্র (কোষাধ্যক্ষ), 'অমাত্য' (রাজস্ব মন্ত্রী) প্রভৃতি পদের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'সমাহর্তা' (রাজকর সংগ্রহকারী), 'প্রশাস্তা' (কারাগারের প্রশাসনকারী), 'প্রচেষ্টা' (ফৌজদারী, প্রধান বিচারক) 'ব্যবহারিক' (দেওয়ানি প্রধান বিচারক) প্রভৃতি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রশাসন পরিচালনা প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের উপাদান বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি 'সপ্তাঙ্গ' তত্ত্বের অবতারণা করেন। সাতটি উপাদানের মধ্যে অন্যতম হল

'অমাত্য' তথা মন্ত্রী। অমাত্য ও মন্ত্রী অর্থশাস্ত্রে কখনও কখনও সমার্থক হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কখনও বা দুটি পদের জন্য ভিন্ন দায়িত্ব চিহ্নিত হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে বলা যায় যে, রাজার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাতা এবং উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মী হিসাবে মন্ত্রীগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। কৌটিল্যের বর্ণনায় এই প্রশাসনিক আধিকারিকরা সর্বাধিক যোগ্যতা সম্পন্ন হবেন বলে উল্লিখিত হয়েছে।

অমাত্যগণ তিনটি স্তরে বিন্যস্ত হবেন বলে কৌটিল্য উল্লেখ করেন ঃ 'যুক্ত (Yukta), 'উপযুক্ত' (Upayukta) ও 'তৎপুরুষ' (Tatpurusas)। সর্বোচ্চ স্তরে বিভ গীয় প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হতেন 'যুক্ত' কর্মীবৃন্দ। 'উপযুক্ত'গণ (Upaykta) অধস্তন অধিকর্তা। তৎপুরুষগণ সর্ব নিম্নস্তরভূক্ত কর্মী। রাষ্ট্রকৃত্যকীয় কর্মীগণের যোগ্যতা হিসাবে কৌটিল্য মূলত 'সত্ত্ব' (Sattva) উৎসাহ বা উদ্যম 'প্রজ্ঞা' (Prajna) জ্ঞান বা বুদ্ধি ও 'বাক্যশক্তি' (Vakyasakti) প্রকাশ ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সকল কর্মীদের গুণ বিবেচনার জন্য তিনি বিভিন্ন যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার কথা বলেন[2]। 'ধর্মোপাধ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিচারক, 'অর্থোপাধ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে 'রাজস্ব আধিকারিক' পদে অধিষ্ঠিত হওয়া যাবে বলে কৌটিল্য উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রকৃত্যকীয় কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হতে গেলে প্রথমে প্রার্থীকে রাজার অনুগত কাউকে দিয়ে সুপারিশ করাতে হত। রাজা প্রার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সন্তুষ্ট হলে প্রার্থীর শাস্ত্র জ্ঞান পরীক্ষা করা যে সকল কর্মীর কথা কৌটিল্য উল্লেখ করেন তার মধ্যে অন্যতম হল—'মন্ত্রী', 'পুরোহিত', 'সেনাপতি', 'দৌবারিক', 'প্রশাস্তা' (Magistrate), 'সমাহর্তা' (Collector-General), 'কোষাধ্যক্ষ', 'নায়ক' (Town Guard) 'দণ্ডপাল', 'দুর্গপাল' প্রভৃতি। প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগ তথা—রাজস্ব, হিসাব পরীক্ষা, কৃষি, খনি, বন, বন্দর, বাণিজ্য, আবগারি প্রভৃতি রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীদের সক্রিয় কর্মতৎপরতায় পরিচালিত হবে বলে কৌটিল্য উল্লেখ করেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কর্মীব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সযত্নে আলোচিত হয়েছে। "In bits and parts, Kautilya recognises that the personnel who man the organisations are as important as the organisations themselves ...." (Arora and Goyal)। সংগঠনে কর্মীবৃন্দের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কৌটিল্য কর্মীব্যবস্থাপনার অপরিহার্য উপাদানগুলির ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বিশেষত মন্ত্রী বা অমাত্য হওয়ার জন্য, প্রার্থীর শাস্ত্রজ্ঞান পরীক্ষা করা যে মৌখিক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা, যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিয়োগ প্রভৃতি কথা বলে আধুনিক রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের সঙ্গে কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ রেখেছেন।

রাজা নির্দিষ্ট যোগ্যতার নিরিখে কর্মী নিয়োগ করলেও প্রার্থীকে কলা ও বিজ্ঞানে পারদর্শী, বুদ্ধি, বাক্শক্তি, চিন্তাশক্তি, সহযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন, দৃঢ়, অনুগত, শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে বলে কৌটিল্য অভিমত পোষণ করেন। তবে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অন্যতম অংশ হিসেবে যুবরাজের প্রশিক্ষণের কথা বললেও অন্যান্য কর্মীদের পৃথক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেননি। সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই নিযুক্ত হবেন এই প্রত্যাশায় নিয়োগ পরবর্তী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব কৌটিল্য উপলব্ধি করেননি।

কৌটিল্য কর্মীদের উদার বেতন কাঠামো নির্ধারণের ওপর জোর দেন। রৌপ্য মুদ্রায় এই বেতন প্রদান করা হবে। এই বেতন প্রদানের উদ্দেশ্য হল কর্মীদের সন্তুষ্ট রাখা ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি। রাজ কোষাগারে অর্থ সংকট দেখা দিলে এই বেতন আংশিক মুদ্রায় ও অংশত দ্রব্যে দেওয়ার কথা বলেন।

কর্মীদের পদোন্নতি বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও নীতির উল্লেখ না করলেও, কৌটিল্য বলেন, যে সকল কর্মী রাজার অত্যন্ত অনুগত হবেন ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে সক্রিয় হবেন, তাদের বেতন বৃদ্ধি রাজার কর্তব্য এবং তাদের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। কর্মীদের সততা রক্ষা করার জন্য ও রাজকোষাগারের অপচয় রোধের জন্য বদলির আবশ্যকতাও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে।

জনপ্রশাসনে সংগঠন পরিচালনার অন্যতম দুটি নীতি, তথা শ্রেণীবিভাজন ও ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাস কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের যোগ্যতার তারতম্যের কথা কৌটিল্য যেমন উল্লেখ করেন, তেমন প্রত্যেক বিভাগে কর্মবিভাজনের ওপর তিনি জোর দেন। তিনি তিরিশটি অধ্যক্ষ পদের কথা বলেন। এই অধ্যক্ষগণ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত-রাষ্ট্রীয় দ্রব্যের তদারককারী, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তদারককারী, খনি ও শিল্পের তদারককারী ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী। শ্রেণীবিভাজনের সঙ্গে অবধারিত ভাবে আসে ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাসের ধারণা। যেমন—অধ্যক্ষের অধীনে থাকেন লেখক তথা করণিক, রূপাদর্শক তথা মুদ্রা পরিদর্শক, সংখ্যায়ক বা হিসাব পরীক্ষক ইত্যাদি কর্মীগণ।

কৌটিল্যের বস্তুবাদী আলোচনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভারতে সুসংহত কর্মীব্যবস্থাপনা বিরল ছিল না। ম্যাকিয়াভেলির বহুপূর্বে (321-296 B. C.) কৌটিল্য কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সুসংবদ্ধ রাজশক্তির ধারণা উপস্থাপিত করেন। ওয়েবারের বহুকাল আগে কৌটিল্য—জনপ্রশাসনের জটিলতম বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর আলোকপাত করেন। রাষ্ট্রপরিচালনায় সুদক্ষ কর্মীর অপরিহার্যতা কৌটিল্যের লেখনিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। **"Kautilya, like Webar, was keen on the efficiency and rationality aspects of administration. Kautilya's mazims of administration, ... would include characteristics like hierarch, defined competence of each office, selection by merit, promotion by seniority-cum-merit, compensation, training and discipline. (Arora এবং Goyal)"**। ওয়েবার যেমন আমলাদের নৈতিক মান বজায় রাখার জন্য কিছু বিধি-নিষেধ ও নীতির কথা উল্লেখ করেছিলেন, কৌটিল্য তেমনি নিয়ন্ত্রক পরিকাঠামো ও সর্বোপরি গুপ্তচর ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ে তোলার কথা বলেন।

৪.৩ মুঘল প্রশাসনিক কাঠামো

মুঘল প্রশাসনের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় সম্রাট আকবরের আমলে। বাবরের সময় ও সুযোগের অভাব, হুমায়ুনের রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা প্রশাসনিক ভিত সঠিকভাবে গড়ে তোলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। আকবরই সর্বপ্রথম প্রশাসনের সুস্পষ্ট পরিকাঠামো গড়ে তোলেন। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেব

প্রধানত আকবরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কাঠামোকেই অনুসরণ করেন। আকবরের 'আইন-ই-আকবরী'কে এই বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

মুঘল সাম্রাজ্যে যে ধরনের প্রশাসন গড়ে উঠেছিল তা মধ্য এশিয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণের প্রতিফলন। যদুনাথ সরকার বলেন "...it was a Perso-Arabic System in the Indian setting."[5] মুঘল প্রশাসন কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্রকেই সার্বিকভাবে সমর্থন করত। আকবরের রাজত্বকাল ছাড়া অন্য কোনও সময়েই নিছক পুলিশি রাষ্ট্রের গণ্ডী পেরিয়ে সমাজ কল্যাণ বা জনকল্যাণের উদ্যোগ গ্রহণ করার কোনও প্রচেষ্টা মুঘল প্রশাসনের ছিল না।

প্রশাসন পরিচালনায় যে কর্মীবৃন্দের প্রয়োজন তার অস্তিত্ব মুঘল সাম্রাজ্যে থাকলেও তাকে আধুনিক রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থার সঙ্গে কোনও অবস্থাতেই তুলনা করা যায় না। তবে প্রত্যেক রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীর নাম সামরিক খাতায় নথিভুক্ত ছিল, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সামরিক প্রয়োজন সৈন্য প্রেরণ করতে এঁরা বাধ্য থাকতেন। এই উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রকৃত্যকীয় পদাধিকারীদের মনসবদার বলা হত।

ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাস, কর্মে শ্রেণীবিভাজন প্রভৃতির ঝলক মুঘল প্রশাসনের কর্মীব্যবস্থাপনায় লক্ষ্য করা যায়। আকবর জমানায় এই শ্রেণীবিভাজন সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। কর্মী কাঠামো 33টি স্তরে বিন্যস্ত ছিল। প্রত্যেক স্তরের কর্মীরা রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হত। কর্মীদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে এই সময়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে পদোন্নতি ও বদলির মাধ্যমে রাজ কর্তৃপক্ষ কর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন। প্রত্যেক পদের গুরুত্ব অনুযায়ী বেতন কাঠামো নির্ধারিত হত এবং বেতন থেকেই উচ্চপদস্থ কর্মীদের প্রশাসনিক দায়ভার মেটাতে হত। প্রত্যেকটি স্তর ও অবস্থানের দায়িত্ব চিহ্নিত থাকলেও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে কোনও দায়িত্ব পালনে কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে হত। কর্মীদের কার্যকাল সমাপ্ত হওয়ার পর রাজার ইচ্ছানুসারে কর্মী বা মৃত কর্মীর স্ত্রী বা সন্তান অবসরকালীন ভাতা পেত, যদিও তা রাজার ইচ্ছাধীন ছিল। রাজা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন।

৪.৪ ব্রিটিশ ভারতে কর্মীব্যবস্থাপনা

মুঘল কর্মীব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধারণা যেমন—কর্মী নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি প্রভৃতি বর্তমান ব্যবস্থার সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ব্রিটিশরা যে ধরনের রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থা ভারতে গড়ে তুলেছিল তাই পরবর্তীকালে মূলত স্বাধীন ভারতের কর্মী পরিচালন কাঠামোকে প্রভাবিত করে।

ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক পরিষেবা ব্রিটিশ শাসনের অবদান। ব্রিটিশ সরকার ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তন করলে ভারতে জনপ্রশাসন পরিচালনার জগতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ব্যবসায়িক স্বার্থে ভারতে আসা ব্রিটিশরা উপলব্ধি করেন যে অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত রাখতে হলে

রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা প্রয়োজন। অতঃপর পলাশীর যুদ্ধের (1757) পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশরা প্রতিটি পদক্ষেপেই চেষ্টা যাতে ভারতীয় প্রশাসনে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা ভারতে আমলাতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম 'Civil Serivce' অর্থাৎ 'রাষ্ট্রকৃত্যক' শব্দটি প্রয়োগ করে। কিন্তু এই রাষ্ট্রকৃত্যক কোনও অবস্থাতেই গণতান্ত্রিক ছিল না। ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার উপযোগী একটি সংগঠন হিসাবে এই রাষ্ট্রকৃত্যক গড়ে ওঠে।

1886-87 সালে Aitchis on Commission যে চুক্তিবদ্ধ (Covenanted) ও চুক্তি বহির্ভূত (Uncovenanted) কৃত্যকের সুপারিশ করেন, 1892 সালে তাই ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকে (Indian Civil Service) ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রকৃত্যকে (Provincial Civil Service) পরিণত হয়। 1854 সালে Macanlay Report অনুযায়ী প্রথম ভারতে যোগ্যতার নিরিখে রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। যোগ্যতা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও অঞ্চল পরিষেবার কাজে লাগানোর রীতি অনুসৃত হতে শুরু করে। 1858-1919 সালের দীর্ঘ সময়ে ক্রমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকার লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে সুযোগ দেওয়ার নামে মুষ্টিমেয় এলিট শ্রেণীর জন্য এই সুযোগকে সীমিত করে। 19-23 বয়সের প্রার্থীরা এই পরীক্ষায় বসবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতেন।

1920 সালে রাষ্ট্রকৃত্যক পরিষেবার ভারতীয়করণ শুরু হয়। লণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। নিম্নস্তরভুক্ত প্রশাসনিক কর্মীদের পূর্বে আঞ্চলিক দায়িত্ব দেওয়া হত। Islington Commission-এর (1912-15) সুপারিশ ক্রমে এদের পদোন্নতির ব্যবস্থা শুরু হয়। Islington Commission নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর সুপারিশ করে, যদিও ভারতীয় কর্মী ও ইউরোপীয়ান কর্মীদের বেতন কাঠামো বৈষম্যপূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়।

পদ	বেতন (টাকায়)
ইউরোপীয়ান উচ্চপদস্থ কর্মী	1000-2250
ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্মী	300-50-2-500-50-1,050
ইউরোপীয়ান নিম্নপদস্থ কর্মী	450-50-800-100-1,350
ভারতীয় নিম্নপদস্থ কর্মী	250-40-3-450-50-3,500

(Sharma, Sadana, Public Administration in Theory and Practice, p. 437)

1926 সালে Federal Public Service Commission গঠন করে রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীনিয়োগের দায়িত্ব এই সংস্থার ওপর অর্পণ করা হয়। 1880 সালে প্রশাসনিক কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গঠন করা হয় এবং ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বজায় থাকে।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ব্রিটিশ ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে। সর্বভারতীয় কৃত্যক, কর্মচারী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বেতন, বদলি প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাতেই ব্রিটিশদের প্রভাব স্পষ্ট।

৪.৫ স্বাধীন ভারতের কর্মীব্যবস্থা

দীর্ঘ একশ নব্বই বছরের উপনিবেশিক ভারতকে শাসন করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দিক থেকে দুটি গোষ্ঠীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল (1) I. C. S.-Indian Civil Service (2) I. P.-Indian Police-যে সময়কার আইন শৃংখলা রক্ষা করার দায়িত্বে শীর্ষস্থানে ছিল, প্রশাসনিক দিক থেকে আই. পি. এবং আইন শৃংখলা বাদ দিয়ে প্রশাসনের অন্যান্য সমস্ত বিভাগের দায়িত্বে ছিল আই. সি. এস.। প্রসঙ্গত বলা যায় যেহেতু সেই সময় বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের থেকে পৃথক ছিল না, সেহেতু আই. সি. এস. এর দায়িত্বের মধ্যে বিচার বিভাগীয় কাজকর্ম ছিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক এবং রাজ্যের রাষ্ট্র কৃত্যক এই দু'ধরনের প্রশাসনিক বিভাগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এর সঙ্গে অনান্য যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না। এমন একটি তৃতীয় যেটি All India Service-নামে পরিচিত সেটিও গ্রহণ করা হয়। সংবিধান গৃহীত হবার সময়ে ভারতে 2টি All India Service ছিল-I. A. S. যাকে I.C.S.-এর উত্তরসূরি বলা হয় এবং I.P.S. যাকে I.P. এর উত্তরসুরি বলা হয়।

এছাড়া সংবিধানের 312(1) ধারায় বলা আছে যে, রাজ্যসভা মনে করলে তার $^{2}/_{3}\%$ সদস্যের সমর্থনে জাতীয় স্বার্থে অন্য কোন অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসেস প্রচলন করতে পারে। 1950 সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (State Reorganisation Commission) তাদের প্রতিবেদনে বেশ কয়েকটি অল ইণ্ডিয়া সার্ভিস প্রচলন করা উচিত এরূপ মত দেন। যেমন-Indian Service of Engineers, Indian Foreign Service, Indian Medical and Health Service। এছাড়া সংবিধানের 312(3) এবং 312(4) ধারায় একটি অল ইণ্ডিয়া জুড়িশিয়াল সার্ভিস এর কথা উল্লেখ করা আছে, যেটি প্রয়োজন হলে গঠন করা যেতে পারে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ সেই সময় গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীকালে 1966 সালে কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত আইন পাশ করে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিস নামে তৃতীয় অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসটি গঠন করে।

1950 সাল থেকেই একটি সর্ব ভারতীয় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে I.A.S., I.P.S. এবং সেন্ট্রাল গভঃ সার্ভিস-গ্রুপ-এ এবং গ্রুপ-বি এই চাকরীগুলির নিয়োগ হয়। এই কারণেই এই পরীক্ষাটিকে I.A.S. and Allied Service Recruitment Examinations বলা হয়। পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিস প্রচলিত হবার পর এই চাকরীতে নিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা নেওয়া হয়। I.A.S. এবং A.S.R.I. পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীকে যে কোন স্বীকৃত বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হতে হয় এবং বয়সসীমা 1950 সালে 21-26 থাকতে হয়।

এই সমস্ত সার্ভিস-এর মধ্যে I.A.S. দের নিয়োগ পদ্ধতিটি বিশেষভাবে আলোচিত হবে এবং 1950 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত I.S.S. দের নিয়োগ পদ্ধতি দেখলে 3টি পর্যায় দেখা যাবে যেমন—(1) 1950-1979 সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল প্রথমটি 1976 সালে গঠিত কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 1980 সাল থেকে কিছু নিয়োগ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এটিকে দ্বিতীয় পর্যায় বলা হয়। 1993 সাল পর্যন্ত এটি প্রচলিত ছিল। 1993 সালে সতীশ সা-এর সুপারিশ অনুযায়ী 1994 সাল থেকে নিয়োগ পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়, যাকে তৃতীয় পর্যায় বলা যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি এখনও পর্যন্ত চালু আছে।

প্রথম পর্যায় (1950-1979) ঃ—এই সময় লিখিত পরীক্ষায় যে কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট এবং 21-26 বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারত এবং religion, cust, sex এগুলির কোনটিই বাধা হতে পারে না। তবে সংবিধানের নীতি অনুযায়ী S.C. এবং S.T.-দের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। যেমন—S.T., S. C.-দের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়সের উর্দ্ধসীমা ৫ বছর পর্যন্ত বাড়ান যেতে পারে এবং S.C. দের জন্য 15% এবং এস. টি. দের জন্য 7 $^1/_2$% সংরক্ষণের সুযোগ ছিল। এছাড়া সাধারণ প্রার্থীরা এই পরীক্ষায় বসার জন্য 3টি সুযোগ পেতেন যা S.C. ও S.T. দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না।

লিখিত পরীক্ষা সেই সময় 3টি ভাগে ভাগ করা ছিল, এর মধ্যে I.S.S. হবার জন্য যে প্রার্থীরা পরীক্ষায় বসতে চাইতেন, তারা প্রথম ভাগের (Catagori-I) এর প্রার্থী ছিলেন।

এই পরীক্ষাটির দুটি স্তর ছিল-(1) লিখিত পরীক্ষা এবং (2) লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের জন্য মৌখিক পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষাটি তিন ধরনের বিষয় নিয়ে গঠিত ছিল।

প্রথমতঃ—3টি আবশ্যিক বিষয় ছিল। আবশ্যিক বিষয়গুলি হল-রচনা, সাধারণ ইংরাজী এবং সাধারণ জ্ঞান। এর প্রতিটির পূর্ণ মান ছিল 150। অর্থাৎ আবশ্যিক বিষয়গুলির সর্বমোট নম্বর ছিল 450। দ্বিতীয়তঃ—ঐচ্ছিক 3টি বিষয়। প্রতিটি বিষয়ের 2টি করে পত্র ছিল। প্রতিটি পত্রের পূর্ণমান 100, অর্থাৎ ঐচ্ছিক বিষয়ের সর্বমোট মান 600। 45টি ঐচ্ছিক বিষয়ের তালিকা থেকে প্রার্থীদেরকে 3টি ঐচ্ছিক বিষয় নিতে হত। তৃতীয়তঃ 2টি অতিরিক্ত বিষয়। প্রতিটি বিষয়ের 2টি করে পত্র। প্রতি পত্রের পূর্ণমান 100। অর্থাৎ অতিরিক্ত বিষয়ের মোট মান 400। 16টি অতিরিক্ত বিষয়ের তালিকা থেকে 2টি বিষয় প্রার্থীকে বাছতে হত। সর্বশেষে লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা দিতে হত। যার পূর্ণমান ছিল 300।

সাধারণত যত সংখ্যক পদশূন্য থাকে, তার তিন গুণ প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হয় এবং মৌখিক পরীক্ষার একটি নির্ধারিত মান থাকে, যেটি না পেলে প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচিত করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় (1980-1993) ঃ—কোঠারি কমিশনের সুপারিশ ক্রমে এই পর্যায়ে দুটি বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়। প্রথমতঃ—আগের পরীক্ষাটির দুটি স্তর ছিল। 1980 সাল থেকে পরীক্ষাটি 3টি স্তরে আয়োজিত হয়। (1) প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, (2) Main Examination এবং (3) মৌখিক Examination। প্রথম স্তরের পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে দ্বিতীয় স্তরে এবং লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে না আবার একইভাবে লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষায় বসা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ—এতদিন পর্যন্ত Basic discipline এর গ্র্যাজুয়েটরাই পরীক্ষায় বসতে পারত। 1980 সাল থেকে Specialized discipline-এর গ্র্যাজুয়েট এই পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায়। ফলে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার রা যথেষ্ট সংখ্যায় এই পরীক্ষায় বসতে থাকে 1980 সাল থেকে।

1951 সালে ভারতীয় সংসদে সর্বভারতীয় কৃত্যক আইন প্রণীত হয়। এই আইনে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই মর্মে ক্ষমতা প্রদান করা হয় যে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সর্বভারতীয় কৃত্যকে কর্মীনিয়োগ ও চাকরির শর্তাদি কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ করতে পারবে। বর্তমানে ভারতে যে তিনটি সর্বভারতীয় কৃত্যক আছে তা হল—Indian Administrative Service (ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক), Indian Police Service (ভারতীয় পুলিশ পরিষেবা) ও Indian Forest Service (ভারতীয় বন পরিষেবা)। পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশক্রমে ভারতীয় বন পরিষেবা ও ভারতীয় পুলিশ পরিষেবাকে এক করার ব্যবস্থা হয়েছে। সংবিধানের 312 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাজ্যসভা তার উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে যে জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য সংসদ আরো সর্বভারতীয় কৃত্যক সৃষ্টি করতে পারে। 1972 সালে 28তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মীদের বিশেষ সুবিধাভোগের ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়। ফলে কর্মীব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভারতীয়করণ সার্থক রূপ পরিগ্রহ করে।

সর্বভারতীয় কৃত্যকের জন্য যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়, তার বয়সসীমা 21-28 বৎসর। তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য এই সীমা 5 বৎসর বাড়ানো যেতে পারে। এই পরীক্ষা প্রধানত দুটি পর্যায়ে হয়—প্রাথমিক ও প্রধান।

প্রাথমিক পর্ব—

প্রথম পত্র—সাধারণ পঠনপাঠন		—150 নম্বর
দ্বিতীয় পত্র—ঐচ্ছিক বিষয়		—350 নম্বর
	মোট	—450 নম্বর

ইংরাজি ও হিন্দিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়। স্নাতক স্তরে পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 1994 সালে মণ্ডল কমিশন রিপোর্ট কার্যকরী হওয়ায় 50 শতাংশ পদ তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সুরক্ষিত হয়েছে।

প্রধান (Main) পরীক্ষা—

প্রথম পত্র	অষ্টম তপশীলে লিপিবদ্ধ যে কোনও ভারতীয় ভাষা	300 নম্বর
দ্বিতীয় পত্র	ইংরাজি	300 নম্বর
তৃতীয় পত্র	প্রবন্ধ	200 নম্বর
চতুর্থ ও পঞ্চম পত্র	সাধারণ পঠন-পাঠন	600 নম্বর (300×2)
ষষ্ঠ থেকে নবম পত্র	যে কোনও দুটি ঐচ্ছিক বিষয়ে, প্রত্যেকটিতে দুটি করে পত্র	300 নম্বর (প্রতি পত্র)

প্রধান পত্রে উত্তীর্ণদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। The National Institute of Industrial Psychology সাক্ষাৎকারের সময়ে সাতটি বিষয় লক্ষ্য রাখার কথা বলেন—শারীরিক গঠন, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ, সাধারণ বুদ্ধি, বিশেষ জ্ঞান, উৎসাহ, নির্ভরযোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাস, পারিবারিক ও পারিবার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি।

সর্বভারতীয় কৃত্যকের গুরুত্ব সংবিধান পরিষদ থেকে শুরু করে সর্বস্তরেই স্বীকৃত হয়েছে। অশোক চন্দ বলেছেন যে 'জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ও বহুমুখী দায়িত্ব নির্বাহের জন্য সর্বভারতীয় স্তরে কৃত্যক গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধানের 308 থেকে 323 ধারায় সর্বভারতীয় কৃত্যক ও রাজ্য কৃত্যকের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, কাজের নিরপত্তা, দায়িত্ব প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তবে Dr. S. Maheswari বলেন যে—"The All India Services are a legacy of the unitary government of India of the era before the reforms of 1919.

রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও ভারতে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে এই উদ্দেশ্যে The National Academy of Administration গঠিত হয়। এছাড়াও National Institute of Commounity Development, Indian Institute of Public Administration, Railway Staff College, Central Secretariat Training School, Administrative Staff College, Institute of Secretariat Training and Management প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়। পুলিশ কৃত্যকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রধান সংস্থা হল মাউন্ট আবুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজ।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় কয়েকটি ত্রুটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—

1. সুনির্দিষ্ট নীতির অভাব।

2. সর্বস্তরে প্রশিক্ষণের সমান সুযোগ নেই।

3. প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির মধ্যে সম্পর্ক না থাকায় কর্মীরা প্রশিক্ষণে উৎসাহী নন। অবশ্য পঞ্চম বেতন কমিশন এই ত্রুটি দূর করার জন্য কিঞ্চিৎ প্রচেষ্টা করেছে। প্রশিক্ষণের বিষয়টি ক্ষতিপূরণের সঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে।

4. আধুনিকীকরণের অভাব।

5. আঞ্চলিক স্তরে প্রশিক্ষণের সীমিত সুযোগ।

পদোন্নতির গুরুত্ব ভারতে স্বীকৃত হয়েছে। পদোন্নতি হল—বেতন, পদ ও দায়িত্বের ঊর্ধ্বগমন। পদোন্নতি সিনিয়রটি, যোগ্যতা অথবা উভয়ের ভিত্তিতেই করা হয়। উচ্চ ও মধ্যবর্তী স্তরে কর্মীদের পদোন্নতি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কেন্দ্র বা রাজ্য যথাক্রমে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে। নিম্নস্তরে পদোন্নতির ভিত্তি হয় সিনিয়রিটি, উচ্চ ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে যোগ্যতা ও সিনিয়রিটি উভয়েই গুরুত্ব পায়, যদিও উচ্চপদে যোগ্যতার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। নিম্ন ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন অধিক গুরুত্ব পায়। অভিযোগ করা হয় যে এর ফলে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উচ্চপদের জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা, বিশেষত রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সুপারিশের ওপর নির্ভর করা হয়।

স্তর, পদ, যোগ্যতা প্রভৃতির ভিত্তিতে কর্মীদের বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয়। বেতন কাঠামো নির্ধারণের জন্য বেতন কমিশন গঠিত হয়। 1994 সালের 9 এপ্রিল পঞ্চম বেতন কমিশন গঠিত হয়। এই বেতন কমিশনের সদস্যরা ছিলেন বিচারপতি আর পাণ্ডিয়ান, প্রফেসর সুরেশ তেণ্ডুলকার, শ্রী এম. কে. দ্য (IAS)। 1997 সালে কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করে। পরবর্তী কমিশন 2003 সালে গঠিত হওয়া উচিৎ এবং 2006 সালে এর প্রতিবেদন কার্যকরী হওয়া উচিত বলে বর্তমান কমিশন সুপারিশ করে। পঞ্চম বেতন কমিশন সুপারিশ করেছে যে, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতন স্তর যথাক্রমে মাসিক 26,000 ও 2,440 টাকা হওয়া উচিৎ। পূর্ববর্তী 51টি স্তর মিলিত হয়ে বর্তমান কমিশন 34টি বেতনস্তরের সুপারিশ করেছে। পঞ্চম বেতন কমিশন ধারাবাহিক বেতন সংস্কারের জন্য ও মহার্ঘ্য ভাতা বিবেচনার জন্য স্থায়ী কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে। রাষ্ট্রকৃত্যকীয় কর্মীদের বেতন কাঠামো নির্ধারণের জন্য Civil Service Board গড়ে তোলার সুপারিশ কমিশন করেছে।

সরকারি কর্মীদের প্রতিটি স্তরে প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও বদলির ব্যবস্থা আইনত স্বীকৃত। পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা ও অভিজ্ঞতা উভয়েই বিচার করা হয়। উচ্চতম স্তরে সরাসরি নিয়োগের পরিবর্তে পদোন্নতির ওপরেই নির্ভর করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পঞ্চম বেতন কমিশন যে স্তর বিন্যাসের সুপারিশ করেছে তা হল :

শীর্ষ নির্বাহীগণ—(Top Executives) (সচিব, সহকারী সচিব ইত্যাদি)

প্রধান কার্যনির্বাহী অধিকর্তা—(Senior Executive) (যুগ্ম সচিব, DIGs ইত্যাদি)

কার্যনির্বাহী অধিকর্তা—(Executive) (গ্রুপ-A)

তদারককারী কর্মী—(Supervisory Personnel)

সহায়ক কর্মী—(Supporting Personnel), (Auxiliary Personnel)

গেজেটেড ও নন্‌-গেজেটেড অধিকর্তাদের মধ্যে পার্থক্য বিলোপ করার সুপারিশ কমিশন করেছে। পঞ্চম বেতন কমিশনের মতে, এর উদ্দেশ্য হল—'... to take the bureaucracy out of its feudal past into a modern present।

বেতন, ভাতা সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম বেতন কমিশন চাকুরির শর্তাদি শক্ত করার সুপারিশ করেছে, শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির[7] ওপর জোর দিয়েছে এবং স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মী সংখ্যার সংকোচনের সুপারিশ করেছে। আগামী 10 বছরে 30 শতাংশ কর্মী হ্রাসের সুপারিশ কমিশন করেছে। এ জন্য কমিশনের মতে, এই মুহূর্তে সাড়ে তিন লাখ পদের অবলুপ্তি প্রয়োজন। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের ক্ষেত্রে এই সুপারিশ অধিক ক্ষতিকারক বলে সমালোচনা করা হয়েছে। "Work force size control" ব্যবস্থা, কমিশনের মত—সংগঠনে অদক্ষতা, অকার্যকারিতা ও দুর্নীতির অবসান ঘটাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যকৃত্যক কমিশন ছাড়াও নিম্নপদস্থ কর্মীদের (করণিক, টাইপিস্ট প্রভৃতি) ক্ষেত্রে অনেক রাজ্যে স্টাফ সিলেকসন কমিশন কর্তৃক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। যে কাজে কর্মীনিয়োগ করা হবে, সেই কাজে দক্ষতা বিচারের জন্য বাস্তব দক্ষতা প্রদর্শনের (demonstration) ব্যবস্থাও করা হয়। নির্বাচিত প্রার্থীদের পুলিশ রেকর্ড ও ধারাবাহিক পারিবারিক ইতিহাস পরীক্ষা করার পর প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করা হয়।

৪.৬ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন—কর্মীব্যবস্থাপনার স্তম্ভ

পরাধীন ভারতে মেকলে রিপোর্টে সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সেই অনুযায়ী 1855 সালে ইংলণ্ডে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল, এরপর

ভারতেও পরীক্ষা ব্যবস্থা গৃহীত হয়। 1924 সালে লর্ড লি'র নেতৃত্বে The Royal Commission on Superior Indian Civil Services গঠিত হয়। এই কমিশন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা রাষ্ট্রকৃত্যক আয়োগের কথা বলে। 1926 সালের 1লা অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক আয়োগ বা ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন তার কাজ শুরু করে, এরপর ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক আয়োগের চরিত্র পরিবর্তিত হয়। সংবিধানে ভারতের জন্য একটি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়োগের কথা বলা হয়।

সংবিধানের 315নং ধারায় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে একটি রাষ্ট্রকৃত্যক আয়োগ গঠনের কথা বলা হয়েছে। 316নং ধারায় বলা আছে, এই কমিশন-এর চেয়ারপার্সন এবং অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি। এই কমিশনের সদস্য সংখ্যা কত হবে, তা সংবিধানে বলা নেই। বিভিন্ন সময়ে এই সদস্য সংখ্যা বিভিন্ন ছিল। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা চেয়ারম্যানসহ, মোট 13। সংবিধানে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবার কথা বলা হলেও যেহেতু রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকেন, (42 ও 44 তম সংবিধান সংশোধন) বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী এবং তার ক্যাবিনেটই নির্ধারণ করে কে বা কারা এই কমিশনের সদস্য হবেন, বা কে UPSC-এর চেয়্যারম্যান হবেন। সদস্যপদে কারা নিযুক্ত হবেন, সে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়মাবলী না থাকলেও সংবিধানে বলা আছে, সমগ্র সদস্যদের মধ্যে অর্ধেকের কাছাকাছি সংখ্যক সদস্যদের সরকারি কাজে 10 বছরের অভিজ্ঞতা আছে, এমন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে হতে হবে। এক্ষেত্রে, সংবিধান যেহেতু, অর্ধেকের কাছাকাছি সংখ্যক' এই ভাষাটি ব্যবহার করেছে, সেই কারণে কতজন সদস্যকে 10 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে তা নির্দিষ্টভাবে স্থির করা যায় নি। যে কথা বলা যেতে পারে তা হল-অর্ধেকের বেশি সংখ্যক ব্যক্তি ঐ গোষ্ঠীর থেকে বিযুক্ত হবেন না। পরবর্তীকালে 1967 সালে Admistrative Reforms Commission—তাদের রিপোর্টে বলেছিলেন যে, কমিশনের সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের অভিমত নেওয়া হবে এবং উত্তরসূরি নিয়োগের ক্ষেত্রেও চেয়ারম্যান-এর মত নেওয়া হবে।

কার্যকাল ও যোগ্যতা :—

চেয়ারম্যান ও সদস্যরা 6 বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন বা 65 বছর বয়স পর্যন্ত সদস্য পদে থাকতে পারবেন। UPSC-এর সদস্যরা UPSC-এর চেয়ারম্যান বা কোনও UPSC বা তার চেয়ারম্যান ছাড়া অন্য কোন পদে নিযুক্ত হতে পারবেন না। UPSC-এর চেয়ারম্যানেরা অবসর গ্রহণের পর অন্য কোন চাকরি গ্রহণ করতে পারবে না। তবে UPSC-এর চেয়ারম্যান বা তার সদস্যরা রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি বা পার্লামেন্টের সদস্য হতে পারবেন।

সংবিধানের 317 ধারায় UPSC-এর চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে কিভাবে তার পদ থেকে অপসারণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বলা আছে। কোন সদস্য বা চেয়ারম্যান এর বিরুদ্ধে কোন অনৈতিক কাজ কর্মের অভিযোগ আনা হলে, সুপ্রীম কোর্ট সেই অভিযোগ অনুসন্ধান করে দেখবে। অনুসন্ধানের পর সুপ্রীম কোর্টের মত যদি অপসারণের পক্ষে যায়, তাহলে রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করতে বাধ্য।

318 নং ধারানুযায়ী UPSC-এর সদস্য ও আধিকারিক এবং কর্মীদের চাকরীর শর্তের কথা বলা আছে, যেগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন রাষ্ট্রপতি। 319 ধারায় বলা আছে যে UPSC-এর চেয়ারম্যান ও তার সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাগুলি ভারতের সঞ্চিত তহবিল (consolidated fund) থেকে দেওয়া হবে এবং 320 ধারায় কোন্ কাজগুলি UPSC করবে তা বিস্তৃত ভাবে বলা আছে।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কার্যাবলী (Function of the UPSC) :

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের প্রধান এবং প্রথম কাজ হলো, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন চাকরীগুলির জন্যে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা পরিচালনা করা। এছাড়া দুই বা ততোধিক রাজ্য তাদের রাজ্যের প্রেক্ষাপটে যদি UPSC-এর কাছে কোন উপদেশ চায়, তাহলে UPSC সেই উপদেশ দেবে। এছাড়া চাকরীতে বদলি, পদোন্নতি বা কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠলে, UPSC তার মতামত জানাতে পারে। 321নং ধারানুযায়ী 320 নং ধারাতে যে কাজগুলি উল্লিখিত আছে, তাছাড়া UPSC পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে অন্য কাজ করতে পারে। 1957 সালে সংসদে দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন Act পাশ হয়েছিল, যার ভিত্তিতে দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আধিকারিকদের পদগুলি পুরণ করা হয়, UPSC পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

৪.৭ সারাংশ

জনপ্রশাসন পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কর্মীব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সংগঠনে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক ও সমন্বয় গড়ে তোলা কর্মীব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরু দায়িত্ব হিসাবে স্বীকৃত। কর্মীব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে যে প্রত্যেক কর্মীর দক্ষতার ও সামর্থ্যের চূড়ান্ত বিকাশ ও ব্যবহার সম্ভব হবে। শ্রেষ্ঠ কর্মী নির্বাচন, উপযুক্ত পদে তাকে অধিষ্ঠিত করা, কর্মীর প্রশিক্ষণ, বেতন, পদোন্নতি, অবসর প্রভৃতি সকল বিষয়ে যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কর্মীব্যবস্থাপনার বিশেষ দায়িত্ব।

প্রাচীন ও মধ্যভারতে কর্মীব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব যথেষ্ট সুসংহত রূপেই ছিল। রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষে ছোট-বড় সকল সাম্রাজ্যই কর্মীদের ওপর নির্ভর করে অনেকাংশে পরিচালিত হয়েছে। বেদ, স্মৃতি, শ্রুতি, সংহিতা ইত্যাদিতে কর্মীব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এ বিষয়ে অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। মধ্যযুগে আকবরের শাসনকাল কর্মীব্যবস্থার সর্বোত্তম বিকাশ সাধিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে অর্থশাস্ত্র ও আকবরের আমলে আইন-ই-আকবরী কর্মীব্যবস্থার নানান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যেভাবে আলোকপাত করে, তা আধুনিক জনপ্রশাসনের ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্য পাঠ্য হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

ব্রিটিশরা ভারতে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে কর্মীব্যবস্থা গড়ে তোলে, তা স্বাধীন ভারতেও বহুকাল অনুসরণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে গড়ে ওঠা কর্মীব্যবস্থার কাঠামোই স্বাধীন ভারতে কর্মীব্যবস্থা ভিত হিসেবে বিবেচিত হয়। ICS ও IAS প্রায় সমমর্যাদার অধিকারী হলেও স্বাধীন ভারতে কৃত্যকে বৈষম্য যথাসম্ভব দূর করা হয়েছে, কৃত্যককে শোষণের হাতিয়ার নয়, সমাজকল্যাণের মুখপত্র হিসেবে গঠন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট পরীক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ, বেতন কাঠামো প্রভৃতি স্বাধীন ভারতের কর্মীব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সম্ভব করে তুলেছে। 1990 সাল থেকে যে অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও বর্তমান শতকে যে বিশ্বায়ন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তা ভারতের কর্মীব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করেছে। কর্মীসংখ্যার সংকীর্ণায়ন ও কর্মীর গুণগত মান বৃদ্ধির ওপরেই বারংবার গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

৪.৮ অনুশীলনী

বড় প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। প্রাচীন ভারতের কর্মীব্যবস্থার প্রকৃতি কী ছিল?

উত্তর সংকেত : 4.1

২। ব্রিটিশ ভারতে বিকশিত কর্মীব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করুন।

উত্তর সংকেত : 4.3

৩। স্বাধীন ভারতে বিকশিত কর্মীব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আলোচনা করুন।

উত্তর সংকেত : 4.4

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজকর্মচারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও ক্ষতিপূরণের জন্য উল্লিখিত ব্যবস্থা বর্ণনা করুন।

২। মুঘল প্রশাসনে প্রচলিত কর্মীব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্মীব্যবস্থা কেন গড়ে তোলে?

৪। স্বাধীন ভারতে সর্বভারতীয় কৃত্যকে নিয়োগের মাপকাঠি কী এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ?

৫। পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশে নব সংযোজন কী কী?

৬। ভারতে কর্মী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উল্লেখ করুন এবং এর ক্রটিগুলির ওপর আলোকপাত করুন।

৭। পদোন্নতি বলতে কী বোঝেন। ভারতে পদোন্নতির ভিত্তি কী কী?

বোধমুলক/নৈর্ব্যক্তিক

১। প্রাচীন ভারতে বিচারক ও রাজস্ব আধিকারিক হওয়ার জন্য নির্ধারিত পরীক্ষা কী ছিল? (ধর্মোপাঠ ও অর্থপাঠ)

২। কৌটিল্যের 'সপ্তাঙ্গ' তত্ত্বে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনায় সহায়ক অন্যতম উপাদান কী? (অমাত্য তথা মন্ত্রী)

৩। মন্ত্রীদের ভূমিকা কী ছিল ও তারা কার দ্বারা নিযুক্ত হতেন? (পারমর্শদাতা ও প্রশাসনিক কর্মী/রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন)

৪। অমাত্যগণ যে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত ছিল তার উল্লেখ করুন।

৫। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হতে গেলে যোগ্যতার মাপকাঠি কী ছিল?

৬। সমাহর্তা ও প্রশাস্তা কাদের বলা হত?

৭। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে সুসংহত প্রশাসনিক পরিকাঠামো কে গড়ে তোলেন?

৮। কোন্ গ্রন্থ থেকে মুঘল প্রশাসন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়?

৯। আকবরের শাসন কাঠামোর মৌলিক বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

১০। Aitchison Commission ও Islington Commission-এর সুপারিশ কী ছিল?

১১। Macaulay Report-এ কী বলা হয়েছিল?

১২। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কবে ও কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

১৩। সর্বভারতীয় কৃত্যক আইন কবে ও কেন প্রণীত হয়?

১৪। National Institute of Industrial Psychology সাক্ষাৎকারের জন্য যে সাতটি বিষয়ের উল্লেখ করে তা কী কী?

১৫। Civil Services Board গঠনের সুপারিশ কে করেন ও কেন?

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Kangle R. P., *The Kautilya Arthastra* (Translation) Book-I ; Chapter II.

2. A. S. Alterkar, *State and Government in Ancient India.*

3. *Ibid.*, Book-I : Chapter-10.

4. Arora, R. K. an' Gcyal R. *Indian Publick Administration*, p. 13.

5. *Ibid*, p. 18

6. Sarkar J. N. *Mughal Administration*. P. 3

7. Chanda, Asok, India Administration, Chapter-III, p. 105.

8. Maheswari, Shriram, *Indian Administration*, Chapter-18, p. 29.

9. S. R. Maheswari, *Public Administration in India* (India : MacMillan 2000)

10. Fifth Pay Commission Report (p. 14 and 33-34)

ই. পি. এ.-৫
জনপ্রশাসনের ঐচ্ছিক পাঠক্রম
পর্যায় ঃ ১৮

একক ১ ❑ কর্মীব্যবস্থার বিকাশ—ভারতে কর্মীব্যবস্থা

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ প্রশাসন পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ
১.৩ রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি
১.৩.১ ভারতে কর্মী নিয়োগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
১.৩.২ স্বাধীনতা উত্তর ভারতে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি
১.৩.৩ কেন্দ্রীয় জনপালন কৃত্যক কর্মীদের নিয়োগের পদ্ধতি
১.৪ রাজ্যকৃত্যকে কর্মী নিয়োগ
১.৫ সাধারণ ও বিশেষ যোগ্যতা
১.৬ সারাংশ
১.৭ অনুশীলনী
১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- বর্তমান জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসনিক কর্মপরিধি বিস্তৃত হওয়ায় দক্ষ কর্মীর অপরিহার্যতা কিভাবে অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে তা বোঝা যাবে।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে কর্মী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাবে।
- ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোয় কেন্দ্র ও রাজ্যে যে প্রায় সমান্তরাল কর্মীব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং এই সঙ্গে কর্মীব্যবস্থায় যে এককেন্দ্রিকতাও স্থান পেয়েছে তার আভাষ পাওয়া যাবে।
- বিভিন্ন স্তরে কর্মী নিয়োগ ও তাদের যোগ্যতার নিরিখে আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যাবে।

১.১ প্রস্তাবনা

সামন্ততন্ত্রের অবসান ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত করে। সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তনের সূত্র ধরে রাজনৈতিক উপরিকাঠামোও পরিবর্তনের দাবি করে। ধনতন্ত্র যত বিকশিত হয়, বাজার অর্থনীতির তাগিদ বিশ্ববাজারের সন্ধান করতে ঔপনিবেশিকতার পথে পা বাড়ায়। অতঃপর শক্তিশালী জাতি রাষ্ট্র গঠন একটি অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃত হতে শুরু করে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় যে জটিলতা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়, তার জন্য প্রয়োজন হয় সুগঠিত প্রশাসনিক পরিকাঠামোর।

জাতি রাষ্ট্র পরিবর্তিত সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার প্রকৃতি বদল করতে বাধ্য হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী পুলিশী রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্রমে একটি বিশেষ প্রয়োজনে পরিণত হয়। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো যখন জনমানসে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে, পুঁজিবাদী তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষকগণ

তখন রাষ্ট্রের সামাজিক উপযোগিতামূলক কাজের উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। এর ফলে রাষ্ট্রের কাজ ও দায়িত্বের পরিধি বিস্তৃত হয়, প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয় সুদক্ষ প্রশাসক ও কর্মীর। অন্যদিকে সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতেও জাতি গঠনের তাগিদ প্রশাসনিক সক্রিয়তা দাবি করে এবং সেখানেও দক্ষ প্রশাসনিক কর্মী প্রশাসনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। কর্মী নিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি তার অতীত ও বর্তমানের সূত্র ধরে যেভাবে বিকশিত হয়েছে তাই আলোচ্য এককের বিবেচ্য বিষয়।

১.২ প্রশাসন পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালন নির্ভর করে প্রশাসনিক কর্মীর দক্ষতার উপর। অত:পর উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ এবং তাকে যথাযথ পদে প্রতিস্থাপন বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার অন্যতম মাধ্যম হল প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দ। জটিল প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য চূড়ান্ত পেশাদারী কর্মনিষ্ঠ কর্মীবৃন্দের প্রয়োজন ক্রমেই অনুভূত হতে থাকে। ১৯৩৩ সালে মার্কিন সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীদের ওপর তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে এবং এই কমিশনের প্রতিবেদনে পেশাভিত্তিক প্রশাসনিক কর্মী নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। উক্ত কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী পেশাভিত্তিক (career) কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থার যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাধান্য পায় তা হল—

১) সরকারি চাকুরীর সঙ্গে যুক্ত সম্মান ও পদমর্যাদা;

২) যথাযথ নিয়োগ পদ্ধতি;

৩) পদোন্নতির সুযোগ ও বদলির সম্ভাবনা;

৪) সুস্পষ্ট বেতন কাঠামো;

৫) অবসরকালীন সুযোগ ও সুবিধা।

উইলাওবির মতে, পেশাভিত্তিক কর্মী ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হল—সরকারি চাকুরীতে সকল সমযোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকের সমান প্রবেশাধিকার, সমবেতন কাঠামো, উন্নতির সমান সুযোগ, সমান অবস্থা ও শর্তাধীনে কাজ করার সুযোগ, অবসরের পর সমান সুযোগ লাভের প্রত্যাশা।

এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, পেশা হিসেবে প্রশাসনিক কর্মীব্যবস্থার বিকাশ একদিকে যেমন চাকুরীর স্থায়ীত্ব ও কার্যকালের মেয়াদ সুনিশ্চিত করে, অন্যদিকে তেমনি যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত দক্ষতাকেই চাকুরী লাভ ও পদোন্নতির একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে। এর ফলে প্রশাসনিক কাজে ধারাবাহিকতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয়, যোগ্যতম প্রার্থীকে নিয়োগের ফলে প্রশাসনিক কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং সরকারি কার্য-পরিচালনায় একটি সুদক্ষ অরাজনৈতিক হাতিয়ার গড়ে ওঠে, যা প্রশাসনিক কাজের মান বৃদ্ধি করে। এরূপ প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর জনগণের নির্ভরতাও বৃদ্ধি পায়।

পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই কর্মী ব্যবস্থার নিম্নতর স্তরে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদ পূরণ করা হয় এবং উচ্চতর অবস্থানে পদোন্নতিই হয় সাধারণভাবে পদপূরণের ভিত্তি। কর্মীব্যবস্থায় দুধরনের কর্মী নিযুক্ত হয়—সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ (Generalists এবং Specialists) অথবা আমলা ও প্রযুক্তিবিদ (bureaucrats and technocrats)।

১.৩ রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি

পেশাভিত্তিক কৃত্যক নিয়োগের প্রধান ভিত্তি হল সমযোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের সমান সুযোগ প্রদান। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে চিহ্নিত করে নিয়োগের ব্যবস্থা করা

পেশাভিত্তিক কৃত্যক নিয়োগব্যবস্থার মূল নীতি। ফিফ্‌নার ও প্রেসথাস অভিমত পোষণ করেন যে, "Personnal recruitment for the second half of the twentiecth century will have to be geared to a nuclear Physical world in which the solutions of human problems will demand the utmost in human competence."
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কর্মী নিয়োগ নীতি আনবিক বস্তুবাদী পৃথিবীর মানব সমস্যার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠ যোগ্যতাসম্পন্ন মানব সম্পদের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেয়।

পৃষ্ঠপোষকতামূলক বা বিকৃত ব্যবস্থার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক বিধি অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ সুনিশ্চিত হয় সর্বপ্রথম চীন দেশে। চীনে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। আধুনিককালে প্রাশিয়ায় ১৮৫৭ সালের পৃষ্ঠপোষকতামূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক নিয়োগ বিধিকে গ্রহণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিকৃত ব্যবস্থার পরিবর্তে যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ সুনিশ্চিত হয় ১৮৮৩ সনে। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে ১৮৫৩ সনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগর বন্দোবস্ত করেন।

১.৩.১ ভারতে কর্মী নিয়োগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে নর্থ কোর্ট ট্রেভেলিয়ান প্রতিবেদন উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের সুপারিশ করে। ১৮৫৪ সনে ম্যাকাওলে জোয়েট কমিটি এবিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশ করে এবং ১৮৫৫ সালে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৮ সালে এইচিসন কমিশন তিন ধরনের কৃত্যক গড়ে তোলার সুপারিশ করে—রাজকীয়, আঞ্চলিক ও অধীনস্ত কৃত্যক। প্রথম শ্রেণীর কৃত্যক নিয়োগের ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডেই থাকে, অন্যান্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সরকারের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল। সরাসরি নিয়োগ এবং অধস্তন অবস্থান থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ উভয়কেই এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই নিয়োগ বিধি ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করায় ১৯১২ সালে ইস্‌লিংটন কমিশন গঠিত হয়, কিন্তু এই কমিশনের প্রতিবেদনেও ভারতীয়দের জন্য বিশেষ কোনও সুখবর পাওয়া যায়নি। ১৯১৮ সালে মন্ট-ফোর্ড প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যেখানে ভারতীয়দের অধিক সংখ্যায় প্রশাসনে অংশগ্রহণের সুপারিশ করা হয়। উর্ধ্বতন কৃত্যক নিয়োগের ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডে সীমিত না রেখে ভারতেও নিয়োগ ব্যবস্থা করার কথা এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এবং ইস্‌লিংটন কমিশনের সুপারিশ মতো ২৫ শতাংশ নয়, ৩৩ শতাংশ ভারতীয়কে উর্ধ্বতন কৃত্যকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে, প্রতি বছর ১½ (দেড়) শতাংশ করে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিৎ, যদি না ইতিমধ্যে নতুন কোনও কমিশন গঠিত হয়।

১৯১৯ সালে ভারত সরকার আইনে সর্বভারতীয় কৃত্যক নিয়োগের জন্য রাষ্ট্র কৃত্যক কমিশন নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ১৯২৩ সালে সর্বভারতীয় কৃত্যকের ভারতীয়করনের জন্য ভিস্‌কাউন্টলির সভাপতিত্বে কমিশন গঠিত হয় এবং এই কমিশন সুপারিশ করে যে,

(a) ভারতীয় শিক্ষা কৃত্যক, ভারতীয় কৃষি কৃত্যক, ভারতীয় পশুপালন কৃত্যক, বম্বে ও বার্মার ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং ও বন কৃত্যক কর্মীরা (রাস্তা ও বিল্ডিং) স্থানীয় সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

(b) সর্বভারতীয় রাষ্ট্র কৃত্যক, সর্বভারতীয় পুলিশ কৃত্যক, সর্বভারতীয় চিকিৎসা কৃত্যক ইত্যাদিরা পূর্বের ন্যায় নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসচিবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন।

(c) উর্ধ্বতন পদগুলির ২০ শতাংশ আঞ্চলিক কৃত্যক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। সর্বভারতীয় রাষ্ট্র কৃত্যকে ৫০ শতাংশ ইউরোপীয় ও ৫০ শতাংশ ভারতীয়দের নিয়োগ, সর্বভারতীয় পুলিশ কৃত্যকে

প্রতি ৫ জন ইউরোপীয় প্রতি তিনজন ভারতীয়কে সরাসরি নিয়োগের সুপারিশ করা হয়, আঞ্চলিক কৃত্যকে কর্মরতদের মধ্যে থেকে পদোন্নতির ভিত্তিতে ২০ শতাংশ নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। সর্বভারতীয় অরণ্য কৃত্যক ৭৫ শতাংশ ইউরোপীয় ও ২৫ শতাংশ ভারতীয় নিয়োগের সুপারিশ হয়। সেচ কৃত্যকে ৪০ শতাংশ ইউরোপীয় ও ৪০ শতাংশ ভারতীয়কে সরাসরি নিয়োগ এবং ২০ শতাংশকে পদোন্নতির ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

১.৩.২ স্বাধীনতা উত্তর ভারতে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি

ধরনের বিস্তারিত সুপারিশের পরেও প্রশাসনিক কর্মী নিয়োগ নিয়ে বিতর্কের অবসান হয়নি। অবশেষে ১৯৪৬ সালে খসড়া সংবিধানে সর্বভারতীয় কৃত্যকের কথা উল্লেখ করা হয় (২৮২সি ধারা)। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে যথাক্রমে ৩০৯ এবং ৩১৪ নং ধারায় নিয়মানুগ পদ্ধতিতে প্রশাসনিক কৃত্যকে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ১৯৫১ সালে সর্বভারতীয় কৃত্যক আইন প্রণীত হয়।

৩০৯ নং ধারায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যস্তরে রাজ্যপালের দ্বারা নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী নিয়োগের কথা বলা হয়।

৩১০(১) নং ধারায় বলা হয় কেন্দ্র ও রাজ্য কৃত্যকের কর্মীরা যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে পদে বহাল থাকবেন। সংবিধানিক বিধি ও সীমার মধ্যে থেকে তাদের পদচ্যুত করা যেতে পারে।

৩১২ নং ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে সর্বভারতীয় কৃত্যক গঠনের কথা বলা হয়। যদি রাজ্যসভা উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, জাতীয় স্বার্থে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করে কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য সাধারণকৃত্যক সৃষ্টি করা প্রয়োজন, তা হলে পার্লামেন্ট তা করতে পারে।

এই ধারা বলে সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক; পুলিশ কৃত্যক, সর্বভারতীয় অরণ্য কৃত্যক, অর্থনৈতিক কৃত্যক, গাণিতিক কৃত্যক, স্বাস্থ্য কৃত্যক ইত্যাদি সৃষ্ট হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনে এই কর্মীদের নিয়োগ করা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় কৃত্যকের কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়। কেন্দ্রীয় কৃত্যকের অধিকর্তারা ভারতের যে কোনও স্থানে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থায় নিযুক্ত হতে পারেন। সর্বভারতীয় বিদেশ কৃত্যক, ডাক কৃত্যক, রেল হিসাব কৃত্যক, প্রতিরক্ষা হিসাব কৃত্যক, সর্বভারতীয় আয়কর কৃত্যক, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য কৃত্যক, অর্থনৈতিক ও গাণিতিক কৃত্যক, কেন্দ্রীয় তথ্য কৃত্যক ইত্যাদি কেন্দ্রীয় কৃত্যকের অধীনস্ত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীনে এরা কর্মরত থাকেন, এছাড়াও কর্মীব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মন্ত্রক এই কর্মীদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণের দায়িত্বে থাকেন ও অর্থ দপ্তর এদের বেতন কাঠামো, ভাতা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণের দায়িত্বে থাকেন। পদমর্যাদার নিরিখে এই কর্মীরা চারটি স্তরে বিন্যস্ত—শ্রেণী-I, শ্রেণী-II, শ্রেণী-III, শ্রেণী-IV।

প্রারম্ভিক পর্বে কেন্দ্রীয় সচিবালয় কৃত্যক ও চারটি স্তরে বিন্যস্ত—অধস্তন সচিব (শ্রেণী-১, স্তর-১), বিভাগীয় অধিকর্তা (স্তর-২, শ্রেণী-১), বিভাগীয় অধিকর্তা (শ্রেণী-২, নন্-গেজেটেড, স্তর-৩), সহকারী (শ্রেণী-২, নন্-গেজেটেড, স্তর-৪)।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সচিবালয় কৃত্যক নির্বাচিত স্তর (Selection grade) স্তর-১, বিভাগীয় অধিকর্তাদের স্তর, সহকারী স্তরে বিন্যস্ত। নির্বাচিত স্তরে আছেন যুগ্মসচিব, নির্দেশক, সহকারী সচিব। স্তর-১-এ আছেন অধস্তন সচিব ও সমতুল্য অধিকর্তা।

নির্বাচিত স্তর ও প্রথম স্তরভুক্ত অধিকর্তাদের পদোন্নতির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। বিভাগীয় স্তরে এক-তৃতীয়াংশ সরাসরি নিযুক্ত হন ও বাকী ক্ষেত্রে অন্তত আট বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের মধ্যে বার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষার মাধ্যমে অধিকর্তা নিয়োগ করা হয়।

এছাড়া করণিক, নিরাপত্তারক্ষী, পিওন, ইত্যাদিদের স্টাফ সিলেক্সন কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল ক্ষেত্রেও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

নিয়োগের ব্যবস্থাটি যে সকল পর্যায়ে পরিচালিত হয়, তা হল—

(১) পরীক্ষাসংক্রান্ত ঘোষণা,

(২) পরীক্ষা গ্রহণ ও যোগ্যতা নির্ধারণ,

(৩) যোগ্যতার স্বীকৃতি জ্ঞাপন,

(৪) প্রার্থী নির্বাচন,

(৫) নিয়োগ,

(৬) উপযুক্ত পদে প্রতিস্থাপন,

(৭) অভিমুখীকরণ।

১.৩.৩ কেন্দ্রীয় জন পালন কৃত্যক কর্মীদের নিয়োগের পদ্ধতি

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে নবীন প্রার্থীকে সরাসরি নিয়োগ করা হয় এবং বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীনকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। উর্ধ্বতন পদগুলিতে কাজের দায়িত্ব ও গুরুত্ব অধিক হওয়ায় পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ওপর জোর দেওয়া হয়। উর্ধ্বতন পদগুলিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা হলে কয়েকটি সুবিধা পাওয়া যায়—

(১) উর্ধ্বতন পদগুলিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী প্রাপ্তি এবং কর্মরত ব্যক্তিদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি,

(২) বেতন বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত দায়িত্ব সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চার,

(৩) বহুদিন কর্মরত প্রার্থীদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নিশ্চয়তা,

(৪) প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগ যে কর্মভার বৃদ্ধি করে, পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ হলে তা লাঘব হয়।

পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের কিছু সুফল আছে—

(i) এই পদ্ধতি নিয়োগের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে,

(ii) প্রতিভাবান প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে,

(iii) নিয়োগের সুযোগ প্রদানে বৈষম্য সৃষ্টি করে,

(iv) কৌশলবিদ্, বিজ্ঞানী ইত্যাদি ক্ষেত্রে দ্রুত উদ্ভাবন ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য নবীন প্রতিভার প্রয়োজন, যা এই পদ্ধতি অনুযায়ী পাওয়া যায় না,

(v) উর্ধ্বতন পদে কাজের জন্য যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দরকার এবং সৃষ্টিশীল মানসিকতার প্রয়োজন, বয়েসের ভারে তা অনেক সময়েই স্তিমিত হয়ে যায়।

নিয়োগের কোনও পদ্ধতিই বিশুদ্ধ নয়, অতঃপর অধিকাংশ দেশেই উভয় পদ্ধতির মধ্যে মিশ্রণ করার প্রচেষ্টা করা হয়। ভারতে সর্বভারতীয় কৃত্যক আইন, ১৯৫১ অনুযায়ী সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক কর্মীগণ রাজ্য কৃত্যক অধিকর্তাদের মধ্যে থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিযুক্ত হন। রাজ্য নির্বাচন কমিটির (Selection Committee) সুপারিশক্রমে এই পদোন্নতি দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কিছু গেজেটেড পদাভিষিক্ত

আধিকারিকদেরও IAS ক্যাডারে উন্নীত করা হয়। সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকের একটি বড় অংশ নিযুক্ত হন সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে।

সর্বভারতীয় পুলিশ কৃত্যকে উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী নিয়োগ ছাড়াও কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রে জরুরী কমিশন্ড অফিসার এবং শর্ট সার্ভিস কমিশন্ড অফিসারদের মধ্যে থেকেও বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়।

● সর্বভারতীয় কৃত্যক নিয়োগ—কোঠারী কমিটির সুপারিশ (১৯৭৯-১৯৯৩)

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন ১৯৭৪ সালে নিয়োগ ও প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি সম্বন্ধে সুপারিশ করার জন্য ডি. এস. কোঠারীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ১৯৭৬ সালে তার প্রতিবেদন পেশ করে এবং ১৯৭৯ সালে সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক নিয়োগে প্রথম পরিবর্তন সূচীত হয়।

কোঠারী কমিটির সুপারিশক্রমে কয়েকটি পর্যায়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

(a) প্রাথমিক পরীক্ষা—সংক্ষিপ্ত মৌলিক প্রশ্নের ভিত্তিতে গৃহীত এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মূল পরীক্ষায় বসা যেত।

(b) মূল পরীক্ষা—প্রথমে লিখিত ও উত্তীর্ণ হলে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক ব্যক্তিত্ব নির্ধারক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া যেত।

(c) উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মুসৌরীতে অবস্থিত লাল বাহাদুর ন্যাশানাল একাডেমি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এ প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হত। নয় মাসব্যাপী ফাউণ্ডেশন কোর্স গ্রহণের আগে পর্যন্ত মূল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর পরীক্ষার্থীকে জানান হত না এবং তাকে তার প্রস্তাবিত পদ সম্বন্ধেও অবহিত করা হত না।

(d) এই প্রশিক্ষণের পর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কৃত্যক কমিশনের বাছাই করা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলী বিচার করা হত এবং প্রার্থীকে তার প্রাপ্ত নম্বর জানান হত।

প্রাপ্ত নম্বরের ওপর ভিত্তি করে প্রার্থী পদ নির্ধারিত হত।

প্রারম্ভিক পরীক্ষায় গৃহীত বিষয়—

(i) সাধারণ পাঠ : ১৫০

(ii) ঐচ্ছিক বিষয় (১) : ৩০০

মূল পরীক্ষায় গৃহীত বিষয়াদি—

(i) অষ্টম তপসিলে উল্লিখিত ভারতীয় ভাষা	— ৩০০
(ii) ইংরাজী	— ৩০০
(iii) সাধারণ পাঠ (i)	— ৩০০
(iv) সাধারণ পাঠ (ii)	— ৩০০
(v) প্রথম ঐচ্ছিক বিষয়	— ৩০০
(vi) ঐচ্ছিক বিষয়	— ৩০০
(vii) দ্বিতীয় ঐচ্ছিক বিষয়	— ৩০০
(viii) দ্বিতীয় ঐচ্ছিক বিষয়	— ৩০০

প্রথম দুটি পত্রের নম্বর যুক্ত হত না বলে পরীক্ষার মোট নম্বর ছিল ১৮০০।

সাক্ষাৎকারের জন্য ২৫০ নম্বর ধার্য ছিল। মোট ২০৫০ নম্বরে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীকে পদ প্রদান করা হত। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন IAS, IPS, IFA, ১৬টি কেন্দ্রীয় গ্রুপ-এ ও আটটি গ্রুপ-বি কৃত্যকের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থা করত। ১৯৭৯ সালের পর থেকে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে স্নাতকগণ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারত। তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য এই বয়সসীমা আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা হয়। সাধারণ প্রার্থীগণ তিনবার এই পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেত, কিন্তু তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে এধরনের কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

● নিয়োগ সতীশ চন্দ্র কমিটির সুপারিশ—১৯৯৩

১৯৮৮ সনে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন পরীক্ষা ও নিয়োগ পরিকাঠামোর পর্যালোচনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে। এই কমিটি যে সুপারিশ করে তা হল—

(i) IAS, IFS, IPS, IAAS, Indian Income Tax Service (Class-I), Indian Customs and Central Excise Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Railway Traffic Service, Indian Railway Accounts Service, Indian Postal Service ইত্যাদির জন্য যুগ্ম পরীক্ষা গ্রহণ।

(ii) বয়সসীমা ২১ থেকে ২৮ বৎসরই রাখা হয়।

(iii) ১৯৯৩ সালের পরবর্তী পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ নম্বরের প্রবন্ধ যুক্ত হয় যা ইংরাজী অথবা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষায় লেখা যায়।

(iv) সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত নম্বর ২৫০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ করা হয়।

(v) ঐচ্ছিক বিষয়ের তালিকা থেকে ফরাসী, জার্মানী, চীনা, রাশিয়ান, আরবী, পার্সী, পালিকে বাদ দেওয়া হয় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানকে যুক্ত করা হয়।

(vi) সময়সাপেক্ষে ঐচ্ছিক বিষয়ের সিলেবাস, পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

(vii) চাকরী প্রদানের সময়ে প্রার্থীকে অবস্থান ও পছন্দের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়।

(viii) মুসৌরীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মান বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয় এবং গবেষণামূলক শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে আরো জ্ঞান বৃদ্ধির কথা বলা হয়।

(ix) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়নে সুপারিশ করা হয়।

(x) সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যাতে বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা করে, তার সুপারিশ করা হয়।

১.৪ রাজ্য কৃত্যকে কর্মী নিয়োগ

● রাজ্য কৃত্যকের উচ্চতর পদে কর্মী নিয়োগ

রাজ্য প্রশাসনের উচ্চতম পদগুলি নির্দিষ্ট থাকে সর্বভারতীয় কৃত্যকদের জন্য এবং এরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনের থাকেন। এই ব্যবস্থাকে অযুক্তরাষ্ট্রীয় বলা হয়ে থাকে। উচ্চতর পদে রাজ্য কৃত্যকের যোগ্যতম প্রার্থীগণ নিযুক্ত হন এবং এরা রাজ্য সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। সংবিধানের ৩০৯ থেকে ৩১১ নং ধারায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কৃত্যকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্য কৃত্যক থেকে সর্বভারতীয় কৃত্যকে পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকে।

বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যকৃত্যকের বৈশিষ্ট্য কিছু তারতম্য থাকে। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য কৃত্যক কমিশন WBCS (Executive) পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। কলকাতা, জলপাইগুড়ি দার্জিলিঙে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চার ধরনের চাকরীর জন্য যুগ্মভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

Group A— (i) West Bengal Civil Service (Executive)
(ii) WB Commercial Tax Service
(iii) WB Agricultural Income Tax Service
(iv) WB Excise Service
(v) WB Labour Service
(vi) Assistant Registrar of Co-operative Societies etc.

Group B— (i) WB Police Service

Group C— (i) Joint Block Development Officer
(ii) Asstt. Zonal Officer
(iii) Revenue Intelligence
(iv) Asstt. Commercial Tax Officer etc.

Group D— (i) Inspector of Co-operative Societies
(ii) Extension Officer for Panchayats
(iii) Rehabilitation Officer.

যোগ্যতা—স্নাতক অথবা ফাইনাল ইয়ারে পরীক্ষা দিয়েছে, ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি, এমন প্রার্থী।

বয়সসীমা : ২১ থেকে ৩২ বৎসর, Group A, C ও D-এর জন্য এবং ২০ থেকে ৩২ বৎসর Group B-এর জন্য।

পরীক্ষা পদ্ধতি :

প্রারম্ভিক পর্যায়—এই পর্বে ২০০ নম্বরে সাধারণ পাঠের পরীক্ষা হয়।

প্রারম্ভিক পর্বে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মূল পরীক্ষায় বসতে পারেন। মূল পরীক্ষার আবশ্যিক পত্রগুলি হল—

(i) বাংলা হিন্দী উর্দু নেপালী	১০০
(ii) ইংরাজী প্রবন্ধ ইত্যাদি	১০০
(iii) সাধারণ জ্ঞান ও সাম্প্রতিক বিষয়	১০০
(iv) ভারতের সংবিধান ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১০০
(v) পাটীগণিত ও যুক্তি জ্ঞান	১০০

এই পরীক্ষায় ঐচ্ছিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে Group-A, B প্রার্থীরা দুটি ঐচ্ছিক বিষয় নিতে পারেন, যার মোট মান ৪০০।

Group-C ও D প্রার্থীরা ২০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় নিতে পারেন।

সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে Group-A, B ও C-এর প্রার্থীদের মোট মান ২০০ এবং গ্রুপ ডি-এর জন্য নির্ধারিত মান ১০০।

- রাজ্য কৃত্যকে অধস্তন পদে কর্মী নিয়োগ

অধস্তন কৃত্যকে কর্মরত অধিকর্তাগণ পদমর্যাদা, সম্মান, ক্ষমতা ও দায়িত্বের নিরিখে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে বিরাজ করেন। এই স্তরে গেজেটেড অফিসার থাকলেও তারা কম বেতন কাঠামোয় অবস্থিত। এই অধিকর্তারা সরাসরি বা পদোন্নতির ভিত্তিতে নিযুক্ত হতে পারেন। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে রাজ্য রাষ্ট্র কৃত্যক কমিশন।

বিভিন্ন মন্ত্রকের অধীনে করনিক, হিসাবরক্ষক, প্রধান সহকারী ইত্যাদি অন্যান্য পদ ও প্রশাসন পরিচালনায় যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, বিভাগীয় অধিকর্তা, রাজ্য অধস্তন কৃত্যক নির্বাচন বোর্ড, স্টাফ সিলেকসন, কমিশন ইত্যাদিদের দ্বারা এই কর্মীরা নিযুক্ত হন এবং কিছু ক্ষেত্রে পদোন্নতির মাধ্যমেও এরা উন্নীত হন।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরাও প্রশাসন পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকেন। পিওন, ঝাড়ুদার, খালাসী, গবেষণাগারের সাহায্যকারী, ড্রাইভার, আর্দালী ইত্যাদিদের সাহায্য ছাড়াও প্রশাসন কার্যত অচল হয়ে পড়ে। দক্ষ ও অদক্ষ এই কর্মীদের নিয়োগ ক্ষেত্রে রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ভূমিকা থাকে।

রাজ্য প্রশাসনে স্থানীয় সায়ত্বশাসন সংস্থায় কর্মরত কর্মীরাও উল্লেখের দাবি রাখেন। উন্নয়মূলক প্রশাসন পরিচালনা, জনগণের অংশগ্রহণ ইত্যাদি প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা ও দায়িত্বের পরিবর্তন ঘটেছে। পৌরসংস্থা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় উচ্চ পর্যায়ের সর্বভারতীয় কৃত্যক ও রাজ্য কৃত্যক আধিকারিকগণ ছাড়াও যে সকল সাহায্যকারী কর্মী থাকেন, তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শেষোক্ত এই কর্মীরা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকেন। স্থানীয় প্রশাসনের কর্মরত এই সকল কর্মীবৃন্দ পদোন্নতি, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে ভোগ করেন না বলে অভিযোগ করে থাকেন। অনেকের মতে এর ফলে এই সকল কর্মীদের কাজের উৎসাহ হ্রাস পায়। রাজনৈতিক প্রভুত্ব এই কর্মীদের ইতিবাচক কর্ম তৎপরতার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে। দুর্নীতি প্রবণতা, শৃঙ্খলার অভাব, অদক্ষতা, কাজে অনীহা, অপেশাদারী মনোভাব ইত্যাদি স্থানীয় প্রশাসনের সফল কর্মনির্বাহের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়।

১.৫ সাধারণ ও বিশেষ যোগ্যতা

বিশ্বব্যাপী সকল রাষ্ট্রেই প্রশাসনিক কর্মী ও অধিকর্তা নিয়োগে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়—ভারতে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, বৃটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌর কৃত্যক কমিশন (Civil Service Commission) সরকারের হয়ে নিয়োগের দায়িত্ব পালন করেন। বাজার অর্থনীতি ও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার চাহিদার মধ্যে সমন্বয়সাধন বা সাইবারনেটিক রাষ্ট্রে বৈদ্যুতিন সরকারের সফল কর্ম পরিচালন, উন্নয়নের কাজে গণ অংশগ্রহণকে সক্রিয়তা দান ইত্যাদি তাগিদে প্রশাসনে দক্ষতা, কার্যকারিতা ও গতি আনার প্রয়োজন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণেই সকল রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের সময়ে তাদের যোগ্যতার বিষয়টি সুক্ষ্মভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যে দুটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়, তাহল, (a) সাধারণ যোগ্যতা ও (b) বিশেষ যোগ্যতা।

(a) সাধারণ যোগ্যতা : সাধারণ যোগ্যতা বলতে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরীক্ষা করা হয়। বিদেশিদের রাষ্ট্রকৃত্যকে যোগদান করতে সাধারণভাবে দেওয়া হয় না। এছাড়া বয়সও বিবেচনা করা হয়। ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনে ২১ থেকে ২৮ বছরের যুবক-যুবতীরা রাষ্ট্রকৃত্যকে যোগদান করার যোগ্য।

(b) বিশেষ যোগ্যতা :

(i) শিক্ষাগত যোগ্যতা ব্রিটেনের মতো ভারতেও রাষ্ট্রকৃত্যক পরিষেবাতেও প্রবেশের ন্যূনতম যোগ্যতা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনও উল্লেখ নেই।

(ii) অভিজ্ঞতা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বয়সসীমার থেকে কর্মে অভিজ্ঞতাই বেশি গুরুত্ব পায়—ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা যুবক-যুবতীরাই বেশিরভাগ থেকে অগ্রাধিকার পায় উচ্চতর পদগুলিতে, সচিব বা সমমর্যাদা সম্পন্ন পদে, প্রযুক্তিগত যোগ্যতা প্রয়োজন এমন পদে অভিজ্ঞতার নিরিখেই নিয়োগ করা হয়।

ব্যক্তিগত গুণাবলী—প্রার্থীর প্রশাসনিক দক্ষতা, কৌশল জ্ঞান, জ্ঞানের গভীরতা, উৎসাহ, বিশ্বাসযোগ্যতা, উদ্যম, মানিয়ে চলার ক্ষমতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। নমনীয়তা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, পরিচালন ও সংগঠন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান, পাঠ ও লেখনি ক্ষমতায় দক্ষতা, প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি ইত্যাদিকে ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে ধরা যেতে পারে।

রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মী নিয়োগ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনে ফুলটন কমিটিকে সম্পূর্ণ পর্যালোচনার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিটি সাধারণ প্রশাসনিকের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞদেরও প্রশাসনে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে। ফুলটন কমিটি দুঃখ প্রকাশ করে উল্লেখ করে যে "Scientists, engineer and members of specialist class were not generally given fuil responsibility and opportunities nor the corresponding authority." অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ এবং বিশেষজ্ঞ শ্রেণীকে যথেষ্ট দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি।

বরার্ট প্রেসথাস বলেন যে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে বিশেষজ্ঞ অস্বীকার করে প্রশাসনিক অদক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়—"...by denying the expert a greater role in administration, public services are likely to be characterised by incompetence."
ভারতে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনও সাধারণদের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের প্রশাসনে নিয়ে আসার কথা বলে।

জেনারেল বা সাধারণ শব্দটির এমনভাবে অর্থ নির্ধারিত হয়, যা সাধারণত্বকে অসাধারণ করে তোলে। সংসদীয় অভিধানে বলা হয়েছে যে (generalist) সাধারণ তিনি যার জ্ঞান এক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি একাধিক বিষয়ে পারঙ্গম, যিনি প্রধান। এরূপ একটি সংজ্ঞাগত ধারণা থেকেই সাধারণ প্রশাসকরা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন। পরিকল্পনা, সমন্বয়, তত্ত্বাবধানের দায়িত্বসম্পন্ন সাধারণ প্রশাসকরা 'প্রশাসন বিশেষজ্ঞ' হিসেবে ক্রমে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আহরণ করেন। বিশেষজ্ঞদের একটি বিশেষ বিষয়ে পারঙ্গম বলে চিহ্নিত করে সাধারণরা তাদের ঊর্ধ্বে নিজেদের স্থাপন করতে সচেষ্ট হন।

গ্রেট ব্রিটেন বা ভারতে সাধারণ প্রশাসকদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। রাজনৈতিক শাসকরা তাদের অনভিজ্ঞতা সাধারণ প্রশাসকদের ওপর তাদের নির্ভরতা বৃদ্ধি করায় তারা সাধারণ প্রশাসকদের প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেন। মন্ত্রী পরিষদের দায়-দায়িত্ব পালনে সাধারণ প্রশাসকদের সহযোগিতা অপরিহার্য। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের চলাফেরা ও কর্মের সুযোগ তাদের সর্বজ্ঞ প্রশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক। ভারতে ব্রিটিশ প্রভাবে সাধারণ প্রশাসকদের গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা যথেষ্ট স্পষ্ট। জওহরলাল নেহেরু এই সাধারণ প্রশাসকদের নিরপেক্ষতাকে গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক বলে মনে করতেন। পরে উন্নয়নের প্রশাসনের ধারা শুরু হলেও এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, গোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদির হাত ধরে প্রশাসনে নতুন গতির সঞ্চার হলেও সাধারণ প্রশাসকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা একেবারেই হ্রাস পায়নি। সমাজের সকল ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণ অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক নেতা ও জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক সাধারণ প্রশাসকের প্রশাসনিক কৌশল রপ্ত

করতে সাহায্য করে, ফলে প্রশাসনিক ঘাত-প্রতিঘাত রাজনীতি ও প্রশাসনের সম্পর্কের জটিলতা ইত্যাদি সাধারণ প্রশাসক অনেক সহজে উপলব্ধি করতে পারেন বলে মনে করা হয়। সাধারণ প্রশাসক কেবলমাত্র POSDCORB জাতীয় কাজই করেন না, তিনি মধ্যস্থতা করেন, সালিশী করেন, সমন্বয় করেন ও পরামর্শ দেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র স্তর বিন্যাস, সমান্তরাল স্তর বিন্যাস যৌথ স্তর বিন্যাস বা সম্মিলিত স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে সাধারণ বনাম বিশেষজ্ঞ প্রশাসকের মধ্যে বিতর্কের অবসান ঘটানোর প্রচেষ্টা হয়েছে।

সাধারণ প্রশাসনিকরা কৌশলবিদ বিশেষজ্ঞদের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হবেন এটাই প্রতিষ্ঠিত প্রথা। পরিকল্পনা সংগঠন, তত্ত্বাবধান, নির্দেশদান, সমন্বয়, প্রতিবেদন পেশ, বাজেট প্রস্তুত ইত্যাদির সাবেক প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন সাধারণরা। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন প্রশাসনিক কাটকারীতার স্বার্থে বিশেষজ্ঞদের কৃত্যকে আনয়নের ওপর জোর দিয়েছে। প্রশাসন পরিচালনার যে সকল কাজে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও কৌশলগত যোগ্যতা প্রয়োজন তথা প্রয়োগগত কৌশল আবশ্যক। যেখানে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ওপর ব্রিটেনে ফুলটন কমিটি ও ভারতে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন জোর দিয়েছে।

ভারতে নীতি নির্ধারণে সাধারণ প্রশাসনিকরাই গুরুত্ব পায়। সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি সাধারণদের দ্বারাই অলংকৃত। ডেপুটি সেক্রেটারী এবং তদুর্ধে সচিব পদে সাধারণরাই অগ্রাধিকার পান। ক্ষেত্রগত প্রশাসনে প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা নিযুক্ত হন। কৃষি বিভাগ নির্দেশক, স্বাস্থ্য দপ্তরে নির্দেশক, শিক্ষা দপ্তরে নির্দেশক অথবা জেলাস্তরে জেলা পুলিশ অধিকর্তা, জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তা ইত্যাদিরা বিশেষজ্ঞ প্রশাসক। জেলাস্তরে শেষোক্ত বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকেন সাধারণ প্রশাসক তথা জেলাশাসক, মহকুমা শাসক বা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক।

সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন সর্বভারতীয় কৃত্যকদের ধারণা যে তারা প্রতিভার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত, প্রশাসনের বিভিন্ন দিকে তাদের জ্ঞান বিস্তৃত ও প্রশাসনিক কৌশলে তারা সুদক্ষ। অতএব এরা প্রত্যাশা করেন যে বিশেষজ্ঞরা তাদের দ্বারা পরিচালিত হবেন। অপরপক্ষে বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, উন্নত প্রযুক্তি ছাড়া বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসন পরিচালনা সম্ভব নয়। উন্নয়নমূলক সকল কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান অপরিহার্য, অতপর তাদের পরামর্শ ছাড়া প্রশাসন অচল। বর্তমানে ভারতে কেন্দ্রীয় সচিবালয় প্রশাসনে বিশেষজ্ঞদের গুরুত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিষেবা (IES), ভারতীয় সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিষেবা (ISS), ভারতীয় বন পরিষেবা (IFS), ভারতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা (IHS) ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞরা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছেন। এযাবৎ বেতন কাঠামো ও পদোন্নতির সুযোগ নিয়ে বিশেষজ্ঞ প্রশাসকদের মধ্যে যে ক্ষোভের অবকাশ ছিল তা অচিরে দুর হলে প্রশাসনে গতি আনা সহজ হবে।

বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবছে। স্যাম পিত্রোদার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ প্রশাসক বিশেষজ্ঞদের গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও ক্যাবিনেট সচিবালয়ের বিশেষজ্ঞ প্রশাসকের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থ সচিবের পদ অর্থনীতি বিশেষজ্ঞই অলংকৃত করবেন, এবিষয়ে কোন দ্বিমত আজ আর নেই।

১.৬ সারাংশ

কর্মী ব্যবস্থাপনার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি যথাযথ পদে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন। বৃত্তি হিসেবে রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্মী নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই নিয়োগের ক্ষেত্রে সমযোগ্যতাসম্পন্নদের সমান সুযোগ দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়। প্রার্থী নির্বাচন ও নিয়োগ কয়েকটি পদ্ধতিতে হতে পারে—সরাসরি নিয়োগ, বিভাগীয় পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার, পদোন্নতি অথবা রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, স্টাফ সিলেকসন কমিশন, এস্টাব্লিশমেন্ট বোর্ড ইত্যাদির দ্বারা আয়োজিত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার

বা অন্য ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়োগ। রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থায় সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি রাখে সর্বভরাতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক। সংবিধানের ৩১২ ধারা বলে সৃষ্ট স্বাধীন ভারতের সর্ব প্রথম রাষ্ট্রকৃত্যক পরিষেবা হল সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক (IAS) এবং সর্বভারতীয় পুলিশকৃত্যক (IPS)। পরবর্তীকালে এই ধারা অনুসারে সর্বভারতীয় বনকৃত্যক, সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক কৃত্যক। সর্বভারতীয় সংখ্যাতাত্ত্বিক কৃত্যক, সর্বভারতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সর্বভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং পরিষেবা গঠিত হয়। এই কৃত্যকগণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রশাসন পরিচালনায় সহায়তা করেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় কৃত্যকের অধিকর্তাগণ পরীক্ষা বা পদোন্নতির ভিত্তিতে নিযুক্ত হন, যারা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন, যেমন, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা পরিষেবা, ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড এ্যাকাউন্টস সার্ভিস, সর্বভারতীয় ডাক পরিষেবা, সর্বভারতীয় রেল হিসাব পরীক্ষা পরিষেবা, সর্বভারতীয় রাজস্ব পরিষেবা ইত্যাদি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃত্যক কমিশন বা এস্টাব্লিসমেন্ট বোর্ড, সিনিয়র সিলেকসন বোর্ড (সচিব পর্যায়ে) দ্বারা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীরা স্টাফ সিলেকসন, কমিশন ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিজস্ব বিভাগের দ্বারা নিযুক্ত হন। পদোন্নতির মাধ্যমেও কর্মী নিয়োগ করা হয়ে থাকে। সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রে তপসিলি জাতি, উপজাতি, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

১.৭ অনুশীলনী

বড় প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন : (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১। পেশাভিত্তিক কর্মীব্যবস্থার মূল ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
উত্তর সংকেত : ১.২ ও ১.৩।

২। ভারতে পেশাভিত্তিক কর্মীব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাসটি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ১.৩.১ এবং ১.৩.২ (প্রথম অনুচ্ছেদ)।

৩। স্বাধীন ভারতে কর্মীব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি হয়?
উত্তর সংকেত : ১.৩.২।

৪। কেন্দ্রীয় জনপালনকৃত্যকে কর্মী নিয়োগের পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।
উত্তর সংকেত : ১.৩.৩।

৫। সর্বভারতীয় কৃত্যকে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কোঠারী কমিটির সুপারিশগুলি উল্লেখ করুন।

৬। সর্বভারতীয় কৃত্যকে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্র কমিটির সুপারিশগুলি কি? ১৯৭৯-'৯৩ ও ১৯৯৩-এর পরের পর্যায়ের তুলনামূলক মূল্যায়ন করুন।

৭। রাজ্যকৃত্যকে কর্মী নিয়োগ সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।
উত্তর সংকেত : ১.৪।

৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার যে মিশ্রণ ভারতে কর্মীব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় তা উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : নিজে ভেবে লিখুন।

৯। সাধারণ প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞ প্রশাসকের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়ে যে বিতর্ক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার আলোকে নিজের মতামত ব্যক্ত করুন।
উত্তর সংকেত : ১.৫।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন :

১। স্বাধীনতার পুর্বে ও পরে ভারতে কর্মীব্যবস্থায় যে প্রকৃতি পরিবর্তন হয়, তা সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ১.৩.১ এবং ১.৩.২।

২। উর্ধ্বতন পদগুলিতে পদোন্নতির ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগের সুবিধা ও সুফলগুলি আলোচনা করুন।
উত্তর সংকেত : ১.৩.৩।

৩। রাজ্যকৃত্যকের উর্ধ্বতন পদে কর্মী নিয়োগের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
উত্তর সংকেত : ১.৪.১।

৪। রাজ্যকৃত্যকের অধস্তন পদে কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করুন।
উত্তর সংকেত : ১.৪.২।

৫। প্রশাসন পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ প্রশাসকের গুরুত্ব কি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে? নিজের মতামত ব্যক্ত করুন।
উত্তর সংকেত : ১.৫।

৬। প্রশাসন পরিচালনায় পেশাভিত্তিক কর্মী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ১.২।

দু-একটি বাক্যে উত্তর দিন :

১। ব্রিটিশ ভারতে কবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ শুরু হয়?
উত্তর সংকেত : ১.৩ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ শেষাংশ।

২। এইচিসন কমিশনের সুপারিশটি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ১.৩.১ প্রথম অনুচ্ছেদ।

৩। মন্টফোর্ড প্রতিবেদনের সুপারিশ কি ছিল?
উত্তর সংকেত : ১.৩.১ প্রথম অনুচ্ছেদ।

৪। কর্মী নিয়োগের বিভিন্ন পর্যায়গুলি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ১.৩.২ শেষাংশ।

৫। সাধারণ প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞ প্রশাসকের মধ্যে মূল প্রভেদটি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ১.৫।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

1. Pfiffner and Presthus, *Public Administration.*
2. S. R. Maheswari, *Indian Administration.*
3. Government of India, Administrative Reforms Commission, *Report on Personnel Administration,* New Delhi, 1969.
4. Mohit Bhattacharya, *Indian Administration.*

একক ২ ☐ কর্মীনিয়োগ—স্বতন্ত্র নিয়োগকারী সংস্থা

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন
  ২.২.১ রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের দায়িত্ব
  ২.২.২ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য নিয়োগ ও অপসারণ
২.৩ রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন
  ২.৩.১ উদ্ভব ও পূর্ণতা প্রাপ্তি
  ২.৩.১ সদস্য নিয়োগ ও অপসারণ
  ২.৩.৩ রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কার্যাবলি
২.৪ অন্যান্য সরকারি কৃত্যক নিয়োগ
  ২.৪.১ সেন্ট্রাল এস্‌টাব্লিশমেন্ট বোর্ড এবং সিনিয়র সিলেকসন বোর্ড
  ২.৪.২ স্টাফ সিলেকসন কমিশন
২.৫ সারাংশ
২.৬ অনুশীলনী
২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- কর্মী নিয়োগে নিরপেক্ষ ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগকারী সংস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।
- ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে নিয়োগকারী সংস্থার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।
- বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মী নিয়োগ সম্বন্ধে জানা যাবে।

২.১ প্রস্তাবনা

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকে নিয়োগকারী সংস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে অধিকর্তা ও কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করে। বলা যেতে পারে যে, ১৮৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সিভিল সার্ভিস কমিশনের উত্তরসুরী হল এই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন। ১৮৫৪ সালের ম্যাকাওলে কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী সিভিল সার্ভিস কমিশন গঠিত হলেও এই কমিশন রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের পরীক্ষা গ্রহণ করত ইংল্যাণ্ডে। ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন অনুযায়ী (৯৬সি ধারা) ভারতে এই ধরনের

নিয়োগকারী সংস্থা গঠনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। ১৯২৪ সালের লি কমিশনের রিপোর্টেও ভারতে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়। অত:পর ১৯২৬ সালের পয়লা অক্টোবর একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বিত রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন আত্মপ্রকাশ করেন। এই কমিশনের নিয়োগ সংক্রান্ত দায়িত্ব উচ্চ পদাধিকারীদের মধ্যেই সীমিত ছিল এবং মূলত এই সংস্থা কেবলমাত্র একটি পরামর্শদানকারী সংস্থা হিসেবেই থেকে যায়। সাইমন কমিশন পুনরায় এই রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করে। ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনে এই কমিশনকে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই কমিশনের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু যেহেতু গভর্ণর জেনারেলের একক ইচ্ছায় এই নিয়োগকারী সংস্থার চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ নিযুক্ত হতেন, অতএব এর উদ্দেশ্য বিকৃত হয়।

২.২ স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন

স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতীয় সংবিধানের ৩১৫ নং ধারায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়। এই ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হয়—কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের প্রয়োজনীয়তা অত:পর স্বাধীন ভারতে যথাযথভাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই ধরনের কমিশন যে একান্ত উপযোগী তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীকৃত কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেন্দ্রের কৃত্যক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে রাজ্যকৃত্যক নিয়োগের বিষয়টিকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। সংবিধানের ৩২০(১) ধারায় কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসন পরিচালনার জন্য যথাক্রমে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন ও রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কথা উল্লেখ করা হয়। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃত্যকগণই সাধারণভাবে এই কমিশন কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বিবেচিত হন এবং এদের নিয়োগের সুপারিশই কমিশনের তরফ থেকে আসে। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের বন্দোবস্ত ও সুপারিশ করে অন্যান্য সংস্থা এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের ক্ষেত্রে সাধারণত বিভাগীয় নিয়োগের নীতিকেই গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ১৯৮৫ সালের পর থেকে আনবিক শক্তি বিভাগ বিজ্ঞান ও শিল্পসংক্রান্ত গবেষণা পরিষদে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃত্যক নিয়োগের দায়িত্ব সরাসরি উক্ত বিভাগগুলির ওপর অর্পিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের নিয়োগের দায়িত্ব যথেষ্ট সীমিত। উপরন্তু এটি পরামর্শদানকারী একটি সংস্থা, যদিও সরকার এই সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ সাধারণভাবে গ্রহণ করে, নচেৎ সংসদে আলোচনার অবকাশ থেকে যায় এবং সরকারের সঙ্গে কমিশনের সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

২.২.১ রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের দায়িত্ব

- কৃত্যক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদিতে পরামর্শ প্রদান,
- প্রার্থীর নিয়োগ, পদসৃষ্টি, পদ ও প্রার্থীর বদলি, পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ,
- বিভাগীয় কাজে শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান,
- কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কর্মীদের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দান,
- কর্মী যদি সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনও আইনগত বাঁধার সম্মুখীন হন, সেক্ষেত্রে আইনগত উপায়ে সমস্যার সমাধানের জন্য যে খরচ হবে, তা কেন্দ্র বা রাজ্য সঞ্চিত তহবিল থেকে প্রদান করা হবে কিনা সে সম্বন্ধে সুপারিশ করা,

● অবসরকালীন ভাতা, বিশেষত যদি কোনও কর্মী সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আহত বা অক্ষম হয়ে পড়েন, সেক্ষেত্রে কি হারে এবং কিভাবে তাকে অবসরকালীন সুবিধা প্রয়োগ করা হবে সে সম্বন্ধে সুপারিশ করে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন।

সংবিধানের ৩২০ ধারায় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত হলেও একথাও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে কোনও বিষয়কে কমিশনের অগোচরে রাখতে পারেন। ৩২১ ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রয়োজনে কমিশনকে অতিরিক্ত দায়িত্বভার দেওয়া যেতে পারে।

২.২.২ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য নিয়োগ ও অপসারণ

সংবিধানের ৩১৬ নং ধারায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য নিয়োগের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হবেন। ৪২তম ও ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের (১৯৭৬-১৯৭৮) পর রাষ্ট্রপতির ভূমিকায় কিঞ্চিত পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি যেহেতু প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকেন, অতএব উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রেও স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীপরিষদের ভূমিকাই প্রাধান্য পায়।

কমিশনের সদস্য সংখ্যা কত হওয়া উচিৎ এবিষয়ে সংবিধানে কিছু নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কাজের ক্রমবর্ধমান চাপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কমিশনের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্তত অর্ধেকের কাছাকাছি সদস্য ভারত সরকারের অধীনে দশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধিকর্তা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সদস্যগণ ৬৫ বছর বয়স অথবা অন্তত ছয় বছর কার্যকাল, যেটি প্রথমে হবে, এই ভিত্তিতে নিযুক্ত হবেন। কমিশনের চেয়ারম্যান অন্য কোনও সরকারি পদে অভিষিক্ত হতে পারেন না এবং অন্যান্য সদস্যরা কেবল রাজ রাষ্ট্রকৃত্যকে কমিশন বা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের চেয়ারম্যান হতে পারেন (৩১৯ ধারা)। রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য ও চেয়ারম্যান একবার নিযুক্ত হওয়ার পর তাদের চাকরীর শর্তাদি বদল করা যায় না। কমিশন যেহেতু উচ্চ পদাধিকারী সরকারি অধিকর্তাদের নিয়োগকারী সংস্থা, অতএব কমিশনের নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা। তবে এ প্রসঙ্গে সরকার কর্মী থাকাকালীন অবস্থায় কমিশনের সদস্য পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের পেশাদারিত্ব নিয়ে এস. আর. মহেশ্বরী তাঁর Indian Administration বইতে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায় "The commission is office is staffed by personnel already in service with the Government, with the inevitable result that professionalism of staff is not very prominently demonstrated." অর্থাৎ কমিশনের কর্মীদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পেশাদারিত্বের লক্ষণ যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়নি।

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন তার কর্মীব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এই মর্মে সুপারিশ করেছেন যে, সরকারের উচিৎ যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের অন্যান্য সদস্য, এমনকি পরবর্তী চেয়ারম্যান নিয়োগের সময়েও কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করা। ARC আরো উল্লেখ করেছে যে, অভিজ্ঞতার গুরুত্ব মাথায় রেখে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যকে আঞ্চলিক রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য বা চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা প্রয়োজন।

কোনও কারণে যদি কমিশনের চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হয়ে যায়, তাহলে রাষ্ট্রপতি সদস্যদের যে কোনও একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে অস্থায়ী দায়িত্ব দিতে পারেন, যতদিন না স্থায়ী চেয়ারম্যান পুনরায় তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

কমিশনের সদস্য বা চেয়ারম্যানের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেও অসদাচরণ বা অক্ষমতাজনিত কারণে তাকে অপসারণ করা যায়। অসদাচরণের অভিযোগ উঠলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের কাছে তদন্তর জন্য পাঠান। সুপ্রীম কোর্টে রায় ও পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অভিযুক্ত সদস্যকে বরখাস্ত করতে বাধ্য থাকেন। তদন্ত চলাকালীন

সময়েও উক্ত সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মানসিক বা শারীরিক অক্ষমতা, দেউলিয়া অথবা অন্য কোনও সংস্থায় সদস্য কর্মরত এই অভিযোগে অপসারণ করতে পারেন। কমিশনের সদস্য ও চেয়ারম্যান যাতে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন, তার জন্যই অভিযোগের তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের হাতে। রাজনৈতিক চাপ থেকে সমস্ত বিষয়টিকে উর্ধ্বে রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিয়োগকারী সংস্থা হিসাবে কমিশনের দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, নৈতিকতা ও পেশাদারিত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এম. আর. মহেশ্বরী এ প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে, "Due to lack of judiciousness in the appointment of its members persons of very mediocar abilities have found their way into the commission" অর্থাৎ সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার অভাবে মধমেধার মানুষও কমিশনে স্থান পেয়ে গেছে।

তাঁর মতে কমিশনের সদস্য মনোনয়নের সময়ে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় না, ফলে মধ্যমমানের প্রার্থীরা কমিশনের সদস্যপদ পায়। এর প্রভাব পড়ে পরীক্ষা ব্যবস্থা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের ওপর কমিশনের গুণগত মান যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। জন্মলগ্নে কমিশন্ ছিল অবাঞ্ছনীয় প্রার্থীদের বহিষ্কারের প্রতিষ্ঠান, পরবর্তীকালে ক্রমে এই কমিশন প্রতিভা সন্ধানকারী একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। বর্তমানে একবিংশের কমিশন একই সঙ্গে সরকারি কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির সহায়ক একটি প্রতিষ্ঠান। এহেন অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সদস্য নিয়োগে যথার্থভাবে যত্নবান হওয়া আবশ্যক। ১৯৯১ সালে যেভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ সর্বভারতীয় কৃত্যকের যুগ্ম পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি হলে সরকারের প্রশাসনিক বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হবে।

২.৩ রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন

২.৩.১ উদ্ভব ও পূর্ণতা প্রাপ্তি

১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত দিলেও আঞ্চলিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য এরূপ কোনও কমিশনের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত আইনে বলা হয়েছিল যে আঞ্চলিক আইন সভাগুলি আইন প্রণয়ন করে এই ধরনের কমিশন গঠন করতে পারে। ১৯২৯ সালে মাদ্রাস আঞ্চলিক আইন পরিষদ এই আইন প্রণয়ন করে আঞ্চলিক রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠন করে।

আঞ্চলিক প্রশাসন যাতে রাজনৈতিক অনুগ্রহ বিতরণের উপযুক্ত স্থান হিসেবে গড়ে না ওঠে, সেই জন্য সাইমন কমিশন (১৯৩০) আঞ্চলিক কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ১৯৩০ সালে গোল টেবিল বৈঠকে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শ্বেতপত্রে আঞ্চলিক রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, এমনকি প্রয়োজনবোধে একাধিক রাজ্যের জন্য যুগ্ম কমিশন গঠনের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়।

১৯৩৫ সালে ভারত সরকার আইনের ২৬৪ নং ভাগে বলা হয় যে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একটি করে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠন করা হবে। এরপর পাঞ্জাব উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, (পরিধিভুক্ত অঞ্চল), সিন্ধ যুগ্ম কমিশন গড়ে তোলে এবং অনুরূপভাবে বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যাঞ্চল একটি যুগ্ম কমিশন গঠন করে।

স্বাধীন ভারতে প্রতিটি রাজ্যের প্রশাসনিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আঞ্চলিক রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গড়ে তোলা হয়েছে। যারা কেন্দ্রের কমিশনের মতই রাজ্য প্রশাসনিক কর্মী নিয়োগের দায়িত্বে থাকেন। ৩১৫ থেকে ৩২০ ধারায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সঙ্গে রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কথাও উল্লিখিত আছে। ৩১৫(২) ধারায় দুই

বা ততোধিক রাজ্যের সম্মতিক্রমে যুগ্ম কমিশন গঠনের কথাও বলা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির আইনসভায় বিষয়টি অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। ৩১৫(৩) ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনও একটি রাজ্যের রাজ্যপাল প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কাছে রাজ্যের কৃত্যক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাহায্যের অনুরোধ রাখতে পারেন।

২.৩.২ সদস্য নিয়োগ ও অপসারণ

সংবিধানের ৩১৫ ধারা অনুযায়ী রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য ও চেয়ারম্যান রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। যুগ্ম কমিশনের ক্ষেত্রে এই নিয়োগের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে বর্তায়। অন্তত অর্ধেক সদস্য ন্যূনতম দশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত হন। এই আধিকারিকরা সরকারের সচিব, বিভাগীয় সচিব ভারতীয় উচ্চ পদাধিকারী ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন। প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক, বিজ্ঞানী, আইন ব্যবসায়ী ইত্যাদিদেরও এই সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। কোনও কারণে চেয়ারম্যান পদে যদি কোনও শূন্যতা সৃষ্টি হয় তাহলে রাজ্যপাল অন্য কোনও সদস্যকে অস্থায়ীভাবে (যতদিন না স্থায়ী চেয়ারম্যান পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন বা নিযুক্ত হন) এই দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন।

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছেন যে, রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য নিয়োগের সময়ে কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে রাজ্যপাল আলোচনা করবেন। পরবর্তী চেয়ারম্যান নিয়োগের সময়েও কর্মরত রাজ্য কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কমিশনের সদ্য পদপ্রাপ্তির জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকা আবশ্যক। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য হলেও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বেড়াজালে তাকে আবদ্ধ না করায় অনেক সময়েই কমিশনের সদস্য নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আইন কমিশন তার চতুর্থ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, **"...in some of the states appointments to the Commissions are made not on consideration of merit but on grounds of party and political affiliations"**. অর্থাৎ কোন কোন রাজ্যে রাজনীতি ও দলীয় সমীকরণ নিয়োগ কার্যকে প্রভাবিত করেছে।

রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সংযোগ কমিশনের সদস্য নিয়োগের ভিত্তি হলে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা বিনষ্ট হবে, প্রশাসনিক দক্ষতা হ্রাস পাবে ও প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কমে যাবে। অনেক রাজ্যে এমন অভিযোগও শোনা যায় যে, অর্থবলে কমিশনের সদস্য পদ প্রাপ্তি সম্ভব। এই ধরনের অভিযোগ উন্নয়নের কাজে গণমুখী, সংবেদনশীল, কার্যকরী প্রশাসন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের মতই রাজ্য কমিশনের সদস্যদের ক্ষেত্রেও কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে অসদাচারণের জন্য তাদের অপসারণ করা যেতে পারে। সদস্যরা রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হলেও একমাত্র রাষ্ট্রপতিই তাদের সুপ্রীম কোর্টের তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে অপসারণ করতে পারেন, তবে তদন্ত চলাকালীন সময়ে রাজ্যপাল তাদের সাময়িক বরখাস্ত করতে পারেন। এছাড়া স্বাভাবিকভাবে ৬২ বছর বয়স অথবা ছয় বছর কার্যকাল যেটি পূর্বে হবে। এই ভিত্তিতে তারা পদে আসীন থাকেন।

২.৩.৩ রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কার্যাবলি

রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন যে সকল দায়িত্ব পালন করে তা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সীমানার মধ্যেই এই দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। ৩২৯ ধারা অনুযায়ী রাজ্য আইনসভা কমিশনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে। কেন্দ্রের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ন্যায় রাজ্য কমিশনও একটি পরামর্শদানকারী সংস্থা মাত্র।

রাজ্য কমিশনের অনেক পরামর্শই অনেক রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন না, যার নজির বিরল নয়। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ব্যতিক্রম হলেও বিভিন্ন রাজ্যে এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে। সংবিধানের ৩২৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, কেন্দ্র বা রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন তাদের পরামর্শ যে সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়নি, তার বাৎসরিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের কাছে পেশ করবেন এবং তা যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সংসদ বা রাজ্য আইনসভায় পেশ করা হবে। এছাড়া রাজ্যপাল রীতিসম্মতভাবে রাজ্য বা রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের এক্তিয়ার সংকুচিত করতে পারেন, তবে অন্তত ১৪ দিন সময় হাতে নিয়ে তা রাজ্য আইনসভায় পেশ করা হবে এবং রাজ্য আইনসভা প্রয়োজনবোধে তাতে সংযোজন বা সংশোধন করতে পারে। আরো উল্লেখ্য যে, রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে, কিন্তু কমিশনের কোনও সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ না করলে তা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যায় না। বলা যেতে পারে যে, কেন্দ্র বা রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন মানবসম্পদ উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নয়।

২.৪ অন্যান্য সরকারি কৃত্যক নিয়োগ

২.৪.১ সেন্ট্রাল এস্টাব্লিশমেন্ট বোর্ড এবং সিনিয়র সিলেকসন বোর্ড

ডেপুটি সচিব বা তদুর্ধে যে সকল উচ্চপদস্থ প্রশাসন বিশেষজ্ঞ সরকারি প্রশাসন পরিচালনায় সহযোগিতা করেন তাদের নিয়োগ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রাণাধীনে পরিচালিত হয়। সেন্ট্রাল এসটাব্লিশমেন্ট বোর্ড (১৯৫৭) এই নিয়োগের দায়িত্বে থাকেন। প্রশাসনিক স্তরে এই বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক স্তরে ক্যাবিনেট কমিটি এই নিয়োগের ক্ষেত্রটি তত্ত্বাবধান করে থাকে। কর্মী ব্যবস্থাপনা (Personnel) মন্ত্রকের অধীনে এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত।

১৯৭০ সাল থেকে কর্মী ব্যবস্থাপনা মন্ত্রকের সচিবের সভাপতিত্বে পরিচালিত 'সেন্ট্রাল এসটাব্লিশমেন্ট বোর্ড' অধস্তন সচিব বা তদুর্ধে প্রতিষ্ঠিত সচিবদের, যারা যুগ্ম সচিবের অধীনস্ত, তাদের নিয়োগের সুপারিশ করে। 'সিনিয়র সিলেকসন বোর্ড' যুগ্ম সচিব এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন অ-সচিবিত্ত পদের নিয়োগের সুপারিশ করে। পরবর্তী এই বোর্ডে সভাপতিত্ব করেন ক্যাবিনেট সচিব। এই বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরাও সচিব পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। এই দুটি বোর্ডেরই পরামর্শ ক্যাবিনেট কমিটির কাছে পেশ করা হয় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শেষোক্ত এই কমিটি।

২.৪.২ স্টাফ সিলেকসন কমিশন

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পদাধিকারীদের নিয়োগের দায়িত্বে থাকেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন। ১৯৭৫ সালের পর থেকে তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মী নিয়োগের জন্য স্টাফ সিলেকসন কমিশন গঠন করা হয়। প্রযুক্তিগত যোগ্যতা লাগে না এমন পদে, সংযুক্ত কার্যালয়ের কর্মী নিয়োগে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত অন্যান্য অধস্তন পদে কর্মী নিয়োগের জন্য স্টাফ সিলেকসন কমিশনের সাহায্য নেওয়া হয়। রেল, মহাগণনা ও হিসাব পরীক্ষকের দপ্তর, সাধারণ হিসাব পরীক্ষকের দপ্তর ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়কে SSC এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। রেলের নিয়োগের জন্য রেলওয়ে সার্ভিস কমিশন বা বোর্ড আছে। স্টাফ সিলেকসন কমিশন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল দায়িত্ব পালন করে তা হল—

(১) করনিক (কেন্দ্র সরকার) নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আয়োজন।

(২) কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের স্টেনোগ্রাফার—পরিষেবায় কর্মী নিয়োগের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৩) চতুর্থ থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আয়োজন।

(৪) টাইপিস্ট নিয়োগের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

স্টাফ সিলেকসন কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের অতিরিক্ত সচিবের পদসম্পন্নদের মধ্যে থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। এই কমিশনের সদস্যদের কার্যকাল বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না থাকায় বিভাগের ইচ্ছার ওপর তার অনেকাংশে নির্ভর করে। স্টাফ সিলেকসন কমিশন কর্মী ব্যবস্থাপনা মন্ত্রকের সংযুক্ত কার্যালয়ের মতো মর্যাদা ভোগ করে। এই কমিশন বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক শাখার মাধ্যমে দায়িত্ব নির্বাহ করে থাকে।

পঞ্চম বেতন কমিশন কেন্দ্র ও রাজ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সিভিল সার্ভিস বোর্ড (CSB) গঠনের সুপারিশ করেছে। এই বোর্ড ও ক্যাবিনেটের নিয়োগ কমিটি যৌথভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের কৃত্যক নিয়োগ তত্ত্বাবধান করবে। পঞ্চম বেতন কমিশন চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগেরও সুপারিশ করেছে।

২.৫ সারাংশ

কেন্দ্র এবং রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন উত্থাপিত সকল প্রশ্নে পরামর্শ দিতে বাধ্য থাকে। নিয়োগ পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলাভঙ্গ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এই কমিশনগুলি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরামর্শ চাইতে পারেন। তবে এই পরামর্শ কোনও ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক নয় বলে কেন্দ্র বা রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। কোনও ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা সীমিত করার সুযোগও যেহেতু থেকে যায়, অত:পর কমিশনের কার্যকারিতা হ্রাসের সম্ভাবনা অমূলক নয়। অনুন্নত সম্প্রদায়, তপশিলি জাতি, উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের প্রশ্নে, যেমন কমিশনের এক্তিয়ার স্বীকৃত নয়।

এছাড়া কমিশনের কার্যকারিতা ও নিরপেক্ষতা সন্দেহের উর্ধ্বে না হওয়ার আর একটি অন্যতম কারণ হল। কমিশনের সদস্য ও চেয়ারম্যান নিয়োগে সচ্ছতার অভাব বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষত রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য নিয়োগে জাত, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও দক্ষতার চেয়ে অধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। ফলত প্রশাসনিক দক্ষতা হ্রাস পায় এবং জাতি গঠনের উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।

২.৬ অনুশীলনী

বড় প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন : (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১। রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।
উত্তর সংকেত : ২.১ এবং ২.২।

২। রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ২.২, ২.২.১।

৩। রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য সদস্য নিয়োগে কি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে?
উত্তর সংকেত : ২.২.২।

৪। রাজ্যকৃত্যক কমিশনে সদস্য নিয়োগ পদ্ধতির মুল্যায়ন করুন।
উত্তর সংকেত : ২.৩.২।

৫। রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ২.৩.৩।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (৫০টি শব্দের মধ্যে)

১। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকে কমিশনের সদস্যদের কী কী কারণে অপসারণ করা যেতে পারে?
উত্তর সংকেত : ২.২.২ পঞ্চম অনুচ্ছেদ।

২। রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে একটি টীকা লিখুন।
উত্তর সংকেত : ২.৩.১।

৩। সেন্ট্রাল এস্টাব্লিশমেন্ট বোর্ড এবং সিনিয়র সিলেকসন বোর্ডের দায়িত্ব সম্বন্ধে টীকা লিখুন।
উত্তর সংকেত : ২.৪.১।

৪। রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের দায়িত্বের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ২.২, ২.২.১ (শেষাংশ)।

৫। স্টাফ সিলেকসন কমিশনের কাজ ও ভূমিকা উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ২.৪.২।

দু-একটি বাক্যে উত্তর দিন :

১। সিভিল সার্ভিস কমিশন সম্বন্ধে ধারণাটি ব্যক্ত করুন।
উত্তর সংকেত : ২.১।

২। রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন প্রথম কবে ও কী ভূমিকা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে?
উত্তর সংকেত : ২.১।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন কবে গঠিত হয় ও এর মুখ্য ত্রুটি কী ছিল?
উত্তর সংকেত : ২.১।

৪। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন কিভাবে প্রাথমিক স্বীকৃতি পায়?
উত্তর সংকেত : ২.২।

৫। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য নিয়োগে ARC-এর সুপারিশটি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ২.২.২।

৬। একবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের পরিবর্তিত ভূমিকাটি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ২.২.২ (শেষাংশ)।

৭। CSB বলতে কি বোঝেন?
উত্তর সংকেত : ২.৪।

৮। ন্যূনতম দুটি বিষয় উল্লেখ করুন, যা কমিশনের গুরুত্ব হ্রাস করে।
উত্তর সংকেত : ২.২ এবং ২.৫।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

1. Rumki Basu, *Public Administration* (Concepts and Theories).
2. R. K. Arora, (et al), *Indian Public Administration.*
3. Asok Chanda, *Indian Administration.*
4. S. R. Maheswari, *Indian Administration.*
5. S. R. Maheswari, Public Administration in India.
6. *Report on Fifth Pay Commission.*

একক ৩ ❑ প্রশিক্ষণ ও কর্মী উন্নয়ন

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ প্রশিক্ষণ—উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি

৩.৩ প্রশিক্ষণের কৌশল

৩.৪ ভারতে কর্মী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

৩.৪.১ কেন্দ্র স্তরে প্রশিক্ষণ

৩.৪.২ কর্মীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি—চাকরীরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ

৩.৪.৩ রাজ্য স্তরে প্রশিক্ষণ

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানা যাবে।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী ব্যবস্থাপনায় গুণগত মান বৃদ্ধি কিভাবে করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।
- ভারতে কর্মী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যাবে।

৩.১ প্রস্তাবনা

কর্মী ব্যবস্থাপনার মুল লক্ষ্য হল প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিকশিত করা। ওয়েবারিও আমলাতন্ত্রের ধারণাতেও যোগ্য কর্মী নিয়োগের জন্য যথাযথ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা হয়। ক্রমে রাষ্ট্র যখন তার কাজের পরিধি বিস্তার করেছে, দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন ততই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তৃতীয় বিশ্বে জাতি গঠনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি আরো বেশি প্রয়োজন বলে মনে করা যেতে পারে। এডওয়ার্ড ওয়েড্নার, ফ্রেডারিক রিগস্ প্রমুখরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রশাসনের চাহিদা পাশ্চাত্যের উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। রিগসের মতে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশাসনকে সাজিয়ে তোলা উচিৎ। এই সকল বিষয়ের সঙ্গে দেশের আইন, সংবিধান, প্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা ছাড়া সুদক্ষ প্রশাসন গড়ে উঠতে পারে না। যে কোনও দেশের প্রশাসনিক কর্মীরা নিযুক্ত হওয়ার পর যাতে দেশের চাহিদা, জাতীয় স্বার্থ, সংবিধান, আইন, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান এবং প্রশাসনিক কৌশল সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা পেতে পারেন, সেইজন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশাসনিক কাজের ব্যাপ্তি ও জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণের গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.২ প্রশিক্ষণ—উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি

প্রশাসনিক দক্ষতা, কর্মকুশলতা ও পেশাদারিত্ব সুনিশ্চিত করার তাগিদ থেকেই প্রশিক্ষণের কথা ভাবা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এযাবৎ প্রাপ্ত পুঁথিগত পাঠের সীমা অতিক্রম করে প্রয়োগের জগতে প্রবেশের জন্য যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা হয়। ভাবনার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবের মাটিতে কাজ করবার অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রথম পাঠ এই প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মী যাতে তার যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রেখে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মীকে তার কাজের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে ও তার দৃষ্টি স্বচ্ছ করে। নাইগ্রোর মতে, The function of training is to help employees grow, not only from the stand point of mechanical efficiency but also in terms of broad outlook and perspective which public servants need—(Felix Nigro, Public Administration—Readings and Documents) অর্থাৎ প্রশিক্ষণ শুধু দক্ষতাই বাড়ায় না কর্মী সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৃহত্তর প্রেক্ষিত-এর ইঙ্গিত বুঝতে সাহায্য করে। যান্ত্রিক দক্ষতার সঙ্গে কর্মীদের দৃষ্টি প্রসারিত করার লক্ষ্যেও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সংগঠনের লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করে প্রশিক্ষণ। সরকারি কর্মীদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে সংগঠনের স্বার্থে তাদের দায়িত্বশীলতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করাই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

যে কোনও রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীর প্রশিক্ষণ শুরু হয় আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। রাষ্ট্রকৃত্যকে প্রবেশের পূর্বে যোগ্যতা অর্জনের জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তাকে পুঁথিগত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী কিছু প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া পৃথিবীর কয়েকটি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রকৃত্যকে প্রবেশানুরাগী প্রার্থীদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন সম্বন্ধে ধারণা প্রদানের জন্য প্রবেশ—পূর্বে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরূপ একটি দেশ, যেখানে ছাত্ররা নির্দিষ্ট কিছু সংগঠনে হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়।

রাষ্ট্রকৃত্যক প্রবেশের পর কর্মীর প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য যে ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তা কিয়দংশে আনুষ্ঠানিক। কর্মীর কাজ ও তার পরিবেশ সম্বন্ধে যাতে সম্যক ধারণা হয়, সেজন্য অভিমুখীকরণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিভাগীয় প্রবীন অধিকর্তাদের দ্বারা বা বাইরের কোনও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দেশ, কাল ও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে এই প্রশিক্ষণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

● উন্নয়নশীল দেশে প্রশিক্ষণের প্রকৃতি

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নমুখী প্রশাসনের সাফল্যের কথা মাথায় রেখে নিয়মমাফিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নমুখী প্রশিক্ষণের কথাও ভাবা হয়। প্রথমোক্ত প্রশিক্ষণের কাজের প্রকৃতি, নথি সংরক্ষণ, কর্মপদ্ধতি, পরিচালন, কাজের মূল্যায়ণ, হিসাবসংরক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়। শেষোক্ত ব্যবস্থায় সরকারের উন্নয়নের ধারণ, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও জাতি গঠনের চাহিদার সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই দুই ধরনের প্রশিক্ষণ সম্মিলিত প্রয়াসে মানব সম্পদের বিকাশ ঘটিয়ে প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারে। প্রশাসনিক কর্মীকে সামাজিক পরিবর্তনের বাহক হিসেবে তখনই গড়ে তোলা সম্ভব যখন উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিছক নির্লিপ্ত নীতি প্রয়োগকারীর ভূমিকা থেকে উন্নীত করে সক্রিয় সমাজ সচেতক হিসেবে তার চেতনার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে। তবে সরকারকেও উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের ধারক হিসেবে কাজ করতে হবে। যাতে প্রশাসনিক কর্মীর সঙ্গে একযোগে যে উন্নয়নের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশে প্রশিক্ষণের চাহিদা উন্নত দেশগুলি থেকে কিছুটা ভিন্ন মাত্রা বহন করে। উন্নয়নশীল দেশে নানাবিধ চাপ ও সমস্যা প্রতিনিয়ত প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করে। এর মোকাবিলা করার জন্য প্রশাসক ও কর্মীকে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও চাহিদা সম্বন্ধে অবহিত হতে হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীকে বিশ্লেষণাত্মক করে তোলার প্রচেষ্টা হয়। যাতে জটিল সমাজতান্ত্রিক সমস্যাকে যথাযথভাবে সে অনুভব করতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশে প্রশাসনিক কর্মী কেবল নীতি প্রয়োগকারী নয়, জনগণের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীলতা ও জনগণের সঙ্গে নৈকট্য উন্নয়নের প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য। উন্নয়নের প্রশাসনের ধারণা ক্রমে বিবর্তিত হয়ে যে অংশগ্রহণকারী পরিচালনের (Participatory Management) ধারনায় উন্নীত হতে চলেছে, তাতেও প্রশাসনিক কর্মীকে অনেক বেশি গণমুখী হয়ে উঠতে হয়। সাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রয়োজন সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে বিশদ ধারণা, প্রকল্প বাস্তবায়ণের উদ্যম ও দক্ষতা, মূল্যায়ণ ও আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে ক্রমোন্নতির আকাঙ্ক্ষা। উন্নয়নশীল দেশে জনস্বার্থে প্রশাসনিক কর্মীকে অনেক বেশি ধৈর্যশীল, স্পর্শকাতর, উদ্ভাবন শক্তিসম্পন্ন হতে হয়। নিজের সঙ্গে সহকর্মী ও গ্রাহকের উৎসাহ, কর্মস্পৃহা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কাজে প্রশাসনিক কর্মীকে নিয়োজিত হতে হয়। এই কারণে উন্নয়নশীল দেশে প্রশাসনিক কর্মীর প্রয়োজন হয় বিশেষ প্রশিক্ষণের।

তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কর্মীর যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে প্রবীন আধিকারিকগণ ও প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত থাকে, প্রশিক্ষণের সাফল্য ও ব্যর্থতার অধিকাংশ দায়ই তার। প্রশিক্ষণ প্রদানকারীকে অনেক বেশি উদার ও নমনীয় হতে হবে। পরিবর্তিত সময়ের চাহিদা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে হবে এবং সাবেক রক্ষণশীলতা গণ্ডী অতিক্রম করে সৃষ্টিশীল মন ও উদ্যমকে স্বাগত জানানোর মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

৩.৩ প্রশিক্ষণের কৌশল

প্রশাসনিক কর্মীর প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন কার যেতে পারে। দেশীয় চাহিদা ও উন্নয়নের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ও সর্বাধিক কার্যকারিতার নিরিখে কোনও একটি কৌশলকে গ্রহণ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে বক্তৃতা, গোষ্ঠী আলোচনা, ক্ষেত্রগত ঘটনা বিশ্লেষণ, প্রাসঙ্গিক সমস্যার সমাধান সূত্র নির্ণয়ের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীকে তার কাজের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

★ বক্তৃতার মাধ্যমে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাতে বিতর্ক, আলোচনা, সম্মেলন প্রভৃতির দ্বারা কর্মীর দৃষ্টি প্রসারিত করার প্রচেষ্টা করা হয়।

★ একই ধরনের কাজের জন্য নির্বাচিত, সমস্বার্থসম্পন্ন কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একদিকে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয় ও অন্যদিকে জ্ঞান বৃদ্ধি ও সমস্যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

★ ক্ষেত্র স্তরে প্রশাসনকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার বিশ্লেষণ করে কর্মীর চেতনাকে জাগ্রত করা হয় এবং কর্মীকে সমস্যা ও তার সমাধান সূত্র সম্বন্ধে অবহিত করা হয়। প্রবীণ প্রশিক্ষকরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মীর জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করেন।

★ প্রশিক্ষণের একটি বিশেষ পর্যায়ে কর্মীকে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে বলা হয়। এই ঘটনা থেকে সমস্যার জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করে তার সম্ভাব্য সমাধান সম্বন্ধে কর্মীকে লিখতে বলা হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মীকে যুক্তি সহযোগে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

এছাড়া নির্দিষ্ট অবস্থানে কর্মীর সম্ভাব্য ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ সে সম্বন্ধে ধারণা প্রদান ও কর্মীর আত্ম সমালোচনা ও উন্নতির প্রচেষ্টা বৃদ্ধির ক্ষমতার ওপর প্রশিক্ষণের সময়ে জোর দেওয়া হয়। উন্নয়নশীল দেশে গ্রামীণ এলাকায় ক্ষেত্রগত প্রশিক্ষণের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩.৪ ভারতে কর্মী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

৩.৪.১ কেন্দ্র স্তরে প্রশিক্ষণ

স্বাধীন ভারতে প্রশাসনকে উন্নয়নমুখী করে তোলার তাগিদ থেকে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। গণতন্ত্রকে তার শৈশব থেকে প্রাপ্ত বয়স্কের পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রশাসনের সাহায্য চাওয়া হয়, তা এযাবৎ ব্রিটিশ প্রভাবে গড়ে ওঠা প্রশাসনিক সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে (১৮০০-১৮০৬) বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজে (১৮০৯-১৯৫৭) যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার তদানিন্তন ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কর্মীদের জন্য করেছিলেন, তার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন, উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থের অনুকুল।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকদের জন্যপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা করা হয়। ১৯৫৭ সালে সিমলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু হয়। ১৯৫৯ সালে এই দুটি কেন্দ্রকে মিলিত করা হয়। ১৯৭২ সালে লাল-বাহাদুর শাস্ত্রী এ্যাকাডেমী অফ এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন (মুসৌরী) তার যাত্রা শুরু করে। কর্মী ব্যবস্থাপনা মন্ত্রকের অধীনে অপর যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি কাজ করে তা হল ইনস্টিটিউট অফ সেক্রেটারিয়েট ট্রেনিং এণ্ড ম্যানেজমেন্ট (নিউ দিল্লী) মুসৌরীর এ্যাকাডেমীতে উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রকৃত্যকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং শেষোক্তটিতে মধ্যম পর্যায়ের অধিকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এ্যাকাডেমীতে দুটি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। IAS ও IPS অধিকর্তাদের আইন, অর্থনীতি, জনপ্রশাসন, পরিচালন, ভারতীয় ইতিহাস, সংবিধান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়। চার মাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণের পর রাজ্যস্তরে জেলায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও রাজ্য সচিবালয়েও এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা আবার ফিরে আসে মুসৌরীর এ্যাকাডেমীতে। শেষ পর্যায়ে তিনমাস ব্যাপী রাজ্যস্তরে প্রশাসনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ করে।

হায়দ্রাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ন্যাশানাল পুলিশ এ্যাকাডেমীতে ভারতীয় পুলিশ কৃত্যকের সম্ভাব্য আধিকারিকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি ফৌজদারী দণ্ডবিধি, অপরাধ বিজ্ঞান, অপরাধ দমন কৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয় এবং শারীরিক কৌশল ব্যায়াম, অস্ত্রশিক্ষা, ড্রাইভিং ইত্যাদির শেখানো হয়। এরপর প্রায় নয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণাধীন প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য শাখায় ক্ষেত্রগত প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয় এবং এই সময়ে তার প্রশিক্ষণ চলে রাজ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এই পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলে সে পুনরায় হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রে যোগদান করে ও রাজ্য ও জেলাস্তরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণতা পায়। পরিচালন, তত্ত্বাবধান, পরিকল্পনা গ্রহণ, সমস্যার দ্রুত সমাধান নির্ণয় থেকে শুরু করে শারীরিক দক্ষতার মূল্যায়ণ পূর্বক তার সার্বিক যোগ্যতার মূল্যমান নির্ধারিত হয়।

৩.৪.২ কর্মীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি—চাকরীরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ

সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক ও পুলিশকৃত্যকের সদস্যদের চাকরীর মধ্য পর্যায়েও প্রশিক্ষণ নিতে হয়। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত নবনিযুক্তদের জন্যই একমাত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত প্রবীনদেরও প্রশিক্ষণের জন্য

কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কিছু গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ পরিচালন তত্ত্ব থেকে শুরু করে কৌশলগত কিছু বিষয়ে এমনভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে কর্মী নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্বের সঙ্গে নিয়ত পরিচিত থাকেন। এই ধরনের কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তথা—Staff College হল—

1. Administrative Staff College of India, Hyderabad (Autonomous).
2. Administrative Staff College for Educational Planners and Administrators, New Delhi.
3. Central Emergency Relief Training Institute, Nagpur.
4. National Police Academy, Hyderabad.
5. Management Development Institute, Gurgeon.
6. Customs and Central Excise Training School, New Delhi.
7. Institute of Applied Manpower Research, New Delhi.
8. Railway Staff College, Baroda.
9. Customs and Central Excises Training School, New Delhi.
10. Family Planning Training and Research Centre, New Delhi.
11. Indian Institute of Public Administration, New Delhi (government sponsored).
12. Indian Revenue Service (Income Tax) Staff College, Nagpur.
13. National Institute of Rural Development, Hyderabad.
14. Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management, Pune.
15. Indian Audit and Accounts Staff Training College, Shimla.
16. Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi.
17. Indian Institute of Mass Communication, New Delhi.
18. National Institute for Training in Industrial Engineering, Bombay (New Mumbai).

কেন্দ্র সরকারের আগ্রহে আয়োজিত প্রশিক্ষণগুলি পরিচালনার দায়িত্বে থাকে কর্মী ব্যবস্থাপনা দপ্তর, অভিযোগ ও পেনসন মন্ত্রকের প্রশিক্ষণ বিভাগ। এই বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সহায়তায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশাসনিক উন্নয়ন প্রকল্প, পরিচালন উন্নয়ন প্রকল্প, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ, সাংগঠনিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে এই বিভাগ।

এছাড়া স্বতন্ত্র ক্ষেত্রগুলিও প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাব্লিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন, ব্যাঙ্কারস্ ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি উল্লেখের দাবি রাখে।

চাকুরীরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্প্রতি বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে এই ধরনের প্রশিক্ষণ একান্ত আবশ্যক বলে বিবেচিত হতে শুরু করেছে। প্রধানত সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকদের জন্যই এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মী উন্নয়নের প্রধান স্তম্ভ হল কর্মীর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং এই লক্ষ্য নিয়েই কর্মরত অবস্থায় প্রশাসনিক কৃত্যকদের কথা ভাবা হয়েছে। প্রাপ্ত জ্ঞান ও বিদ্যার পরিমার্জন এবং নতুন ভাবনা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা, এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রশাসনিক কর্মকুশলতা ও সময়োপযোগিতা বৃদ্ধি করতে চাইলে এই ধরনের প্রশিক্ষণ একান্ত জরুরী। কর্মীর বিকাশকে ক্রমে পরিপূর্ণতা দান করে এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

কর্মী ব্যবস্থাপনা মন্ত্রক কর্মরত অবস্থায় কর্মী ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি পরিচালনা করে থাকেন। ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে প্রত্যেক সর্বভারতীয় কৃত্যক কর্মীকে সপ্তাহব্যাপী রিফ্রেশার কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে। ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে যে প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হয়। তাতে একই পাঠক্রমে নবীন-প্রবীন আধিকারিকদের একই সঙ্গে প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা হয়, যাতে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও বোঝাপড়া সহজ হয়।

চাকরীতে অন্তত ছয় থেকে নয় বছরের অভিজ্ঞতা হয়েছে এমন আধিকারিকদের জন্যও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তিন সপ্তাহব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ক্ষেত্রস্তরে কাজ পরিচালনা, প্রকল্প রূপায়ণ, পরিবেশ পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

১০ থেকে ১৬ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের জন্য আধুনিক পরিচালন তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানান দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়।

১৭ থেকে ২০ বছরের অভিজ্ঞ আধিকারিকদের জন্য নীতি গ্রহণ, পরিকল্পনা রূপায়ণ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৯৪-'৯৫ সালে কর্মী ব্যবস্থাপনা, জন অভিযোগ ও পেনসন মন্ত্রক অন্তত ১৮টি এরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। তিন সপ্তাহব্যাপী এই প্রশিক্ষণ পর্বের সঙ্গে সঙ্গে বত্রিশটি এক সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৪-'৯৫ সালে যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করার হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—প্রশাসনিক পরিবেশ, সাংগঠনিক আচরণবিধি, কেন্দ্র রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, শিল্পনীতি, পরিবেশ পরিচালনা, সমাজ কল্যাণ, অর্থনৈতিক পরিচালন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পৌর উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জলনীতি বিশ্লেষণ, উগ্রপন্থা ও হিংসার কারণ ও সমাধান, শক্তি ও উন্নয়ন ইত্যাদি। এই সকল প্রশিক্ষণ বিশেষত সাধারণ যোগ্যতা বৃদ্ধির সহায়ক এবং কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে গৃহীত দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাব্লিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক আয়োজিত Advanced Professional Programme-এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি রাখে। চাকরীর মধ্যবর্তী পর্যায়ে কর্মীর কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি ও পেশাগত উন্নয়নে এই পাঠক্রমের বিশতম পর্বটি যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক আধিকারিকরা নয় মাস ব্যাপী এই পাঠক্রমে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রশিক্ষণসূচী চূড়ান্ত সফল করে তুলেছিলেন। এছাড়া হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভলপমেন্ট (National Institute of Rural Development) এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ (Administrative Staff College) এই ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ভাগ্যবান আধিকারিকরা পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পান এবং গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াতে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়াকে তারা জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে মনে করেন। এই প্রশিক্ষণগুলি আর বাধ্যবাধকতা থাকে না, বরং এগুলি কর্মীর কর্মস্পৃহা, উৎসাহ, তৃপ্তি বৃদ্ধি করে এবং অবশ্যই কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানের প্রসারতা বাড়াতে এগুলি বিশেষ সহায়ক। এই প্রশিক্ষণগুলির আয়োজন করে UNDP, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, ব্রিটিশ কাউন্সিল, ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইত্যাদিরা। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই প্রশিক্ষণের প্রেরণের পূর্বে দেশের অর্থ ভাণ্ডার, প্রশিক্ষণের উপযোগিতা ও প্রার্থীর যোগ্যতা যথাযথভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে সমমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির মৌলিক কাঠামো, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা দরকার, সর্বোত্তম প্রশিক্ষক ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সহযোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। উপরন্তু প্রশিক্ষণ যাতে কেবল নিয়মমাফিক একটি প্রয়োজন হিসেবে থেকে না যায়, তার জন্য প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান যাতে কর্মী তৃপ্তি সহকারে প্রয়োগ করতে পারে, সে বিষয়ে সজাগ থাকা দরকার। দক্ষ ও অভিজ্ঞ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি আধিকারিক এবং বিদগ্ধ তাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদরা

যদি প্রশিক্ষক হিসেবে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ক্লাসরুম প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্ষেত্রগত প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে প্রশিক্ষণের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। ক্লাসরুম প্রশিক্ষণে উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ পুস্তক, পত্রিকার সহজলভ্যতা এবং প্রাপক ও প্রেরকের মধ্যে সহজ আদান-প্রদান সুনিশ্চিত হওয়া দরকার।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, করণিকদের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি ও কর্মে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য কোনও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সেভাবে নেই। সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক ও পুলিশ কৃত্যকের কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে করণিকদের অভিমুখীকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ভারতীয় জনপ্রশাসনের গুণগত মান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রশিক্ষণের কার্যকারীতা অনস্বীকার্য।

৩.৪.৩ রাজ্য স্তরে প্রশিক্ষণ

রাজ্যেও রাষ্ট্রকৃত্যক সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। প্রথমে এধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুরু হয় উত্তরপ্রদেশে এবং তারপর আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে। বর্তমানে সকল রাজ্যেই নিজস্ব কৃত্যক ও কেন্দ্রীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি হল—

1) Administrative Training Institute (ATI), Salt Lake
2) Police Training College, Barrackpore
3) State Institute of Panchayats and Rural Devolopment, Kalyano
4) Institute of Local Government and Urban studies, Salt Lake, ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৭ সালে বম্বেতে বেসরকারি স্তরে প্রথম এধরনের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র—All India Institute of Local Self Government গঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে গড়ে ওঠে হরিশচন্দ্র মাথুর রাজস্থান স্টেট ইনস্টিটিউট অব পাব্লিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি মধ্যবর্তী এবং অধীনস্ত কর্মীদেরই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করত। ১৯৫৮ সালে তৈরি হয় The National Institute of Rural Development—১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নিউ দিল্লীতে পৌর প্রশাসন সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তাদের নিজস্ব বিদগ্ধ শিক্ষক থাকেন, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাইরে থেকে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ, অধিকর্তা ইত্যাদিদের আমন্ত্রণ জানান হয়। পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সদস্য ও আমন্ত্রিত উভয় প্রশিক্ষকই মুল বেতনের ১৫ শতাংশ ভাতা প্রশিক্ষণের দরুণ পেয়ে থাকেন।

পঞ্চম বেতন কমিশন সকল স্তরে আয়োজিত প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বেসরকারি ক্ষেত্র এবং অভিজ্ঞ প্রবীন আধিকারিকদের সঙ্গে আদান-প্রদানের ওপরেও এই পে কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিভিন্ন কর্মশালা, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। পদোন্নতির অন্যতম মানদণ্ড হিসেবেও প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩.৫ সারাংশ

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যাশা করা হয় যে এই প্রশিক্ষণ কর্মীদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করবে এবং প্রশাসনিক জটিলতা ও বাস্তবতা কর্মীর কাছে সহজবোধ্য হয়ে উঠবে। উন্নয়নের

প্রশাসনের চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় রেখেই এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কিন্তু কর্মী যখন পুনরায় নিজেকে শিক্ষনবিস হিসেবে পায় তখন তার প্রথম নতুন অবস্থানে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রশ্নটি জরুরী হয়ে ওঠে। একবার কর্মী নিজে প্রশিক্ষণ নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে পারলে কর্মী নিজে ও প্রশাসন উপকৃত হয়। কর্মী পাঠে আগ্রহ বৃদ্ধি পেলে নতুন ভাবনা চিন্তার আলোকে কর্মী প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবে তা যথেষ্ট প্রত্যাশিত। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় অপর একটি সমস্যা হল ভারতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে বিদেশে, বিশেষত পাশ্চাত্যের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকায় পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়, যা কেবল অর্থ ব্যয়ে বৃদ্ধি করে তাই নয়, উন্নয়নের প্রশাসনের উদ্দেশ্য থেকে চ্যুত হয়। প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা সুনিশ্চিত করলে এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে।

৩.৬ অনুশীলনী

বড় প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন : (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১। প্রশাসনিক কর্মকুশলতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।
উত্তর সংকেত : ২.২।

২। উন্নয়নশীল দেশে প্রশিক্ষণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর সংকেত : ২.২.১।

৩। প্রশিক্ষণের কৌশলগুলি উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ লিখুন।
উত্তর সংকেত : ২.৩।

৪। সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক ও সর্বভারতীয় পুলিশকৃত্যকের কর্মীদের জন্য প্রারম্ভিক পর্বে যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তা উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ২.৪.১।

৫। পাশ্চাত্যের প্রশিক্ষণকেন্দ্র বনাম ভারতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে, উভয়ের উপযোগিতা বিষয়ে একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনা করুন।
উত্তর সংকেত : ২.৪.২ শেষের আগের অনুচ্ছেদ ও সারাংশ।

৬। পশ্চিমবঙ্গে কর্মী প্রশিক্ষণের কি ব্যবস্থা আছে?
উত্তর সংকেত : ২.৪.৩।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (৫০টি শব্দের মধ্যে)

১। প্রশিক্ষণের লক্ষ্য সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।
উত্তর সংকেত : ২.১ এবং ২.২ প্রথম অনুচ্ছেদ—নির্বাচিত অংশ।

২। প্রশিক্ষণের পর্যায়গুলি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ২.২ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

৩। ভারতের কর্মী প্রশিক্ষণ কিভাবে শুরু হয়?
উত্তর সংকেত : ২.৪ প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

৪। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী অ্যাকাডেমীতে কিভাবে কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়?
উত্তর সংকেত : ২.৪.১ তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

৫। সর্বভারতীয় পুলিশ কৃত্যকের আধিকারিকদের চাকরীর প্রারম্ভে প্রশিক্ষণ দানের কি ব্যবস্থা আছে?
উত্তর সংকেত : ২.৪.১ চতুর্থ অনুচ্ছেদ।

৬। চাকরীর মধ্য পর্যায়ে কর্মী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কী?
উত্তর সংকেত : ২.৪.২ চতুর্থ অনুচ্ছেদ।

৭। চাকুরীরত অবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মী প্রশিক্ষণের কি ব্যবস্থা আছে?
উত্তর সংকেত : ২.৪.২ পঞ্চম থেকে অষ্টম অনুচ্ছেদ।

৮। ১৯১৪-'৯৫ সালে কর্মীব্যবস্থাপনা, জনঅভিযোগ ও পেনসনমন্ত্রক যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, তা উল্লেখ কর।
উত্তর সংকেত : ২.৪.২ নবম অনুচ্ছেদ।

দু-একটি বাক্যে উত্তর দিন :

১। অভিমুখী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কী?
উত্তর সংকেত : ২.২ তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

২। উন্নয়নমুখী প্রশাসন বলতে কী বোঝায়?
উত্তর সংকেত : ২.২.১।

৩। চাকুরী কালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কবে শুরু হয়?
উত্তর সংকেত : ২.৪.২ প্রথম অনুচ্ছেদ।

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃত্যকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কয়েকটির উল্লেখ কর।
উত্তর সংকেত : ২.৪.২ প্রথম অনুচ্ছেদ।

৫। কিভাবে কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে?
উত্তর সংকেত : ২.৪.২ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

৬। কর্মরত কেন্দ্রীয় কৃত্যকদের জন্য রিফ্রেশর কোর্স করে ও কিভাবে শুরু হয়?
উত্তর সংকেত : ২.৪.২ পঞ্চম অনুচ্ছেদ।

৭। Advanced Professional Programme সম্বন্ধে উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : নবম অনুচ্ছেদ।

৮। পাশ্চাত্যের কর্মী প্রশিক্ষণের পৃষ্ঠপোষকতা করে কারা?
উত্তর সংকেত : ২.৪.২ শেষের আগের অনুচ্ছেদ।

৯। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম লিখুন।
উত্তর সংকেত : ২.৪.৩।

১০। স্বাধীন ভারতে প্রথম আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কোনটি?
উত্তর সংকেত : ২.৪.৩।

১১। পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশটি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ২.৪.৩।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

1. C. P. Bhanbhri, *Administration in a Changing Society,* Delhi, National Publishing House, 1972.
2. C. P. Bhanbhri, *Bureaucracy and Politics in India,* Delhi, Vikas, 1971.
3. Mohit Bhattacharya, *Bureaucracy and Development Administration,* New Delhi, Uppal Publishing House, 1979.
4. Mohit Bhattacharya, *Public Administration,* Calcutta, World Press, 2000.
5. Mohit Bhattacharya, *Indian Administration,* Calcutta, World Press, 2000.
6. N. C. Ray, *The Civil Service :n India,* Calcutta, Firma, K. L. Mukhopadhya, 1958.
7. Philip Woodruff, *The Men who Ruled India : The Founders,* London, Jorathan Capa, 1935.

একক ৪ ☐ কর্মীব্যবস্থা—সাংগঠনিক কাঠামো

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ পদের শ্রেণী বিভাজন
৪.৩ পদের শ্রেণী বিভাজনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি
৪.৪ স্তর বিন্যাস
৪.৫ শ্রেণী বিভাজন—প্রেক্ষিত ভারতবর্ষ
  ৪.৫.১ কেন্দ্রীয় সচিবালয় পরিষেবা
  ৪.৫.২ আঞ্চলিক কৃত্যক
৪.৬ ক্ষতিপূরণ
৪.৭ পদোন্নতি ও বদলি
৪.৮ সারাংশ
৪.৭ অনুশীলনী
৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- কর্মী ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে,
- শ্রেণী বিভাজনের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও প্রয়োগ বৈচিত্র সম্বন্ধে জানা যাবে,
- কর্মীদের কাজের বিভিন্ন শর্ত ও সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যাবে এবং
- সাম্প্রতিক কালে পঞ্চম বেতন কমিশন এ বিষয়ে যে সকল সুপারিশ করেছে, তার কিছু আভাষ পাওয়া যাবে।

৪.১ প্রস্তাবনা

রাষ্ট্রকৃত্যকের ভূমিকা বর্তমানে আর নীতি প্রয়োগকারী হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়। পঞ্চম বেতন কমিশন উল্লেখ করেছে যে রাষ্ট্রকৃত্যকে এখন কেবলমাত্র Controllers and regulators নয়, তাদের ভূমিকা1 'Catalysts, Promoters and facilitators' হিসাবে দেখা হয়ে থাকে।

সংখ্যা ও গুণগত মানে যথাযথ অবস্থান প্রশাসনিক সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। কর্মীদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব অর্পণ পদ শ্রেণী বিভাজনের মূল কথা। কর্মী ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যের সাফল্য নির্ভর করে পদের ভিত্তিতে প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাসের উপযুক্ততার ওপর। সমমানের প্রযুক্তিগত জ্ঞান, পেশাদারিত্ব ও প্রশাসনিক যোগ্যতা ও দায়িত্বের নিরিখে কৃত্যকে পদ বিন্যাস প্রশাসনিক সাফল্যের প্রাথমিক ভিত্তি। একটি প্রশাসনকে সুসজ্জিত করতে

হলে বিভিন্ন পদে কাজ ও দায়িত্বগুলি চিহ্নিত করতে হয়, যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করতে হয়, সমমর্যাদাসম্পন্ন পদগুলির সম্মেলন করতে হয় এবং দায়িত্বের নিরিখে স্তর বিন্যাস করতে হয়। নিম্নে এই বিষয়টিই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হল।

৪.২ পদের শ্রেণী বিভাজন—একটি ধারণা

কোনও একটি কৃত্যককে পরিপূর্ণতা দান করতে হলে ও সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে পদ শ্রেণী বিভাজন অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রেই প্রশাসনিক চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাজন করা হয়ে থাকে। প্রশাসনিক স্তর বিন্যাসের মূল ভিত্তি হল পদ শ্রেণী বিভাজন, যা দায়িত্ব ও কাজ চিহ্নিত করে প্রশাসনিক কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করে। পদ শ্রেণী বিভাজন যেমন একদিকে উল্লম্ব স্তর বিন্যাসের ভিত্তি, অন্যদিকে অনুভূমিক দায়িত্ব বন্টনেরও আধার। যে কোনও কৃত্যকে উল্লম্ব শ্রেণী বিভাজনকে যেমন লালন করা হয়, তেমনি একই পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মী ও আধিকারিকদের মধ্যে সমন্বয়ের ওপরও জোর দেওয়া হয়। সাধারণ প্রশাসকদের পদ শ্রেণী বিভাজনে শেষোক্ত এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা অধিক দেখা যায়। এর কারণ হল মূলত একই ধরণের যোগ্যতা ও প্রশাসনিক জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুভূমিকা সচলতা সহজসাধ্য হয়। বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের ক্ষেত্রে এই সচলতা সীমিত, কারণ একজন চীফ ইঞ্জিনীয়ারের দায়িত্ব একজন অর্থনীতিবিদ, পালন করতে পারেন না। বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদের ক্ষেত্রে একই কারণে উল্লম্ব সচলতার সুযোগও সীমিত, যেমন—বিভাগের একজন ওভারসীয়ার কখনোই চীফ ইঞ্জিনীয়ার পদে উন্নীত হতে পারেন না। পদ শ্রেণীবিভাজনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল একটি নিখুঁত প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা, যার ভিত্তি বিজ্ঞান সম্মতভাবে যোগ্যতা নির্ধারণ, কোনও ব্যক্তিগত বিবেচনা বা পছন্দ নয়। প্রশাসনিক কাঠামোয় মৌলিকতা আনয়নে পদ শ্রেণীবিভাজনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১৯৪৯ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে শ্রেণী বিভাজন আইন প্রণীত হয় তাতে পদ শ্রেণীবিভাজনের সঙ্গে বেতন ও অন্যান্য ক্ষতিপূরণের বিষয়টিকে সম্পর্কযুক্ত বলে ধরা হয়। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে একই কাজের জন্য একই বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয়। দায়িত্ব কাজের পরিমাণ, জটিলতা, যোগ্যতার সঙ্গে সমানানুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের কথা বলা হয়। এই আইনে কর্মী ও আধিকারিকের অবদান ও ক্ষমতাকে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়। আইনে বলা হয় যে, প্রত্যেক পদের শ্রেণীগত ও স্তরগত অবস্থান চিহ্নিত হওয়া দরকার এবং কাজ, দায়িত্ব ও যোগ্যতা অনুযায়ী পদগুলির গোষ্ঠীবদ্ধকরণ করা হবে। অর্থাৎ এই আইনে পদ শ্রেণীবিভাজনে যে তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয় তা হল—কাজ ও কর্তব্য, কাজের পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। এই তিনটি বিষয়ের গুরুত্বের ভিত্তিতে পদমর্যাদা নির্ধারিত হবে।

৪.৩ পদের শ্রেণী বিভাজনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি

একটি সুসংগঠিত কর্মী ব্যবস্থাপনা সর্বদাই কর্মীর যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে কোনও প্রশাসনিক দায়িত্ব নির্বাহে এমনভাবে কর্মীকে কাজে লাগাতে হয়, যাতে কর্মীর যোগ্যতা ও দক্ষতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে ও তা সংগঠনের লক্ষ্যকে সফল করে তুলতে সহায়ক হয়। যথাযত কর্মী নির্বাচন কর্মীর উৎসাহ বৃদ্ধি করে ও সংগঠনের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে তোলে। এই ধারণা থেকেই রাষ্ট্রকৃত্যকে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করার তাগিদ অনুভূত হয় এবং রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্যদের কাছে ক্রমে তার ভূমিকা পেশা বা বৃত্তিতে পরিণত হয়। যে কোনও কাজে যে কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ না করে প্রশাসনিক কাজে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা সকল রাষ্ট্রের সরকারই ক্রমে উপলব্ধি করতে থাকেন। ফেলিক্স নিগ্রো বলেছেন—"The relationship between good administration and high

quality personnel is by no means a discovery of the modern age". "আধুনিক কালে সুষ্ঠ প্রশাসন ও উচ্চমানের কর্মীর মধ্যে যে ওতোপ্রত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা স্বীকার করে নিয়ে নিগ্রো আরো উল্লেখ করেছেন যে— Personnel administration is the art of selecting new employees and making use of old ones in such a manner that the maximum quality and quantity of output and service are obtained from the working force. অর্থাৎ নবনিযুক্ত ও প্রবীন কর্মীকে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে, যাতে সংখ্যাগত ও গুণগত বিচারে সর্বাধিক উৎপাদন ও পরিষেবা পাওয়া যায়। পেশা বা জীবিকা হিসেবে (career) রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থার বিকাশ দু-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দিয়েছে—ইতিবাচক ও নেতিবাচক। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রার্থীর মেধা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির নিরিখে পদ প্রদান এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী অযোগ্যকে দূরে সরিয়ে রাখা (keeping the rascals out)। রাষ্ট্রকৃত্যকে জীবিকা হিসেবে যারা গ্রহণ করবেন, তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পদ লাভ করবেন, এটা প্রত্যাশিত এবং এক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ উৎসাহ বৃদ্ধি করে। এই ধরনের কৃত্যক প্রশাসনের স্তম্ভস্বরূপ। জীবিকা হিসেবে রাষ্ট্রকৃত্যকের বিকাশের মূল নিহিত আছে যথাযথ শ্রেণীবিভাজন ও পদ সৃষ্টির মধ্যে। কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি ও প্রশাসনের সাফল্যের পূর্বশর্ত হল উপযুক্ত পদ শ্রেণী বিন্যাস।

জন প্রশাসনের সাধারণ পরিভাষায় শ্রেণীবিন্যাস বলতে বোঝায় দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে পদগুলির গোষ্ঠীবদ্ধকরণ। মিল্টন এস. ম্যানডেল যথার্থই বলেছেন যে, "By classification is meant the grouping of positions on the basis of similarity of duties and qualification requirements". Dimock-এর মতে পদের শ্রেণী বিন্যাস বলতে বোঝায়—"systematic sorting ranking of positions in a hierarchical sequence according to comparative difficulty and responsibility"—তুলনামূলক জটিলতা ও দায়িত্বের ভিত্তিতে পদগুলির বাছাই ও স্তর নির্ণয় করে ক্রমোচ্চ পর্যায়ে তাদের অবস্থান চিহ্নিত করাকে ডিমক শ্রেণীবিন্যাস বলেছেন। 'The Classification and standardisation Movement in the Public Service' নামক প্রবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যুরো অফ পাব্লিক পার্সোনেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর ডিরেক্টর ফ্রেড টেলফোর্ড উল্লেখ করেন যে— শ্রেণীবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন হল,

i) কোনও একটি পদের কাজ ও কর্তব্য চিহ্নিত করা এবং সংগঠনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কাঠামো ও প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ,
ii) উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি পদকে নির্দিষ্ট শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত করা,
iii) প্রতিটি শ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য লিখিত আকারে চিহ্নিত করা,
iv) প্রতিটি শ্রেণীভুক্ত পদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্দেশ করা,
v) প্রতি শ্রেণীর নামকরণ,
vi) পদের শ্রেণী বিন্যাসের আলোকে নির্দিষ্ট নিয়মে পদোন্নতির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করা,
vii) প্রতিটি শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা,
viii) সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটিকে সহজবোধ্য করে তোলা।

পদের শ্রেণীবিন্যাসকে সর্বান্তকরণে গ্রহণে করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ফিলিপাইনস্, তাইওয়ান, ইত্যাদি দেশ। এই সকল দেশে পদকে সংগঠনের একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্তব্য ও দায়িত্ব চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিটি সমমর্যাদার শ্রেণীভুক্ত পদের জন্য একই শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, যোগ্যতা ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। সমশ্রেণীভুক্ত পদগুলিতে নিযুক্ত কর্মী একই বেতন, ভাতা ও পদোন্নতির সুযোগ লাভ করেন।

● পদের শ্রেণী বিন্যাসের কয়েকটি সুফল লক্ষ্য করা যায়—

i) নির্দিষ্ট পদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে কর্মীর স্পষ্ট ধারণা থাকে,

ii) কর্মীর কাছে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা উন্মুক্ত থাকে এবং যোগ্যতা ও প্রতিভা যথাযথ গুরুত্ব পায়,

iii) প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণ করা সহজ হয় ও যথাযথ হয়,

iv) সংগঠনের পরিচালকের পক্ষে দায়িত্ব বন্টন সহজ হয়,

v) অনুভূমিক শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট পদে সংগঠনের বাইরে থেকে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ সহজ হয়,

vi) পদের শ্রেণীবিন্যাস যথাযথ হলে সাংগঠনিক সচলতা বিজ্ঞান সম্মত হয়, বিক্ষিপ্ত নয়।

পদের শ্রেণীবিন্যাসের সাফল্য অবশ্য নির্ভর করে কয়েকটি পূর্ব শর্তের ওপর—

i) কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি সুচিহ্নিত, যা উন্নয়নশীল দেশে কতটা সম্ভব তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকে যেতে পারে,

ii) কার্যধারায় যে সকল পদ সুনির্দিষ্ট থাকে, তার কর্তব্য ও দায়িত্বের সীমা নির্দেশ করা সহজ হয়,

iii) উন্নয়নশীল দেশে ক্রমাগত পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রশাসনকেও তার ভূমিকার পরিবর্তন ঘটাতে হয়। এমতাবস্থায় শ্রেণীবিন্যাস ক্রমাগত পরিবর্তন প্রত্যাশী হয়ে ওঠে, যা জটিলতা সৃষ্টি করে,

iv) পদের শ্রেণীবিন্যাস আধুনিক প্রশাসনেই বিশেষভাবে কার্যকারী, যদিও অনেকে একে অর্থ অপচয়কারী ও কালক্ষেপকারী বলে মনে করে থাকেন।

v) পছন্দমত পদপ্রাপ্তির আকাঙ্খা আমলাদের একাংশের মধ্যে অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা তৈরি করে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন।

শ্রেণীবিভাজনের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অনস্বীকার্য। প্রফেসর হারমান ফাইনার (Herman Finer) পদের শ্রেণীবিভাজনের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, "The least amount of evil in state service is produced by the best classification" কিন্তু শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় পরিষেবার জন্য সেরা শ্রেণীবিভাজনের যে প্রকৃষ্ট উদাহরণ মার্কিন প্রশাসন উপহার দিয়েছে, তার নেতিবাচক দিকটিকেও ফাইনার অস্বীকার করেন নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পদের শ্রেণীবিভাজন করা হয় এবং তারপর পদের উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রত্যাশা করে, যাতে তারা ঐ ধরনের বিশেষ শিক্ষা প্রদান করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পদের প্রকৃতি পরিবর্তন প্রশাসনিক কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করার জন্য একান্ত জরুরী। এই কারণে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকে Organisation and Method (O and M) বিভাগ থাকা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে ভারতে শ্রেণী বিভাজনের এই পদ্ধতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে পদ শ্রেণী বিভাজন প্রযুক্ত হয় নি, যেমন মার্কিন বন কৃত্যক।

৪.৪ স্তর বিন্যাস

ভারত, পাকিস্তান, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, মালয়েশিয়া, লাওস ইত্যাদি রাষ্ট্রে স্তর বিন্যাস পদ্ধতিই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পদের শ্রেণীবিন্যাসের ন্যায় স্তর বিন্যাসে দায়িত্ব কর্তব্যের নিরিখে শ্রেণীবিভাজন হয় না বরং স্তর ও কর্মীর ব্যক্তিগত মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। প্রশাসনিক দিক থেকে স্তর বিন্যাসের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজন অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজবোধ্য। যেহেতু দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মীর মনে অধিক নিশ্চয়তার অনুভূতি হয়, পদোন্নতির সূত্রটিও যথেষ্ট স্পষ্ট থাকে। প্রশাসনিক সচলতা প্রশাসনের গতির সঞ্চার করে, যা স্তর

শ্রেণীবিন্যাসের একটি বিশেষ সুবিধা। কৃত্যকের মধ্যেই বদলির সম্ভাবনা থাকায় প্রশাসন পরিচালনায় সুবিধা হয়। এই শ্রেণীবিন্যাস সাধারণ প্রশাসককে (generalist) বিশেষজ্ঞ প্রশাসকের থেকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং বলা হয় এই শ্রেণীবিন্যাস কর্মীদের সার্বিক প্রতিষ্ঠানিক আনুগত্য সুনিশ্চিত করে, অর্থাৎ কর্মীর দায়বদ্ধ কেবল তার পদের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

স্তরের বিন্যাসের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজনের কয়েকটি অসুবিধাও অনস্বীকার্য। 'equal pay for equal work সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক—এই নীতিটি এখানে অনুসৃত হয় না। প্রত্যেক কর্মী তার স্তরের জন্য নির্দিষ্ট বেতন পেয়ে থাকে, তার দায়িত্ব ও যোগ্যতা বেশি বা কম যাই হোক না কেন। এর ফলে কর্মীর কাজের উৎসাহ হ্রাস পায়। নির্দিষ্ট নিয়মে পদোন্নতি হয় বলে এখানে যোগ্যতা ও দক্ষতা সব সময়ে উপযুক্ত মর্যাদা পায় না। প্রত্যেক স্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় একদিকে যেমন কর্মীর কর্মদক্ষতার যথাযথ মূল্যায়ণ হয় না, অন্য দিকে তেমনি কাজে ফাঁকি দেওয়া বা দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। উল্লেখ্য যে কোনও ব্যবস্থাই সার্বজনীন হতে পারে না, পরিস্থিতি ও পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক চাহিদা ও সংস্কৃতি অনেক সময়ে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

৪.৫ শ্রেণী বিভাজন, প্রেক্ষিত ভারতবর্ষ

ভারতে পদ ও স্তর উভয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। শ্রেণী-I, II, III, IV কর্মীদের স্তর নির্দিষ্ট করে এবং স্তর অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাসম্ভব চিহ্নিত করে। প্রথম দুটি শ্রেণী প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে, তৃতীয় শ্রেণীটি করণিক এবং চতুর্থ শ্রেণী কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত সহায়ক কর্মী যেমন—পিওন, আর্দালী, ড্রাইভার, খালাসী, দারোয়ান ইত্যাদি। ভারতে একই সঙ্গে স্বতন্ত্র কৃত্যক সৃষ্টি করে ভিন্ন মাত্রার পরিষেবা লাভের প্রয়াস করা হয়েছে। এই অনুভূমিক শ্রেণী বিভাজনে একটি কৃত্যক থেকে অন্য কৃত্যকে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সম্পূর্ণ বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে ভারতে প্রশাসনিক সংগঠনের স্বরূপ জানতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি স্বতন্ত্র কৃত্যক আছে—সর্বভারতীয় রাষ্ট্র কৃত্যক (All India Services) এবং কেন্দ্রীয় কৃত্যক (Central Civil Service) । প্রথম শ্রেণীভুক্ত (Class-I) সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকগুলি হল —

1) Indian Administrative Service (IAS)
2) Indian Police Service
3) Indian Foreign Service

এরা কেন্দ্রের দ্বারা নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হলেও রাজ্য প্রশাসনেও এদের কাজ করতে হয়।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় কৃত্যক তথা Central Civil Service এর অধীনে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা থাকেন (Class I and Class-II) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মীরাও এর সহায়ক কর্মী হিসেবে পরিগণিত হয়। এই কৃত্যকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

1) Archaeological Service
2) Central Engineering Service
3) Central Health Service
4) Indian Forest Service
5) Indian Postal Service
6) Indian Economic Service

7) Indian Statistical Service

8) Indian Income Tax Service

9) Central Secretariat Service

10) Railway Medical Service

ইত্যাদি বর্তমানে ৩৪টি প্রথম শ্রেণীর ও ২৫টি দ্বিতীয় শ্রেণীর কেন্দ্রীয় কৃত্যক ভারতে বিদ্যমান। এই সকল কর্মী নিজস্ব মন্ত্রকের অধীনে কর্মরত এবং অর্থমন্ত্রক এদের বেতন কাঠামো ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ন্ত্রণ করে।

৪.৫.১ কেন্দ্রীয় সচিবালায় পরিষেবা

এই কৃত্যক চারটি স্তরে বিন্যস্ত ছিল।

স্তর-I — অধস্তন সচিব - ক্লাশ - I

স্তর-II — বিভাগীয় অধিকর্তা - ক্লাশ - I

স্তর-III — বিভাগীয় অধিকর্তা - ক্লাশ - II (নন্ গেজেটেড)

স্তর- I — সহকারী ক্লাশ - II (নন্ গেজেটেড)

তৃতীয় স্তরটিকে নবনিযুক্তদের জন্য প্রশিক্ষণস্তর হিসেবে গণ্য করা হত। দ্বিতীয় পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিভাগীয় অধিকর্তা স্তর দুটি মিলিত ভাবে ক্লাশ- II শ্রেণীভুক্ত বলে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং উপসচিব ও তদূর্ধ্বদের জন্য নতুন সিলেকসন, গ্রেড চালু করা হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় কৃত্যকের সংগঠনটি নিম্নরূপ

১। সিলেকসন গ্রেড (নির্বাচিত স্তর)	—	যুগ্ম সচিব নির্দেশক উপসচিব
২। স্তর- I	—	অর্ধস্তন সচিব ও সম পদমর্যাদাভুক্ত সচিব।
৩। বিভাগীয় অধিকর্তার স্তর		
৪। সহকারী স্তর।		

সিলেকসন গ্রেডে নিয়োগ পদোন্নতির মাধ্যমে হয়ে থাকে। অধস্তন সচিবের স্তর থেকে অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্নরা যোগ্যতার নিরিখে এই সুযোগ লাভ করেন। বিভাগীয় অধিকর্তা ও সহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগ নীতি উভয়েই অনুসৃত হয়—পদোন্নতির ক্ষেত্রে ACR, বার্ষিক গোপন প্রতিবেদনের ওপর পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

৪.৫.২ আঞ্চলিক কৃত্যক

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোয় রাজ্য কৃত্যক ও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। এখানেই কেন্দ্রের কৃত্যকের ন্যায় I, II, III ও IV চারটি শ্রেণী আছে এবং কেন্দ্রীয় কৃত্যকের মতই তারা তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণভাবে, রাজ্যে যে সকল কৃত্যক থাকে, তা হল—

রাজ্য প্রশাসন কৃত্যক

রাজ্য পুলিশ কৃত্যক

রাজ্য বিচার বিভাগীয় কৃত্যক

রাজ্য বন কৃত্যক
জন স্বাস্থ্য পরিষেবা
সমবায় পরিষেবা
কৃষি পরিষেবা ইত্যাদি।

প্রথম দুটি উল্লিখিত কৃত্যক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এরা IAS এবং IPS এর ভাবমূর্তিতে সংগঠিত। উল্লেখ্য যে, এই কৃত্যকগুলিতে সকল রাজ্যে বেতন পরিকাঠামো এক নয়। প্রথম তিনটি শ্রেণীতে সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে অবশ্য পদোন্নতির ওপরেই জোর দেওয়া হয়। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন।

৪.৬ ক্ষতিপূরণ

কর্মীব্যবস্থাপনার কার্যকারীতা যে মূল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা হল উপযুক্ত বেতন পরিকাঠামো। কর্মী তার দক্ষতা, শ্রম ও সময়ের একটি বৃহৎ অংশ সংগঠনের সাফল্যের স্বার্থে ব্যয় করে। এই কারণে কর্মী উপযুক্ত বেতন ও অন্যান্য সুবিধা প্রত্যাশা করে, যা তার ব্যয়িত দক্ষতা, শ্রম ও সময়ের মূল্য তথা ক্ষতিপূরণ। নির্ধারিত বেতন কাঠামো কর্মীর উৎসাহ বৃদ্ধির সহায়ক। যে কোনও রাষ্ট্রেই বেতন কাঠামো দায়িত্ব ও পদমর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বেতনের পরিমাণের সঙ্গে কর্মীর মর্যাদাও সম্পর্কযুক্ত। প্রশাসনের কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে উপযুক্ত বেতন কাঠামোর অবদান স্পষ্ট। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন লক্ষ্য করেছেন যে ভারতে সংগঠনের অভ্যন্তরে কর্মী সংক্রান্ত নানা সমস্যার অন্যতম কারণ হল অনুপযুক্ত ও অপরিকল্পিত বেতন কাঠামো।

বেতন কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তা হল—

- সমমানের কাজের জন্য সমান বেতন,
- জীবনধারণের সম্ভাব্য খরচ,
- সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থান,
- নিয়োগকর্তার অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা,
- কর্মীর মানসিক তৃপ্তি ও সামাজিক চাহিদা পূরণ,
- আইনগত বাধ্যবাধকতা (যথা ন্যূনতম মজুরী আইন)
- কর্মীর পদের স্তর, মর্যাদা, দায়িত্ব, কর্তব্য, যোগ্যতা ইত্যাদির নিরিখে বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয়। এই নির্ধারণ পদ্ধতিকে অবিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি বলা হয়।
- বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুযায়ী মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা বিবেচনা করে বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয়। চাকরী ক্ষেত্রের পরিবেশ, দায়িত্ব, দক্ষতা হার, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মাত্রা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রকৃত্যক একটি উন্নতিমূলক উপজীবিকা (Career) নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের পর নির্ধারিত যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে কোনও কর্মী যখন তার উপযুক্ত পদে আসীন হয় তখন সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতন ও ভাতা সে যেমন প্রত্যাশা করে তেমনি স্তর বিন্যাসের ক্রমোচ্চ ধাপে পদোন্নতি পাওয়ারও আশা থাকে তার কর্মতৎপরতা, কুশলতা ও দক্ষতা যে হারে ব্যবহৃত হয়, সেই হারেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অনুযায়ী তার বেতন ও পদোন্নতি সুনিশ্চিত হয়।

বেতন কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি নীতি প্রযোজ্য হয় :

প্রথমতঃ পরিপূরক নীতি অনুযায়ী বেসরকারি সংগঠন ও শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত একই শ্রেণীভুক্ত কর্মীদের সঙ্গে সমহারে সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয়। অন্যথায় যোগ্য প্রার্থীরা সরকারি কৃত্যকের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

অপ্রতিযোগী অবস্থান নীতি অনুযায়ী কর্মীদের বেতন ভাতা, অবসর কালীন সুযোগ সুবিধা এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিৎ যাতে তা বেসরকারি ক্ষেত্রের থেকে অধিক লাভজনক হয়। উদাহরনস্বরূপ প্রতিরক্ষা, পুলিশ প্রভৃতি বিভাগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের কাজে ধর্মঘট, কাজবন্ধের প্রবনতা প্রভৃতি নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রথমেই ছুটি, বেতন, ভাতা, অবসরকালীন বিশেষ সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হতে হয়। ন্যাশানাল হুইট্‌লে কাউন্সিল এই মর্মে টমলিন কমিশন কে জানায় যে, রাষ্ট্রকৃত্যক যেহেতু বিশেষভাবে নিযুক্ত উচ্চমানের কর্মীদের নিয়ে গঠিত, অতঃপর বেসরকারি ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের তুলনায় রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আরো উন্নত মানের হওয়া উচিৎ।

টমলিন কমিশন উল্লেখ করে যে রাষ্ট্রের উচিত আদর্শ নিয়োগকর্তা হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করা। যে রাষ্ট্র তার সম্পদ ও করদাতাদের প্রতি তার দায়বদ্ধতার কথা স্মরন রেখে কর্মীদের চাকরীর শর্তাদি ও বেতন নির্ধারন করে তাকে 'আদর্শ নিয়োগকর্তা' বলা যেতে পারে।

অ্যান্ডারসন কমিটি (১৯২৩) অভিমত পোষনকরে যে, দক্ষ কর্মীকে আকর্শিত করার জন্য তার দায়িত্ব, জীবন যাত্রার মান, সামাজিক পদমর্যাদা প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতন, ভাতা প্রভৃতি নির্ধারণ করা উচিৎ। এই সুপারিশের যৌক্তিকতা থাকলেও বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে। যে কোনও কর্মীর দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন করে সেই হারে তার বেতন, ভাতা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়।

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও দেশের জাতীয় আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মীদের বেতন ভাতা নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী উচ্চপর্যায়ের কর্মীদের বেতন মান তুলনামূলক ভাবে কম বলে সমালোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (১৯৫৯) নিকট কেউ কেউ বলেন যে গনতান্ত্রিক সমতার নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন কাঠামো নির্ধারিত হওয়া উচিৎ। কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের কাছে এই সুপারিশেরহ যৌক্তিকতা খুব একটা গ্রহণযোগ্য হয় নি। সমান কাজের জন্য সমপরিমাণ বেতন নীতিও যথেষ্ট জনপ্রিয় বলে বিবেচিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীদের বেতন কাঠামো নির্ধারনের ক্ষেত্রে সমস্ত দেশেই কমবেশি যে নীতিগুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল নিম্নরূপ—

রাষ্ট্রকৃত্যক কর্মীদের বেতন নির্ধারনের ক্ষেত্রে চাকরীর অন্যান্য শর্তাদি যথা—কার্যকালের স্থায়িত্ব, পদোন্নতির সুযোগ, ছুটি, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা প্রভৃতির দিকে নজর দেওয়া হয়। লক্ষ্য রোখা হয় যাতে বেতন হার কোন ও ভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রের তুলনায় কম না হয় বা এমন না হয় যাতে দক্ষ কর্মীর অভাব দেখা দেয়।

ভারতের পঞ্চম বেতন কমিশন কাজের ও পদের মূল্যায়ন, বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা, সমান কাজের জন্য সমপরিমাণ ভাতা প্রভৃতি নীতির পরীক্ষা পূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, এর কোনটিই ভারতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগযোগ্য নয়। দক্ষতা, কাজের পরিবেশ, যোগ্যতা, ক্ষমতা, মর্যাদা ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাসে অবস্থান প্রভৃতির নিরিখে কেন্দ্রীয় স্তরে বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে বলে কমিশন তার রিপোর্টে জানায়।

● পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ

পঞ্চম বেতন কমিশন যে ACP পেশ করেছে তদনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতাকে বেতন কাঠামো নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়েছে।

• National Productivity Council এর পরামর্শ ক্রমে ন্যূনতম বেতন ২,৪৪০ টাকা এবং Indian Institute of Public Administration এর পরামর্শ অনুযায়ী সর্বোচ্চ বেতন ২৬,০০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

• বর্তমানের ৫১টি বেতন স্তর হ্রাস করে ৩৪টি বেতনস্তর নির্ধারণের সুপারিশ কমিশন করেছে।

• 'খালাসী' বা অদক্ষ কর্মী শব্দ দুটি অবলুপ্ত করে 'শ্রমিক' পদের সৃষ্টি করার কথা কমিশন বলেছে এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের বেতন স্তর চারটির পরিবর্তে দুটি পর্যায়ে হ্রাস করা হয়েছে।

• গ্রুপ সি কর্মীদের ক্ষেত্রেও শিক্ষাগত যোগ্যতাকে নির্ধারক ধরা হয়েছে। উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের বেতন কাঠামোর ভিন্নতা দুর করা হয়েছে।

• গ্রুপ বি কর্মীদের জন্য তিন ধরণের বেতন কাঠামো সুপারিশ করা হয়েছে —

i) কেন্দ্রীয় সচিবালয় কৃত্যক, রেল ও সেনা হেডকোয়ার্টার — ৭৫০০-২৩০-১২০০০ টাকা

ii) প্রযুক্তিভিত্তিক কৃত্যক (রেলওয়ে) — ৭৫০০-২৫০-১২০০০ টাকা

iii) দিল্লী, আন্দামান ও নিকোবর রাষ্ট্রকৃত্যক — ৪০০০-২৭৫-১৩৫০০ টাকা

• সর্বভারতীয় কৃত্যকে IAS এর জন্য (সরাষ্ট্র ও বনকৃত্যক সচিব) ২৪০৫০-৬৫০-২৬০০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

• সর্বভারতীয় পুলিশ কৃত্যক — কমিশনার—২২৪০০-৫২৫-২৪৫০ টাকা

ডিরেকটর জেনারেল অফ পুলিশ — ২৬০০০ টাকা স্থায়ী

অতিরিক্ত ডি. জি. পি. — ২২৪০০-৫২৫-২৪৫০০ টাকা।

• সর্বভারতীয় বন কৃত্যক— মুখ্য — ২৪০৫০-৬৫০-২৬০০০ টাকা

অতিরিক্ত — ২২৪০০-৫২৫-২৪৫০০ টাকা

বন সংরক্ষক — ১৬৪০০-৪৫০-২০০০০ টাকা

অতিরিক্ত ডি. জি. বন বিভাগ — ২৪০৫০-৬৫০-২৬০০০ টাকা

• কেন্দ্রীয় কৃত্যকে বিশেষ সচিব ও সমমর্যাদা সম্পন্ন সচিব — ২৬,০০০ টাকা স্থায়ী হিসেবে বেতন পাবেন।

• পঞ্চম বেতন কমিশন বেতন পরিকাঠামো নির্ধারণে প্রতিটি স্তর ও কৃত্যকের দায়িত্ব ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেছেন। ওপরে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হল তা ছাড়াও ইঞ্জিনীয়ারিং কৃত্যক, চিকিৎসা কর্মী, ওয়ার্কশপ কর্মী ইত্যাদিদের সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির উপযোগী শর্তাদির উল্লেখ করেছেন।

• প্রতিটি স্তরে ক্ষেত্র বিশেষে ডি. এ. (Dearness Allowance), CCA (City Compensatory Allowance), SCA (Special Compensatory Allowance), Project Allowance, Training Allowance, Night Duty Allowance, প্রমোদ ভাতা, উত্তর-পূর্বে এবং সিকিমে চাকরীরত কর্মীদের বিশেষ ভাতা, যাতায়াত ভাতা, LTC (Leave Trave Allowance) ইত্যাদি সুবিধাদানের কথা উল্লেখ করেছে।

• পঞ্চম বেতন কমিশন আরো যে সকল সুবিধা দানের কথা উল্লেখ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—চিকিৎসার সুবিধা (CGHS) সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনসন, পরিবারের পেনসন, কর্মরত অবস্থায় কর্মীর মৃত্যু হলে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি।

• মহিলা কর্মীদের মাতৃত্ব ছুটি ৯০ থেকে বাড়িয়ে ১৩৫ দিন করা হয়েছে।

• পিতৃত্বের জন্য ১৫ দিন ছুটি ধার্য্য হয়েছে।

• মহিলাদের প্রথম নিয়োগের বয়সসীমা ৩৫ বছর করা হয়েছে।

৪.৭ পদোন্নতি ও বদলি

পদোন্নতিকে কর্মীর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ধরা যেতে পারে। পদোন্নতি কর্মীর অবস্থান ও মর্যাদায় পরিবর্তন সূচিত করে, এই পদোন্নতি কর্মীর কাজের পুরস্কার স্বরূপ। সাংগঠনিক স্তর বিন্যাসের সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠার সূত্রে কর্মীর বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও বৃদ্ধি পায়। বলা হয়ে থাকে যথাযথ পদোন্নতি কর্মীর কাজের উৎসাহ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শুধু তাই নয়, পদোন্নতির প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা কর্মীকে শৃংখলাপরায়ণ ও কর্মতৎপর হতে বাধ্য ও উদ্বুদ্ধ করে। জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে পদোন্নতির অর্থনৈতিক আকর্ষণের থেকে মানসিক তৃপ্তি অনেক বেশি গুরুত্বের দাবি করতে পারে। ফুলটন কমিটি তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে—"The right promotion at the right time is an essential part of the process of developing to the full talents of men and women in service". কর্মরত মহিলা ও পুরুষদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য পদোন্নতির গুরুত্বকে ফুলটন কমিটি স্বীকার করেছে। যথাযথ পদোন্নতির ব্যবস্থা কর্মীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সহায়ক এবং সার্বিকভাবে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক। তবে উল্লেখ্য যে পদোন্নতির উপযোগিতা বৃদ্ধি করতে হলে সমতা ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপোষণ ইত্যাদি সার্বিকভাবে পদোন্নতির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। এর ফলে কর্মীর নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটে ও সংগঠনে অনিশ্চয়তা ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়।

এল. ডি. হোয়াইট (L. D. White) পদোন্নতি বলতে বুঝিয়েছেন যে—an appointment from a given position to a position of higher grade, involving a change of duties to a more difficult type of work and greater respensibility accompanied by change of title and usually an increase in pay. অতঃপর পদোন্নতি কর্মীর অবস্থান, বেতন, মর্যদা ও কাজের দায়িত্ব বৃদ্ধি করে। ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যাসের সিঁড়ি ওপরে ওঠার উৎসাহে কর্মী অধিক দক্ষতা ও সামর্থের প্রদর্শন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। পদোন্নতির সুযোগ উচ্চাকাঙ্খী, প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করবে বলে মনে করা হয়। পদোন্নতির ব্যবস্থা ব্যক্তিগতভাবে কর্মীকে যেমন প্রলুব্ধ করে, তেমনি প্রশাসনের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। কিন্তু পদোন্নতির ক্ষেত্রে সমতা, নীতি নিষ্ঠতা প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি প্রভৃতি হিতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

ডব্লিউ.এফ.উইলাওবি পদোন্নতি ব্যবস্থার অনুকূলে কয়েকটি শর্ত নির্দেশ করেছেন—

১) সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে পদোন্নতি সুনিশ্চিত করা উচিৎ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিৎ।

২) প্রতিটি অবস্থানকে শ্রেণী, স্তর ও পরিষেবা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাজন করা উচিৎ।

৩) নীতি নির্ধারনকারী অবস্থানগুলি ছাড়া অন্যান্যগুলিকে এই শ্রেণী বিভাজনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

৪) উচ্চপদের জন্য সংগঠনের অভ্যন্তর থেকেই পদোন্নতির মাধ্যমে যথাসম্ভব নিয়োগ করা উচিৎ।

৫) পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা উচিৎ।

৬) পদোন্নতির জন্য নির্বাচিত কর্মীদের যোগ্যতার মূল্যায়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিৎ।

উইলাওবি পদোন্নতির যে শর্তাদি উল্লেখ করেছেন, তার প্রথম ও দ্বিতীয় ও পঞ্চম শর্ত যোগ্যতার স্বীকৃতি দায়ক, তৃতীয় ও চতুর্থ শর্ত অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মীকে পদোন্নতির সম্ভাবনার আওতায় আনা হয়েছে। ষষ্ঠ শর্ত অনুযায়ী নিরপেক্ষ উপযুক্ত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পদোন্নতির প্রধান বৈশিষ্ট্য :

I) পদোন্নতি পরিচালকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এবং প্রত্যেক কর্মী পদোন্নতির ক্ষেত্রে পরিচালকের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সার্ভিস রুল অনুযায়ী পদোন্নতির বিষয়টি পরিচালিত হলেও কোনও কর্মী পদোন্নতিকে দাবী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না, পদোন্নতির বিষয়টি কর্মী কর্তৃক চাকরীর শর্তাদি পূরণ ও পরিচালকের ধারণার ওপরেও অনেকাংশে নির্ভরশীল। তবে পরিচালক যদি সংগঠনে সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখতে চান তাহলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা, দক্ষতা, কার্যকারিতা, শৃংখলা পরায়নতা ইত্যাদির ওপরেই জোর দেবেন। কর্মীর উপযোগিতাই এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হওয়া উচিৎ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা অন্য কোনও সংগঠন বহির্ভুত বিষয় নয়।

II) পদোন্নতি কর্মীর অভিপ্রায় দ্বারাও পরিচালিত হতে পারে। কোনও কর্মী অধিক দায়িত্ব নিতে অপারগ বলে নিজেকে মনে করলে উচ্চতর পদে নাও যেতে চাইতে পারেন। অনেক সময়ে বদলির সম্ভাবনা আছে, এই আশঙ্কায় কর্মী পদোন্নতি নিতে অস্বীকার করেন, তবে এক্ষেত্রে পরিচালক তাকে বাধ্য করতে পারেন।

III) পদোন্নতি কর্মীর জন্য চাকরীর নতুন শর্তাদি নির্ধারণ করে। আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী এই শর্তাদি নির্ধারিত হয়। সুনির্দিষ্ট নীতি ও আচরণবিধি যেখানে আইনগতভাবে অনুপস্থিত, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই বিধি নির্ধারণ করতে পারলেও তার একটা পদ্ধতিগত বাধ্যবাধকতা আছে। এই শর্তাদি কোনওভাবেই কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হয় না। কর্মীর অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখেই এই শর্তাদি নির্ধারিত হয়।

iv) পদোন্নতি কর্মীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং কর্মী যোগ্যতা দক্ষতা ও শৃংখলাপরায়ণতার নিরিখে যদি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, সেক্ষেত্রে কর্মীর পদোন্নতিতে অন্তরায় সৃষ্টি করা যায় না। তবে যোগ্যতম প্রার্থীকে পদোন্নতির জন্য মনোনীত করার অধিকার কর্তৃপক্ষ, পরিচালক সমিতি অথবা নিয়োগকর্তার থেকে যায়। অস্বীকার করা যায় না যে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে।

v) পদোন্নতির আদেশপত্র একমাত্র নিয়োগকর্তাই দিতে পারেন। পদোন্নতির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ, বিভাগীয় প্রধান বা কোনও বিশেষ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু আদেশনামা অবশ্যই তার দ্বারা সাক্ষরিত হবে।

পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মীর ব্যক্তিগত শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, পেশাগত প্রশিক্ষন, শারীরিক ক্ষমতা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিভাগের অভ্যন্তরেই পদোন্নতির বিষয়টিকে সীমিত রাখা হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে বিভাগের বাইরে থেকেও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পদোন্নতিকে উৎসাহিত করা হয়।

প্রধানত পদোন্নতির ক্ষেত্রে দুটি নীতি অনুসরণ করা হয়।

উচ্চপদাধিষ্ঠান (Seniority) নীতি অনুযায়ী স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমোচ্চস্তরের ওপরের ধাপে কর্মীকে উত্তীর্ন করা হয়। এই নীতি অনুসরনের ফলে স্বজনপোষন, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি এড়ানো যায়।

তবে এই নীতি অনুসরন করলে যোগ্যতার মাপকাঠিতে ঘাটতি দেখা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন লোককে উচ্চপদে উত্তীর্ন করলে কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। উপরন্তু যথানিয়মে পদোন্নতি হবে এই প্রত্যাশা কর্মীদের কর্ম শৈথিল্য সৃষ্টি করতে পারে এবং অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীদের নিরুৎসাহ করতে পারে। সুতরাং নিম্নস্তরভুক্ত পদগুলির জন্য এই নীতি অনুসরন সুবিধাজনক হলেও উচ্চপদের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত নয়।

যোগ্যতা পরিমাপক নীতি অনুযায়ী যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি সুনিশ্চিত করা হয়। সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির বিচারে যোগ্যতম ব্যক্তিকে পদোন্নতি দিতে প্রশাসনের কর্মকুশলতা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু কর্মীদের উৎসাহ বৃদ্ধিতে এই নীতি যথেষ্ঠ কার্যকর হিসাবে বিবেচিত হয়।

যোগ্যতার পরিমাপক হিসাবে যে পদ্ধতির ওপর সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল সংগঠন প্রধানের ব্যক্তিগত অভিমত। কর্মীদের প্রশাসনিক ও ব্যাক্তিগত গুনাগুন ও দক্ষতা প্রধান প্রতিনিয়ত অনুভব করেন ও সেই অর্থে কোনও কর্মীর যোগ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক হলেন তিনি। এই ব্যবস্থার ফলে প্রধানের পক্ষে সংগঠনে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখা ও শৃংখলা রক্ষা করা সহজসাধ্য হয়।

কিন্তু এই ব্যবস্থার কতকগুলি ত্রুটি লক্ষ করা যায় :

প্রথমত, বিভাগের আয়তন বেশি হলে প্রধানের পক্ষে সমস্ত কর্মীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিভাগীয় প্রধানের ব্যাক্তিগত চাপ ও পক্ষপাতিত্ব কর্মীদের একাংশের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করতে পারে অথবা একাংশ প্রধানকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্যায়ের আশ্রয় নিতে পারে। ব্যাক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবনতা প্রধানের মধ্যে থাকলে কর্মীরা কাজে দক্ষতা দেখানোর পরিবর্তে প্রধানকে খুশি করার কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তৃতীয়ত, সংগঠনে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব শুরু হতে পারে।

এই ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দুর করার জন্য কতকগুলি বন্দোবস্ত করা যেতে পারে : শ্রমিক, টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার ইত্যাদিদের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা যত সহজে পরিমাপ করা যায়, উচ্চমানের পরিষেবা প্রদানকারী অধিকর্তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সহজ নয়। সম্পূর্ণ বিষয়টিকে কর্মীর সময়ানুবর্তীতা, পরিশ্রম, উদ্যম, নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদির আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এই পদ্ধতির সমালোচনা করে বলা হয় যে, পদ্ধতিগত যান্ত্রিকতার জন্য মানব আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি ত্রুটিমুক্ত নয়।

১) পদোন্নতি কোনও একজন প্রধানের হাতে কেন্দ্রীভূত না রেখে, কয়েকজন উচ্চপদাধিকারী অধিকর্তাদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করে তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রকৃত্যকেরে ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

২) অনেকে সুপারিশ করেন যে প্রধানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করার অধিকার কর্মীর থাকা উচিৎ। এই আবেদন বিবেচনা ও কর্মীর যোগ্যতার পুর্নমূল্যায়ন করার দায়িত্ব বিভাগের বাইরের কোনও সংস্থার ওপর ন্যস্ত হওয়া উচিৎ।

৩) পদোন্নতির জন্য নির্ধারিত ফর্ম থাকলে কর্তপক্ষ কর্মীর আচরনবিধি, বিভাগের প্রতি আনুগত্য, কর্মনিষ্ঠা, উদ্দম, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক'মূল্যায়ন করতে পারেন। প্রতিটি মতামতের যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষন থাকলে নিরপেক্ষতার সঙ্গে পদোন্নতি বিবেচনার সুযোগ থাকবে।

যোগ্যতা পরিমাপক হিসাবে পরীক্ষা ব্যবস্থাও যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। এর ফলে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

দক্ষতার হার নির্ধারন পদ্ধতি মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কর্মী সার্ভিস রেকর্ড দেখা হয়। Efficiency Rating বা দক্ষতার হার নির্ধারনের জন্য কর্মীর উৎপাদনশীলতা, ব্যক্তিগত গুনাগুন, জ্ঞান, উদ্দম, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং ধারাবাহিক অবদানের ওপর জোর দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বের অবদান।

ভারতবর্ষে 'গোপন প্রতিবেদন' (Confidential report) কর্মীর পদোন্নতির প্রথম মাপকাঠি। উচ্চপদাধিকারীদের জন্য এর পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সাহায্য নেওয়া হয়। উচ্চ পদাধিষ্ঠান নীতি ও যোগ্যতা

পরিমাপক নীতি উভয়েই ভারতবর্ষে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। উচ্চ পদের ক্ষেত্রে যোগ্যতার ওপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মধ্যবর্তী পর্যায়ে দুটি নীতিই কার্যকর হতে পারে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ক্ষেত্রে উচ্চপদাধিষ্ঠান নীতিই সাধারনভাবে কার্যকরী হয়।

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই উচ্চপদাধিষ্ঠান নীতি ও যোগ্যতা পরিমাপক নীতি উভয়ই পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেনডেলটন আইন ও ব্রিটেন ফুলটন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষে যোগ্যতা পরিমাপক নীতিই অধিক গুরুত্ব পায়।

৪.৬ সারাংশ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ বিবর্তিত হয়ে গড়ে ওঠে জনকল্যানকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, সাম্রাজ্যবাদ পরিবর্তিত হয়ে আসে নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদ। একবিংশ শতাব্দীতে নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদ নতুন নামে, নবকলেবরে বিশ্বায়ন নাম নিয়ে তথাকথিত উদারনৈতিক অর্থনীতির জয়যাত্রা ঘোষণা করে। জনকল্যানকামী রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক দায়িত্বভার আপাতদৃষ্টিতে লাঘব হয়, কারন রাষ্ট্র আর উৎপাদক নয়। কিন্তু উন্নত রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ... অর্থে বৃদ্ধি পায় যে আন্তর্জাতিক সমাজে রাষ্ট্রের প্রভাব বাড়াতে হবে, বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিগুলি যাতে উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, যদি WTC এর দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার নামে নিজের হৃত সম্মান যে কোনো মূল্যে পুনরুদ্ধার করতে হবে। উন্নতিশীল দেশে সন্ত্রাসবাদ, জাতি-দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সমস্যাগুলি অর্থনৈতিকস্থিতাবস্থা, মন্দা, দারিদ্র, বেকারত্বের হাত ধরে আসে, সেখানে রাষ্ট্রকে একদিকে এইসব অসুখের প্রতিরোধে উদ্দোগী হতে হবে, কূটনৈতিক দিক থেকে প্রথম বিশ্বের সমর্থন আদায়ের জন্য মরীয়া হতে হবে, অন্যদিকে সাধারন মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষের হাত থেকে শাসক শ্রেণীকে রক্ষা করার জন্য নানান মুখোসের আয়োজন করতে হবে, যেমন নিজের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য পাকিস্তান

● কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পদোন্নতি—প্রেক্ষিত ভারতবর্ষ :

উর্ধ্বতন ও মধ্যবর্তী পদগুলিতে পদোন্নতির দায়িত্বে থাকেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য কৃত্যকদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় এবং রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন যথাক্রমে এই পদোন্নতির সুপারিশ করেন। কর্মীর কাজ সংক্রান্ত গোপন প্রতিবেদনে 'outstanding', 'above average', 'below average' and 'unsatisfactory' এইভাবে মূল্যায়ণ করা থাকে। প্রবীনতা অনুযায়ী পদোন্নতির জন্য প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং এরপর যোগ্যতা বিচার করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গোপন প্রতিবেদন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। কর্মীর কাজের মূল্যায়ণের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং প্রকৃত ক্ষমতা অধিকতর মৌলিকতার সঙ্গে পরিমাপ করা আবশ্যক।

ভারতে পদোন্নতি ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হল যোগ্যতার তুলনায় প্রবীণতা অধিক গুরুত্ব পায়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও পেশাদারিত্বকে পরিমাপ করা উচিৎ। কর্মীর বিকাশ ও কর্মীর উপযোগিতা পদোন্নতির সময়ে বিচার্য হওয়া উচিৎ।

এল.ডি. হোয়াইট মনে করেছেন যে সময়োচিত পদোন্নতি প্রশাসনের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ভারতে কিন্তু এই পদোন্নতি ব্যবস্থায় যে অহেতুক শ্লথ গতি লক্ষ্য করা যায়, তা সংগঠনে কর্ম তৎপরতাকে বিরূপভাব প্রভাবিত করতে পারে। যে প্রশাসনিক পদ্ধতিগত জটিলতা ও অনমনীয়তা এর জন্য দায়ী তার পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। কর্মী সংগঠনের সঙ্গে বসে একযোগে এ বিষয়ে সমাধান সূত্র খুঁজতে হবে।

The Annual Confidential Report (ACR) কর্মীদের পদোন্নতির জন্যেও বিবেচ্য হবে। এই ACR একটি দশ পয়েন্ট স্কেলের এর মূল্যায়ণের ভিত্তিতে তৈরি হবে। ন্যূনতম নম্বর না পেলে তার পদোন্নতির দাবি গ্রাহ্য হবে না।

গ্রুপ এ অধিকর্তাদের জন্য প্রতি ৫ বছর অন্তর মূল্যায়নের ব্যবস্তা থাকা দরকার।

পদোন্নতি ব্যবস্থায় অনড়তা দূর করার জন্য Assured Career Progression Scheme (ACP) এর মাধ্যমে চাকরীতে উন্নতি করার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদানের কথা বলা হয়। গ্রুপ বি, সি, ডি কর্মীদের জন্য দুটি নিশ্চিত উন্নতির সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রুপ বি কর্মীদের ক্ষেত্রে ৮ এবং ১৬ বছরের চাকরীর পর, গ্রুপ সি-র ক্ষেত্রে ১০ এবং ২০ বছর চাকরীর পর গ্রুপ ডি এর জন্য ১২ এবং ২৪ বছর চাকরীর পর এই সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। গ্রুপ-এ কর্মীদের জন্য যথাক্রমে ৪, ৯ এবং ১৩ বছরের চাকরীর পর এরূপ তিনটি অগ্রগতির সম্ভাবনা উন্মুক্ত। উল্লেখ্য যে, উচ্চ বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুবিধা সুনিশ্চিত হলেও, এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্যকরীভাবে উচ্চপদে উত্তোরণের কথা বলা হয় নি।

পঞ্চম বেতন কমিশন নমনীয় পরিপূরক প্রকল্প (Flexible Complementary Scheme) প্রচলনের সুপারিশ করেছে। গ্রুপ-এ গবেষণারত বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে কার্যকরী পদোন্নতির যে সুযোগ পূর্বে উন্মুক্ত ছিল, তা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিভাগগুলির জন্য প্রচলিত ছিল এবং এই ব্যবস্থা পরিচালিত হত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ দ্বারা। বর্তমান সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত অধিকর্তা, তথা, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞানী বা কম্পিউটার বিজ্ঞানী ইত্যাদিরা এই সুযোগ পেতে পারেন। পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই প্রকল্পের অধীন শ্রেণীগুলিকে সুচিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে অস্পষ্টতার অজুহাতে অন্য কেউ এই সুযোগ নিতে না পারে। উল্লেখ্য যে, বিশেষজ্ঞদের কমিশন বিশেষ মর্যাদা প্রদান করার চেষ্টা করেছে।

বদলি ও পদোন্নতি একই সঙ্গে আসতে পারে। সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ভারতের যে কোনও প্রান্তে এবং রাজ্য সরকারি কর্মীদের রাজ্যের যে কোনও অংশে বদলি করা যেতে পারে। প্রথা অনুযায়ী কর্মীর মতকে উপেক্ষা করা না হলেও এ বিষয়ে বিভাগীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। পদোন্নতি যে বদলির সঙ্গে একযোগে কার্যকরী হবে তার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। অনেক সময় দুর্নীতির সম্ভাবনা রোধ করতে হলেও বদলি কার্যকর করতে হয়। পঞ্চম বেতন কমিশন সুপারিশ করেছে যে কেন্দ্র ও রাজ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকৃত্যক পরিষদ Civil Service Board (CSB), বদলির সুপারিশ করবে। প্রত্যেক পদের জন্য বদলির ন্যূনতম কার্যকাল সুনিশ্চিত থাকবে। বিশেষ কারণ ছাড়া এর পূর্বে বদলি করা যাবে না। বিশেষ কারণের ক্ষেত্রেও CSB কে তা জানাতে হবে। কোনও কর্মী যদি তার পছন্দমত বদলি ও পদপ্রাপ্তির জন্য চাপ সৃষ্টি করে, সে ক্ষেত্রে বিভাগীয় স্তরে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪.৮ সারাংশ

সুষ্ঠ কর্মীব্যবস্থাপনার লক্ষ্যগুলি যদি লিপিবদ্ধ করা হয়, তা হলে প্রধান যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে তা হল মানব সম্পদ পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার। সংগঠনের উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বস্তু সম্পদ ও মানব সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে। এই দুই এর মধ্যে মেলবন্ধন দৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন দায়বদ্ধ, দক্ষ, উৎসাহী ও সৃজনশীল কর্মীর। সংগঠনের স্বার্থে কর্মী যেমন তার দক্ষতা ও ক্ষমতা উজার করে দেবে, তেমনি সংগঠন কর্মীর জন্য একটি সুনিশ্চিত জীবনের আশ্বাস বহন করে আনবে। কর্মীর নিরাপত্তা ও মানসিক তৃপ্তি তার কর্মক্ষমতার

বৃদ্ধি করার এবং স্বাভাবিক ভাবেই সংগঠনের সঠিক বিকাশের হার বৃদ্ধি পাবে। রাষ্ট্রব্যাপী সংগঠনের বৃহৎ আকার ও জটিল কর্মপদ্ধতি আরো বেশি সুষ্ঠ ও সুপরিকল্পিত পরিকাঠামোর প্রত্যাশা করে। কর্মী ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি স্তর ও শ্রেণী বিন্যাস যদি স্পষ্ট থাকে, প্রত্যেক পদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও গুরুত্ব যদি সুচিহ্নিত থাকে এবং পদ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ও পদোন্নতির সম্ভাবনা যদি উল্লিখিত থাকে, তাহলে কর্মীর কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যেতে পারে। বর্তমান এককটিতে বৃত্তি হিসেবে রাষ্ট্রকৃত্যকের সম্ভাবনা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিষয়াদিকে এই আলোকেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪.৯ অনুশীলনী

বড় প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১। পদের শ্রেণীবিভাজনের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ৪.৩

২। পদের শ্রেণীবিন্যাসের সাফল্যের বিষয়ে একটি টীকা লিখুন।
উত্তর সংকেত : ৪.৩.১

৩। পদের শ্রেণীবিন্যাস ও স্তরের বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
উত্তর সংকেত : ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৪.৪ (নির্বাচিত অংশ সাজিয়ে লিখতে হবে)।

৪। ভারতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে কিভাবে শ্রেণীবিন্যাস হয়, উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ৪.৫, ৪.৫.১.

৫। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ৪.৬ শেষ অনুচ্ছেদ, ৪.৬.১

৬। পদোন্নতি গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করুন।
উত্তর সংকেত : ৪.৭

৭। পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনুসরনীয় যোগ্যতা পরিমাপক নীতিটি সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।
উত্তর সংকেত : ৪.৭

৮। পদোন্নতির বিষয়ে পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ৪.৭

৯। পদোন্নতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ৪.৭

১০। বেতন কাঠামো নির্ধারণের জন্য বিবেচ্য মূল বিষয়গুলি কি কি?
উত্তর সংকেত : ৪.৬

১১। ভারতে পদোন্নতির সম্ভাবনা ও সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোকপাত করুন।
উত্তর সংকেত : ৪.৫, ৪.৫.১, ৪.৫.২ ও ৪.৭.১ (নির্বাচিত অংশে)

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে শ্রেণীবিভাজন আইন প্রনীত হয় তা উল্লেখ করুন।
উত্তর সংকেত : ৪.২

২। ভারতে পদোন্নতি ব্যবস্থার মুখ্য ত্রুটি কি?

উত্তর সংকেত : ৪.৭

৩। পদের শ্রেণীবিন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করুন।

উত্তর সংকেত : ৪.৩ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ও প্রথম অনুচ্ছেদের শেষাংশ

৪। টেলফোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী উল্লেখ করুন।

উত্তর সংকেত : ৪.৩

৫। উইলাওবি পদোন্নতির যে শর্তগুলি চিহ্নিত করেছেন তা উল্লেখ করুন।

উত্তর সংকেত : ৪.৭

৬। সরকারি কর্মীদের বদলির সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা দিন।

উত্তর সংকেত : ৪.৭

৭। কেন্দ্রীয় সচিবালয় পরিষেবার গঠন উল্লেখ করুন।

উত্তর সংকেত : ৪.৫.১

দু-একটি বাক্যে উত্তর দিন

১। রাষ্ট্রকৃত্যকের পরিবর্তিত ভূমিকা সম্বন্ধে পঞ্চম বেতন কমিশনের মন্তব্যটি লিখুন।

উত্তর সংকেত : ৪.১

২। প্রশাসনিক সাফল্যের প্রাথমিক ভিত্তি কি?

উত্তর সংকেত : ৪.১

৩। পদ শ্রেণীবিভাজনের মূল গুরুত্বটি উল্লেখ করুন।

উত্তর সংকেত : ৪.২

৪। ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পদ শ্রেণীবিভাজন সংক্রান্ত যে আইন প্রণীত হয় তাতে কি কি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়?

উত্তর সংকেত : ৪.২

৫। পেশা বা বৃত্তি হিসেবে রাষ্ট্রকৃত্যকের বিকাশ কি ইঙ্গিত বহন করে?

উত্তর সংকেত : ৪.৩ প্রথম অনুচ্ছেদ শেষাংশে।

৬। জনপ্রশাসনের সাধারণ পরিভাষায় শ্রেণীবিন্যাস বলতে কী বোঝায়?

উত্তর সংকেত : ৪.৩ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

৭। কোন কোন দেশে পদের শ্রেণীবিভাজনকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছে এবং কিভাবে?

উত্তর সংকেত : ৪.৩ তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৮। ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে কিভাবে শ্রেণীবিভাজন হয়ে থাকে?

উত্তর সংকেত : ৪.৪

৯। স্তর শ্রেণীবিন্যাসের বিশেষ সুবিধা কী?

উত্তর সংকেত : ৪.৪

১০। ভারতে শ্রেণীবিভাজনের মূল বক্তব্যটি উল্লেখ করুন।

উত্তর সংকেত : ৪.৫

১১। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কোনগুলি?

উত্তর সংকেত : ৪.৫

১২। কেন্দ্রীয় কৃত্যক বলতে কি বোঝায়?

উত্তর সংকেত : ৪.৫

১৩। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে পঞ্চম বেতন কমিশন মহিলাদের জন্যে যে দুটি বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছে তা উল্লেখ করুন।

উত্তর সংকেত : ৪.৬.১

১৪। পদোন্নতির মূল উপযোগিতা কী?

উত্তর সংকেত : ৪.৭

১৫। গোপন প্রতিবেদনে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে?

উত্তর সংকেত : ৪.৭.১

১৬। গোপন প্রতিবেদন ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন প্রয়োজন?

উত্তর সংকেত : ৪.৭.১

১৭। ভারতে কিভাবে পদোন্নতি হয়?

উত্তর সংকেত : ৪.৭

১৮। অ্যাণ্ডারসন কমিটির (১৯২৩) সুপারিশ প্রয়োগে অসুবিধা কি?

উত্তর সংকেত : ৪.৬

১৯। ন্যাশানাল হুইটলে কাউন্সিলের সুপারিশ কি?

উত্তর সংকেত : ৪.৬

২০। টমলিন কমিশন কাকে 'আদর্শ নিয়োগকর্তা' বলেছেন?

উত্তর সংকেত : ৪.৬

২১। পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রধান যে নীতিদুটি অনুসৃত হয়, তা উল্লেখ করুন।

উত্তর সংকেত : ৪.৭

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. Avasthi & Maheswari, *Public Administration*, Agra, Lakshmi Narain Agarwal, 1985.
2. Mohit Bhattacharya, *Public Administration*, Calcutta, World Press, 2000.
3. O. P. Dwivedi and R. B. Jain, *India's Administrative State*, New Delhi, Gitanjali Publishing House, 1985
4. Maheswasri, *Indian Administration*, New Delhi, Orient Longman, 1995.
5. F. Nigro, *Modern Public Administration*, New Yrok, Harper & Row, 1970.

ই. পি. এ.-৫

জনপ্রশাসনের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ১৯

একক ১ ☐ কর্মস্পৃহা—সংগঠনের প্রেক্ষিতে এর তাৎপর্য

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ সংজ্ঞা

১.৩ কর্মস্পৃহার তাৎপর্য

১.৪ কর্মস্পৃহা পরিমাপের উপায়সমূহ

১.৫ কর্মস্পৃহার নির্ধারক

১.৬ সারাংশ

১.৭ অনুশীলনী

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বোঝা সম্ভব হবে—

● কর্মস্পৃহার অর্থ কি

● কর্মস্পৃহা সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার এই অংশে আমরা বিভিন্ন প্রশাসনিক তাত্ত্বিকদের মতামত এখানে আলোচনা কোরবো না, কারণ অন্যান্য এককগুলি এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে, কোন্ এককে সেটা উল্লেখ করা দরকার।—সম্পাদক। যেমন—Paper I, Module 4.

● সংগঠনের প্রেক্ষিতে কর্মস্পৃহার তাৎপর্য

● সংগঠনের কর্মীবৃন্দের মধ্যে কর্মস্পৃহা উন্নত করার উপায় সমূহ

● কর্মীদের কর্মস্পৃহা পরিমাপের উপায়

● কর্মস্পৃহার বিভিন্ন নির্ধারক সমূহ

১.১ প্রস্তাবনা

সরকারি সংগঠনে কর্মীদের মধ্যে কর্মসংস্কৃতির অভাব আছে—এই কথাটি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কর্মীরা ঠিকসময়ে অফিসে আসেন না, থাকেন না, কাজ শেষ করেন না এবং জনগণের সমস্যার সমাধানে ব্রতী হননা—এই

রকম অভিযোগ শুনতে আমরা অভ্যস্ত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আলোচনা করে সংগঠনের সার্থকতার অন্যতম শর্ত উচ্চ কর্মস্পৃহা সম্পন্ন কর্মীবৃন্দ। কর্মীরাই সংগঠনের প্রাণ, জনপ্রশাসনের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য অবশ্যই দরকার কর্মীদের মধ্যে কর্মস্পৃহার সঞ্চার। মানুষকে কাজে প্রণোদিত করার জন্য দরকার এই কর্মস্পৃহার। কর্মীদের কর্মস্পৃহার বিষয়টি বিভিন্ন ধরনের আভ্যন্তরিন ও বাহ্যিক শর্তের উপর নির্ভরশীল। আভ্যন্তরিন শর্তের মধ্যে পড়ে সংগঠনের কাঠামো, উদ্দেশ্য, কার্যপ্রক্রিয়া, কাজের উপযোগিতা এবং গুণমান ও পরিমাণগত মান। এই বিষয়গুলিকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুললে কর্মীদের কর্মস্পৃহা জাগানো সহজতর হয়। অন্যদিকে বাহ্যিক শর্ত বলতে বোঝায় সামগ্রিক সামাজিক পরিস্থিতি অর্থাৎ যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সংগঠনটি বিরাজ করছে।

১.২ কর্মস্পৃহার সংজ্ঞা (Definition of Morale)

এর আগেই বলা হয়েছে, কোনো সংগঠনের উন্নয়ন ও লক্ষ্যপূরণের অন্যতম হাতিয়ার উচ্চ কর্মস্পৃহা সম্পন্ন কর্মীবৃন্দ। কর্মস্পৃহা বলতে খুব সাধারণভাবে কাজ করবার ইচ্ছাকে বা তাগিদকেই বোঝায়। কাজের পরিবেশ এবং শর্তাবলী নিঃসন্দেহে সংগঠনের কর্মীবৃন্দের কর্মস্পৃহা নির্ধারনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যদি ব্যক্তির মানসিক ও বস্তুগত চাহিদাসমূহ সংগঠনের কর্মী হিসেবে কাজ করে পূরণ করা সম্ভব হয় তবে সেই কর্মীর কর্মস্পৃহা উচ্চ হয়, পক্ষান্তরে এর বিপরীত পরিস্থিতি কর্মস্পৃহা হ্রাসের কারণ হয়। কর্মস্পৃহা বিষয়টির সঙ্গে কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি এবং উদ্দীপনার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজের ক্ষেত্রে উদ্দীপনার সঞ্চার করা গেলে এবং কর্মীদের মনোবল বাড়ানো সম্ভব হলে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কর্মস্পৃহা বা কাজ করার ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়।

কর্মস্পৃহার সংজ্ঞা ও অর্থ নির্ধারনের ক্ষেত্রে প্রধানত তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। এগুলি হল ১। সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি, ২। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, ৩। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি।

১। সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মনে করা হয় জীবনধারণের কতকগুলি প্রাথমিক শর্ত যথাযথভাবে পূর্ণ করা সম্ভব হলে কর্মস্পৃহা খুব সহজেই সংগঠনে বাড়ানো যায়। Robert Mr. Guion র মতে সংগঠনে কর্মীদের চাহিদা যে পরিমাণে পূর্ণ করা হয় এবং কর্মীরা তাদের চাহিদাপূরণের মাধ্যম হিসেবে সংগঠনকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে তার মাধ্যমেই কর্মস্পৃহার বিষয়টি উপলব্ধি করা সম্ভব।

২। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরন করে বলা যায় শুধুমাত্র বস্তুগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করা যায় না। কর্মীদের মানসিক চাহিদাপূরণ সংগঠনে কর্মস্পৃহা গড়ে তোলার অন্যতম পূর্বশর্ত। এই মতানুসারে মনে করা হয় কাজ করবার আগ্রহ ও প্রস্তুতিকেই কর্মস্পৃহা বলা চলে। এই—দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা Edwin B. Flippo-র মত অনুসারে কর্মস্পৃহা এক বিশেষ মানসিক অবস্থাকে চিহ্নিত করে। যে অবস্থায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠী পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে সংগঠনের জন্য কাজ করায় সচেষ্ট হয়। একইভাবে Jucious এবং slender-র সংজ্ঞা অনুসারে কর্মস্পৃহা হলো এক মানসিক অবস্থা, এক ধরনের বিশেষ আবেগ যা কাজ করবার ইচ্ছাকে ত্বরান্বিত করে, বা কর্মীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ সংগঠনের লক্ষ্যকেও প্রভাবিত করে। Dale Yoder-র মন্তব্য অনুযায়ী একদল কর্মীর কাছে কর্মস্পৃহা হল এক বিশেষ পরিস্থিতি, বা কাজের পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। যদি কর্মীরা তাদের গোষ্ঠীর কাজের প্রতি এবং সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, সংগঠনের ক্রিয়াকলাপে সন্তুষ্ট থাকে এবং তাদের নিজেদের পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যদি বজায় থাকে তবে সেই কর্মীরা উচ্চ কর্মস্পৃহাসম্পন্ন, পক্ষান্তরে কর্মীবৃন্দের মধ্যে সংগঠনের কাজকে কেন্দ্র করে বিতৃষ্ণা, বিরক্তি, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, হতাশা যদি জন্মায় তবে সেই সংগঠনের কর্মীদের কর্মস্পৃহা নিম্নমানের বলে প্রতিভাত হয়।

৩। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মস্পৃহা এক সামাজিক বিষয় যা মানুষকে সমাজবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে এবং কোনো সুনির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত করে। Alexander Leighton-র মতে কর্মস্পৃহা একধরনের ক্ষমতাকে বোঝায় যা অবিরামভাবে একদল লোককে ঐক্যবদ্ধ রাখে এবং কোনো সাধারণ লক্ষ্য রূপায়ণের জন্য নিরন্তর চালিত করে। Blackmanship-র মতানুসারে কর্মস্পৃহা এক ধরনের একাত্মতাবোধের সূচক। এর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির কাজ, কর্ম-পরিবেশ, সহকর্মী, উর্ধতন কর্তৃপক্ষ, সংগঠন সমস্ত কিছুর সঙ্গে একধরনের সমমর্মিতা গড়ে ওঠার বিষয়টি জড়িত।

এইরূপ নানান সংজ্ঞার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি কর্মস্পৃহা নিঃসন্দেহে কাজ করবার ইচ্ছার দ্যোতক। অবশ্য, বিষয়টিকে একটিমাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। Keith Davis-মতানুযায়ী আমরা এক সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবহারিক সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করতে পারি। কর্মস্পৃহা বলতে সংগঠনের স্বার্থ সর্বোৎকৃষ্টভাবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে প্রতি কর্মীর নিজস্ব ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার, উচ্চতম মাত্রার পারস্পরিক স্বেচ্ছা সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নিজেদের কর্ম ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত এক দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায় এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণে রাখা দরকার কর্মস্পৃহা একধরনের মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে, মূলত আনুগত্য, আগ্রহ ও আত্মসচেতনাবোধ, সম্পৃক্ত ধারণা। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে গোষ্ঠী স্বার্থের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব না হলে কর্মস্পৃহা গড়ে ওঠে না। তৃতীয় পর্যায়ে বলা যায়, কর্মস্পৃহা নিঃসন্দেহে কর্মীর এক ব্যক্তিগত বিষয়। শেষত, মানুষের আচরণ, কর্মধারা ও নিয়মানুবর্তিতার বিষয়গুলি গভীরভাবে তার কর্মস্পৃহার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

১.৩ সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মস্পৃহার তাৎপর্য

যে কোনো সংগঠনের ক্ষেত্রে কর্মস্পৃহা বিষয়টি গভীর তাৎপর্য সম্পন্ন। কারণ সংগঠনের মানব সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এই কর্মস্পৃহা। স্বাভাবিকভাবেই যে সংগঠনে কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক মিত্রতাপূর্ণ এবং কর্মী-কর্তৃপক্ষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক বিদ্যমান সেখানে কর্মস্পৃহার মাত্রা বেশি হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন সংগঠনের কর্মস্পৃহা উন্নত করার মূল দায়িত্ব সবটাই কর্তৃপক্ষের।

কর্মস্পৃহা এক মানসিক অবস্থা এবং সংগঠনের সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। সংগঠনের উদ্দেশ্য রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যৌথ ও সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হয় যদি কর্মীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা উচ্চমানের হয়, সংগঠনের কর্মীদের কর্মস্পৃহা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন। এর মধ্যে উল্লেখ্য ১। কর্মীদের মধ্যে গড়ে ওঠা এক ধরনের ঐক্যবোধ, ২। নিজেদের সংগঠনের সঙ্গে গড়ে ওঠা এক একাত্মতাবোধ, ৩। সংগঠনের লক্ষ্যকে অর্জন করার এক অঙ্গীকার, ৪। উন্নত কর্ম পরিবেশ, ৫। কর্মী-কর্তৃপক্ষের সৌহার্দ্যপূর্ণ-সম্পর্ক প্রভৃতি।

এছাড়াও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ প্রশাসনিক নেতৃত্ব যেখানে বিভিন্ন প্রশাসনিক নীতিসমূহ কর্মীদের শারীরিক, মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক জীবনের প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল। এছাড়াও সংগঠনটির প্রতি বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আইন নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভৃতির উপরেও অনেকটা নির্ভর করে কর্মস্পৃহার বিষয়টি।

সামগ্রিক সংগঠনের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কর্মস্পৃহা বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে নেপোলিয়ন এক সময়ে বলেছিলেন সামরিক ক্ষেত্রে সাফল্য বা ব্যর্থতার ৭৫% নির্ভর করে সৈনিকদের কর্মস্পৃহার চরিত্রের উপর। John Adair-র (Effective Readership) মতে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে সাধারণভাবে যে মূল্যায়ণ গড়ে তোলা হয় ব্যক্তি নিজেও চেষ্টা করে তদনুরূপ আচরণ করতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো ব্যক্তিকে আমরা যদি অলস ধরে নিই প্রথম থেকে কালক্রমে দেখা যায় তাঁর মধ্যের ক্রিয়াশীলতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায় এবং কর্মস্পৃহাও নষ্ট হয়ে পড়ে। অন্যদিকে

কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ যদি উচ্চধারণা পোষণ করে তখন কর্তৃপক্ষের সেই ধারণাকে সত্য প্রমাণ করার এক তাগিদ কর্মীর মধ্যে জাগে এবং ফলত তার কর্মস্পৃহা বাড়তে বাধ্য। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কর্মীদের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে তুলে তাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষমতাকে গঠনমুখীভাবে ব্যবহার করা।

Robert Heller-র Managing People শীর্ষক পুস্তিকায় কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা এবং সংগঠনের কর্মস্পৃহা বাড়ানোর জন্য দশটি প্রয়োজনীয় উপাদানের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। যে কোনো সংগঠনের কার্যকরীতা বৃদ্ধির সঙ্গে এই উপাদানগুলির ওতোপ্রোতো বাধা রয়েছে।

উপাদান	সংশ্লিষ্ট কৌশল
১। আত্মবিকাশ	কর্মীদের সংগঠনের নানা জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে দেওয়া দরকার এবং নিজস্বভাবে সেগুলির মোকাবিলার দায়িত্ব দেওয়া দরকার।
২। স্বীকৃতি	কর্মীদের কৃতিত্বকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক।
৩। সহকর্মীদের পারস্পরিক মর্যাদা	কর্মীদের সাফল্যকে সর্বসমক্ষে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিতে হবে।
৪। পারদর্শিতা (Expertise)	কর্মীদের বিশেষীকৃত জ্ঞান বিকাশে সহায়তা প্রয়োজন।
৫। দক্ষতা (Competence)	দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দরকার।
৬। সাফল্য	যে সমস্ত লক্ষ্যগুলি সহজে পূরণীয় সেগুলি সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌছে সংগঠনের সাফল্যের মাত্রা বাড়িয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি দরকার।
৭। স্বাতন্ত্র্য	কর্মীদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন।
৮। আত্মনির্ভরশীলতা	কাজগুলিকে পালনযোগ্যভাবে বণ্টন করা আবশ্যক।
৯। আত্মমর্যাদা	কর্মীর নিজের উপর আস্থা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
১০। সভ্যপদ	কর্মীদের সংহতি বাড়ানোর জন্য কর্মীসংগঠন গড়া দরকার।

এই দশটি উপাদান ব্যতীতও মনে রাখা দরকার যথাযথ বেতন কাঠামো, চাকরির নিরাপত্তা এবং মর্যাদা উন্নয়নের সুবন্দোবস্তও সংগঠনের কর্মীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। একই সঙ্গে তাদের অভিযোগসমূহের দ্রুত প্রতিবিধানের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষের উচিৎ সমস্ত কর্মীবৃন্দকে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ অবহিত রাখা। প্রয়োজন মতো কাউন্সেলিং ব্যবস্থা বা সাহায্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনগ্রসর কর্মীদের সংগঠন উপযোগী করে তুলতে হবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে কর্মীদের মতামত গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী পরিচালন প্রক্রিয়া চালানো দরকার।

পূর্বোক্ত কৌশলগুলি অবলম্বন করে কর্মস্পৃহা বাড়ানোর উপাদানসমূহকে সক্রিয় করতে পারলে নিঃসন্দেহে সংগঠনের কার্যকরীতা বাড়বে। এছাড়াও মনে রাখা দরকার সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে যদি উচ্চতর কর্মস্পৃহা জাগানো সম্ভব হয় তবে বিভিন্ন ধরণের শ্রমিক সমস্যা অনেক সহজে মোকাবিলা করা যায়। বিশেষতঃ কর্মীদের অনুপস্থিতি, শৃঙ্খলাহীনতা বা অভিযোগ প্রতিকারের ক্ষেত্রে এবং সাংগঠনিক সম্পদের অপচয় রোধ করার ক্ষেত্রে কর্মস্পৃহার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান কালে শিক্ষা মনস্তত্বের উন্নততর গবেষণা সমূহের প্রেক্ষিতে আমরা শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে উন্নত শ্রমিক-কর্তৃপক্ষ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন এবং এই কারণে সরকারি ক্ষেত্র সমূহে আজ

দেখি প্রতিটি সরকারই নানা শ্রমিক কল্যাণমুখী নীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে কর্মস্পৃহা উন্নত করার নিরন্তর প্রয়াস নিচ্ছেন।

১.৪ কর্মস্পৃহা পরিমাপের বিভিন্ন উপায় সমূহ

আগেই আমরা বলেছি কর্মস্পৃহা বলতে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থাকে বোঝানো হয়, স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রত্যক্ষ কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর পরিমাপ সম্ভব নয়। তবে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি তার কাজের প্রতি এবং তার আচরণের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে তার অন্তরের কর্মস্পৃহার বোধটি বাইরে প্রতিভাত হয়। এছাড়াও সংগঠনের মূল উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য ও ব্যর্থতা, লাভ ক্ষতির পরিমাণ বিশ্লেষণের মাধ্যমেও সামগ্রিক সংগঠনের কর্মীবৃন্দের কর্মস্পৃহার মাত্রা বোঝা যায়। এছাড়াও শ্রমিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ, শ্রমিক সংখ্যা, উৎপাদনের গুণমান ও পরিমানের তারতম্য, অনুপস্থিতি ও ছাঁটাইয়ের হার প্রভৃতির পর্যালোচনার মধ্যে দিয়েও বিভিন্ন সময়ের কর্মস্পৃহার মাত্রা পরিমাপের চেষ্টা করা যায়। মনস্তাত্ত্বিক ও শিল্প গবেষণার স্বার্থে কর্মস্পৃহার পরিমাপের জন্য কতগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলি নিম্নে আলোচিত হল।

১। **পর্যালোচনা ঃ** এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষক কর্মীদের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ ও অনুভূতি সমূহের সন্ধানে কর্মীদের তাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিভিন্ন সময়ে ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এইগুলিতে পরিবর্তনের মাত্রা চিহ্নিত করে সামগ্রিক কর্মস্পৃহার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ধারণ করেন।

২। **সাক্ষাৎকার ঃ** পর্যবেক্ষক সরাসরিভাবে কর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মারফৎ তাদের কর্মস্পৃহার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে। এই সাক্ষাৎকার দুই ধরনের হয় মূলত নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য প্রশ্নসমূহ সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ। নিয়ন্ত্রিত সাক্ষাৎকারে মুদ্রিত প্রশ্নসমূহ নিয়ে পর্যবেক্ষক কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং উত্তর সংগ্রহের মাধ্যমে কর্মস্পৃহার মাত্রা নির্ধারণের চেষ্টা করেন। অপরপক্ষে অনিয়ন্ত্রিত সাক্ষাৎকারে কোনো মুদ্রিত প্রশ্নাবলী থাকে না এবং পর্যবেক্ষক সাধারণ কথোপকথনের মাধ্যমে নিজের অভিষ্ট অনুসন্ধান করেন। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার সাফল্য অনেকটাই পর্যবেক্ষকের গ্রহণযোগ্যতা এবং তাঁর উপরে কর্মীদের আস্থার উপর নির্ভরশীল।

৩। **মুদ্রিত প্রশ্নাবলী ঃ** শ্রমিকদের মধ্যে মুদ্রিত প্রশ্নাবলী অনেক সময়ে বণ্টন করা হয় এবং তাঁরা সেগুলি পূর্ণ করে পর্যবেক্ষকের কাছে জমা দেন। এই সমস্ত প্রশ্নগুলি অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদদের সহায়তায় তৈরী করা হয় এবং মূলত 'সঠিক উত্তর চিহ্নিত কর' এইভাবে গড়ে তোলা হয় যেখানে বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে সঠিকটিতে টিক চিহ্ন দিতে বলা হয়। কোনো কোনো প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেবার ব্যবস্থাও কখনো কখনো থাকে প্রশ্নপত্রে। এইভাবে প্রাপ্ত উত্তরগুলির বিশ্লেষণও আমাদের শ্রমিক কুলের কর্মস্পৃহার মাত্রা পরিমানে সাহায্য করে।

৪। **প্রকল্পমুখী কৌশল ঃ** এটিও কর্মীদের কর্মস্পৃহা পর্যবেক্ষণের অন্যতম উপায় বলে গৃহীত। এই কৌশল অনুসারে কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন গল্প লেখা অথবা তাদের ভালোলাগা/মন্দলাগা, অথবা তাদের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, আশা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রতিযোগিতামূলক লেখা, অথবা চিত্রাঙ্কণ, স্লোগান তৈরি, প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয় এবং সেগুলির বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েও পরোক্ষভাবে কর্মস্পৃহার পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব হয়।

৫। **সংগঠনের রেকর্ড এবং বিভিন্ন রিপোর্ট ঃ** যে কোনো সংগঠনে, বিশেষত সরকারি সমস্ত সংগঠনের সকল কাজের বিশদ বিবরণী নথিবদ্ধ করা থাকে। এই নথিবদ্ধ বিবরণী যেরকম সংগঠনের সামগ্রিক ফলাফল সংক্রান্ত, অর্থাৎ মোট উৎপাদনমাত্রা, শ্রমিকসংখ্যা, মুনাফা বা ক্ষতির মাত্রা, শ্রমিকদের অনুপস্থিতি, ছাটাই সংক্রান্ত, দুর্ঘটনার এবং সাফল্যের খতিয়ান, অভিযোগ, অসন্তোষ, অপ্রতুলতা সংক্রান্ত হয় একই ভাবে প্রতিটি কর্মীর ব্যক্তিগত ফলাফলের এবং কর্মোদ্যোগ

ও সাফল্য বা ব্যর্থতার বিশদ বিবরণীও সংরক্ষিত থাকে। বিভিন্ন সময়ের এই সমস্ত রিপোর্টগুলির তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়েও সংগঠনের কর্মস্পৃহার পরিমাণের এক পর্যায়ক্রমিক চিত্র পাওয়া যায়।

১.৫ কর্মস্পৃহার নির্ধারক সমূহ

কর্মস্পৃহা মূলত মানুষের আচরণের এক বিশেষ দিক। Hawthorne পরীক্ষা এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষণসমূহের মাধ্যমে কর্মস্পৃহার নির্ধারক কি কি সেই বিষয়ে আমরা নানান তথ্য জেনেছি। এই বিভিন্ন গবেষণাগুলির ভিত্তিতে Alexander Leighton পাঁচটি প্রধান নির্ধারকের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো—

১। সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি প্রতিটি সদস্যের আস্থা।

২। সংগঠনের নেতৃত্বের উপর প্রতিটি সদস্যের আস্থা।

৩। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যের পারস্পরিক আস্থা বা বিশ্বাস।

৪। সংগঠনিক দক্ষতা।

৫। সামগ্রিক সাংগঠনিক দক্ষতা।

Many C. Viles-র মতে এই পাঁচটি বিষয়কে একটি টেবিলের পাঁচটি পায়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে। কোনো একটি পা যদি একটু ছোট বা একটু বড় হয় তবুও কিন্তু টেবিল দাঁড়াতে পারে, তেমনি এই পাঁচটি বিষয়ের কিছু হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলেও সংগঠনে কর্মস্পৃহা বিদ্যমান থাকে।

১। **সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি সদস্যদের আস্থা ঃ** নিঃসন্দেহে কর্মীদের সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে কাজ করার পিছনে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সদস্যরা যদি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর সঙ্গে নিজস্ব অস্তিত্বের একাত্মতা অনুভব করে তবে সহজেই কর্মস্পৃহার মান সেখানে উন্নত করা যায়।

২। **সংগঠনের নেতৃত্বের উপর আস্থা ঃ** যে কোনো সংগঠনে কর্মস্পৃহা বাড়ানোর কাজে নেতৃত্বের এক বড় অবদান থাকে। নেতৃত্ব যদি স্বচ্ছ, সৎ, সৌহার্দ্যপূর্ণ, কর্মঠ হয় কর্মীরা তাহলে কাজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অনুপ্রেরণা পায় এবং নেতৃত্বের সৎ উদ্দেশ্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে তাদের আস্থা জম্মায়। স্বাভাবিকভাবে এরূপ অবস্থায় সংগঠনের কর্মস্পৃহার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

৩। **সংগঠনের সদস্যদের পারস্পরিক বিশ্বাস বা আস্থা ঃ** কর্মীদের মধ্যে মিত্রতামূলক সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। কর্মীরা যদি একে অপরের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় বা একে অপরের আনন্দ বা সাফল্যের শরিক হয় স্বাভাবিকভাবেই তাদের পারস্পরিক বিশ্বাসের মাত্রা বাড়ে। সংগঠনের যে কোনো সমস্যাকে তারা একত্রে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকে এবং অভিযোগ সমূহের প্রতিকারের জন্য সম্মিলিত দাবি তোলে। এই ভাবে কর্মীদের মধ্যে যদি সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ লক্ষিত হয় তবে সে সংগঠনে কর্মস্পৃহার পরিমাণ বাড়ে।

৪। **সাংগঠনিক দক্ষতা ঃ** উচ্চ সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পন্ন ব্যবস্থায় কর্মস্পৃহার মাত্রা বাড়ে। সাংগঠনিক দক্ষতার সঙ্গে দুটি বিষয় ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলি হলো দায়িত্বের সুনির্দিষ্ট বন্টন এবং সংগঠনের সর্বস্তরে যথাযথ যোগাযোগ ব্যবস্থা। কর্মীদের যদি যথাযথ এবং সুনির্দিষ্ট আদেশ দেওয়া হয় তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনেক সহজে অনুসরণ করে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কর্তৃপক্ষ যদি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শ্রমিকদের মতামত গ্রহণ করে সেই সংগঠনে কর্মস্পৃহার মাত্রা বাড়তে বাধ্য।

৫। কাজের পরিবেশ ও অন্যান্য বিষয় ঃ কর্মস্পৃহা প্রাথমিকভাবে কর্মকেন্দ্রিক সন্তোষজনক মানসিক অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ যদি অনুকূল হয় এবং কাজের প্রকৃতি ও প্রাপ্তি যদি সন্তোষজনক হয়, কাজের নিরাপত্তা যদি বজায় থাকে এবং বেতনকাঠামো যদি সদস্যের মানসিক ও বস্তুগত চাহিদা মেটাতে পারে তবে কর্মস্পৃহার মাত্রাও সেখানে উন্নত হয়।

১.৬ সারাংশ

এই এককটিতে সাধারণভাবে কর্মস্পৃহা বলতে কি বোঝায় এবং সংগঠনের প্রেক্ষিতে এর তাৎপর্য কি তাই নিয়ে আলোচনা করলাম। একই সঙ্গে সংগঠনের ক্ষেত্রে কর্মস্পৃহা বাড়ানোর কিছু কিছু উপায় সম্পর্কেও অবহিত হলাম, এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। কর্মীর মধ্যে ক্রিয়াশীলতা বাড়িয়ে সংগঠনের কার্যকরীতা উন্নত করার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এই কর্মস্পৃহা। যদিও বিষয়টি মূলত এক মানসিক অবস্থার দ্যোতক। একই সঙ্গে স্মরণীয় সরকারি কি বেসরকারি উভয় ধরনের সংগঠনের ক্ষেত্রেই প্রধানত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কর্মস্পৃহার বিষয়টি নিয়ে সচেতন থাকা। এছাড়াও কর্মস্পৃহার পরিমাপের বিভিন্ন কৌশল নিয়েও আলোচনা হয়েছে এই এককে। কারণ কর্মস্পৃহার মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব হলে স্বাভাবিকভাবেই এটি বৃদ্ধি করার প্রয়াস সহজতর হবে। কর্মস্পৃহার নির্ধারকের গুরুত্ব সংগঠনের ক্ষেত্রে অপরিসীম। সেই কারণে বিভিন্ন নির্ধারক সমূহের আলোচনাও হয়েছে উপরি বিস্তৃত এককটিতে।

১.৭ অনুশীলনী

১। কর্মস্পৃহা কাকে বলে এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। যে কোনো সংগঠনের প্রেক্ষিতে কর্মস্পৃহার তাৎপর্য কী?

৩। কর্মস্পৃহা বাড়ানোর বিভিন্ন উপায়গুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৪। কর্মস্পৃহার বিষয়টি কি পরিমেয়? কীভাবে এটির পরিমাণ সম্ভব।

৫। কর্মস্পৃহার বিভিন্ন নির্ধারকগুলি কী? এগুলির তাৎপর্য্য আলোচনা করুন।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Mohit Bhattacharya : **New Horizons of Public Administration.**

২। Robert Heller : **Effective Leadership,** Dorling Kindersley, London 1999.

৩। Andrew Leigh & Michael Maynard : **The Perfect Leader,** Random House, UK, 1999.

৪। R.S. Dwivedi : **Human Relations and Organizational Behaviour,** Oxford 9BH Publishing Company, Delhi, 1979.

৫। Mohit Bhattacharya : 'Conceptualizing Good Governance' in IJPA, Vol : XLIV, July-September, 1998, No : 3

একক ২ ❑ সাংগঠনিক অভিযোগ : অভিযোগ প্রতিকারের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াসমূহ

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ সাংগঠনিক অভিযোগের সংজ্ঞা

২.৩ সাংগঠনিক অভিযোগের কারণ

২.৪ সাংগঠনিক অভিযোগের গুরুত্ব

২.৫ সাংগঠনিক অভিযোগ প্রতিকারের বিভিন্ন উপায়

২.৬ সারাংশ

২.৭ অনুশীলনী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত এককটি পঠনের মাধ্যমে আমাদের জানা সম্ভব হবে—

- সংগঠন ব্যবস্থা পরিচালন করার ক্ষেত্রে অভিযোগ সমূহ কি ধরনের সৃষ্টি হতে পারে।
- কেন এই সমস্ত অভিযোগ গড়ে ওঠে এবং এগুলির তাৎপর্য কী?
- একই সঙ্গে অভিযোগ গুলির প্রতিকার কীভাবে হতে পারে।

২.১ প্রস্তাবনা

নীরোগ মানবদেহের ধারণা যেমন এক অলীক কল্পনা মাত্র, সেইরূপই অভিযোগহীন সংগঠনের ধারণাও অবাস্তব। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে কোনো সংগঠনেই কিছু না কিছু অভিযোগ বিদ্যমান থাকে। কোথাও অভিযোগের তীব্রতা ও গুরুত্ব বেশি কোথাওবা আপেক্ষিকভাবে এগুলি কম মাত্রায় উপস্থিত। কিন্তু সম্পূর্ণ অভিযোগহীন সংস্থা বাস্তবে সম্ভব নয়। এমনকি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর সংগঠন সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল সংগঠনেও আমরা কিছু না কিছু অভিযোগ চিহ্নিত করতে পারি। যেহেতু এমন কোনো সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় যেখানে সকল সদস্যের কর্মী কর্তৃপক্ষ

উভয় স্তরের, সমস্ত বস্তুগত ও মানসিক চাহিদার পরিপূর্ণ প্রাপ্তি ঘটবে সেই কারণে অভিযোগ সাংগঠনিক ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। এখন প্রশ্ন হল পরিচালকবৃন্দ এই অভিযোগগুলির কিভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করে অথবা কর্মীরা এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে কতটা ব্যস্ত থাকে। তার মাত্রার উপরেই নির্ভর করে সংগঠনের সাফল্য বা ব্যর্থতা।

২.২ সাংগঠনিক অভিযোগের সংজ্ঞা

সাংগঠনিক অভিযোগ বলতে কি বোঝায়—এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দেওয়া খুবই অসুবিধেজনক, তবুও মোটামুটিভাবে বলা যায় সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে যদি কোনো অপূর্নতা বোধক বঞ্চনাবোধ বা বিরক্তি বা ক্ষোভ অথবা ক্রোধ জন্মায় সংস্থার কোনো ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তখন তাকে আমরা সাংগঠনিক অভিযোগ বলতে পারি, এই অভিযোগ কর্মী কর্তৃপক্ষ উভয়ের তরফেই গড়ে উঠতে পারে। যদিও বিষয়টি প্রাথমিকভাবে মানসিক এক বিশেষ অবস্থার সূচক কিন্তু কালক্রমে এর ব্যবহারিক প্রকাশ সংগঠনের কার্যকলাপকে সক্রিয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।

Dale S. Beach-এর মতে "অভিযোগ" বলতে আমরা কর্মক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক বঞ্চনাবোধ অথবা ন্যায়ের অভাব বোধকে বোঝায় যা কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। Richard P. Caalhoon সাংগঠনিক অভিযোগের বিষয়টিকে কর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে সাংগঠনিক অভিযোগ বলতে এক অবস্থাকে বোঝায় যখন কোনো কর্মী ভাবে অথবা অনুভব করে তার প্রতি কোনো অন্যায় করা হচ্ছে। এই বোধের সংজ্ঞা এক অস্বস্তিকর অবস্থা জড়িত রয়েছে। Michael J. Jucius-র মতে যে কোনো ধরনের অসন্তোষ অথবা অপূর্ণতাবোধ যদি কর্মীর মধ্যে জন্মায়, তা বৈধ সব সময়ে নাও হতে পারে, কিন্তু তা যদি সংগঠন সংশ্লিষ্ট ব্যাপার থেকে উৎসাহিত হয় তবে তাকে সাংগঠনিক অভিযোগ বলা চলে। এই ক্ষেত্রে কর্মীটির চিন্তায়, বিশ্বাসে এবং অনুভবে এক ধরনের বৈষম্যের, বঞ্চনার শিকার হবার বোধ কাজ করে। সে মনে করে তার প্রতি গভীর অন্যায় করা হচ্ছে।

এই সমস্ত নানান সংজ্ঞা অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি সাংগঠনিক অভিযোগসমূহ সূচনীয় এক মানসিক বিষয়রূপে থাকলেও কালক্রমে এর ভয়াবহ ব্যবহারিক প্রকাশ ঘটে। কর্মীর অসন্তোষ থেকে গড়ে ওঠা প্রশাসনিক অন্যায় বা অন্যায্যতা সংক্রান্ত বোধের বাস্তব প্রকাশ ঘটলে তাকে অভিযোগ বলা হয়।

২.৩ অভিযোগের কারণ

সাংগঠনিক অভিযোগসমূহ গড়ে ওঠার, সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে, নানান কারণ থাকে, নিম্নে আমরা সেরূপ কিছু কারণের আলোচনা করলাম।

১। কোনো এক বা একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে কর্মী এবং কর্তৃপক্ষ যখন বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতপোষণ করে তখন সাংগঠনিক বিরোধের সূচনা ঘটে। এই বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি বা মত এমন এক স্তরে যদি পৌঁছয় যেখানে উভয়পক্ষের মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে পড়ে তাহলে আপষ-মীমাংসার পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে এবং সাংগঠনিক অভিযোগ তীব্র হয়ে ওঠে।

২। শ্রমিক সংগঠনের কার্যাবলীও অনেক সময়েই সাংগঠনিক অভিযোগের কারণ হয়ে ওঠে। বিশেষত যদি শ্রমিক সংগঠন নতুন এবং শক্তিশালী হয় এবং তারা কোনো বিশেষ বিষয়ে যদি অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেয়, মূলত শ্রমিক স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়কেন্দ্রীক, তবে সাধরণভাবে পরিচালকগোষ্ঠী তা মানতে অস্বীকৃত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক অভিযোগ গড়ে ওঠে।

৩। কর্মীদের শ্রমিক স্বার্থ সংক্রান্ত দাবি সমূহ বিশেষত শ্রমিক কল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণের দাবিগুলি সংস্থায় অভিযোগের জন্ম দেয়। আবার বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে এই দাবিগুলি আরো সোচ্চার হয়।

৪। শ্রমিকদের মনের ভীতি, প্রধানত কাজের নিরাপত্তা সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতার কারণে, সাংগঠনিক অভিযোগ সৃষ্টি করে।

৫। সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায়ও সাংগঠনিক অভিযোগের অন্যতম কারণ। বিশেষত সমধরনের সংস্থায় যদি সমনীতি অবলম্বন করা না হয় তবে অভিযোগ সৃষ্টি হতে বাধ্য।

৬। পরিচালকগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত ও প্রযুক্ত নীতি এবং পদ্ধতির মধ্যের ব্যবধানও সাংগঠনিক অসন্তোষ ও অভিযোগ গড়ে তোলে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ যদি গৃহীত নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বিশেষে পক্ষপাত প্রদর্শন করে তবেও অভিযোগ গড়ে ওঠে।

২.৪ সাংগঠনিক অভিযোগের গুরুত্ব

যে কোনো সংগঠন যেখানে বহু লোকে একত্রে কাজ করে সেখানে অভিযোগ সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। কিন্তু অভিযোগ যেমন সৃষ্টি হয় তার প্রতিবিধানের জন্যও সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। মানুষের স্বভাবগত ভিন্নতার কারণেই অভিযোগ প্রাথমিকভাবে গড়ে ওঠে। অভিযোগের সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি ঘটলে সংগঠনের প্রকৃতি এবং তার পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

প্রথমত—অভিযোগ সমূহের মাধ্যমে কর্মী মনোভাব অনেকটাই বোঝা যায়। বিশেষত সংস্থার বিভিন্ন নীতি, পদ্ধতি ও প্রথা সমূহ সম্পর্কে তারা কি ভাবছে, বা কতটা গ্রহণ করছে তা বোঝা যায়। একই সঙ্গে শ্রমিকদের অসন্তোষ, তাদের চাহিদা, হতাশা অথবা তাদের সন্তুষ্টির মাত্রা ও প্রকৃতিও অভিযোগের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্মীদের সম্পর্ক কি রকম—সহযোগিতামূলক না বৈরীতাপূর্ণ সেই সম্পর্কেও পরিচালকমণ্ডলী অবহিত হতে পারে অভিযোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

তৃতীয়ত, অভিযোগের প্রকাশের মাধ্যমে কর্মীরা তাদের ভয়, বিদ্বেষ, আশঙ্কা, অভাব, অসন্তুষ্টি ও অন্যান্য আবেগের বহিঃপ্রকাশ করতে পারে। এর ফলে নিঃসন্দেহে তাদের মানসিক চাপ কিছুটা কমে।

চতুর্থত, সম্মিলিতভাবে অভিযোগের প্রকাশের মাধ্যমে তদুপরি যদি উপযুক্তভাবে অভিযোগের প্রতিবিধান ঘটে, তবে কর্মী ঐক্য মনোবল এবং তাদের কর্মস্পৃহার মাত্রাও বাড়ে বলে মনে করা হয়।

পঞ্চমত, অভিযোগের বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিচালন কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে তাদের নীতি ও নিয়মসমূহের গলদ কোথায়। সেই অনুসারে সংশোধন প্রক্রিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে পরিচালক গোষ্ঠী নিজেদের ফাঁকগুলি ভরাবার সুযোগ পায়।

২.৫ অভিযোগ প্রতিকারের বিভিন্ন উপায়

সুস্থ শিল্প সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে অভিযোগের প্রতিবিধান অত্যাবশ্যক। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার কোনো এক সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে সাংগঠনিক অভিযোগ প্রতিকার করা সম্ভব নয়। কারণ অভিযোগের প্রকৃতিগত ভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য এছাড়াও যে কোনো সংগঠনের প্রেক্ষিতে প্রায় প্রত্যহই নতুন নতুন অভিযোগ গড়ে ওঠে। প্রধানত দুই ধরনের উপায়ের মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়।

ক। সাধারণ উপায়—শিল্পক্ষেত্রে (বেসরকারি) সংস্থায় গড়ে ওঠা যে কোনো অভিযোগ কোম্পানী ম্যানেজার বা অনুরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে পেশ করতে হয়। সাধারণ ভাবে কর্মীদের যে কোনো অভিযোগ তাদের সরাসরি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে হয়, সেখানে যদি আশানুরূপ প্রতিকার পাওয়া না যায় তবে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অথবা শ্রমিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় অফিসারের কাছে অভিযোগ পাঠানো যেতে পারে। কর্মী যদি এতেও সন্তুষ্ট না হয় তবে সাধারণ ম্যানেজার বা ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে অভিযোগ জানানো যেতে পারে।

কোনো কোনো সংগঠনে ম্যানেজেরিয়াল স্তরেও যদি অভিযোগ প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা না হয় তার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার সুযোগ থাকে, এই ক্ষেত্রে অভিযোগ Joint Grievance Committee বা যৌথ অভিযোগ প্রতিকার কমিটির কাছে পাঠানো হয়। এই কমিটিতে শ্রমিক-মালিক উভয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা থাকেন এবং এর সিদ্ধান্তই তখন বিরোধ মীমাংসার জন্য চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়।

খ। অভিযোগ প্রতিকারের বিশেষ উপায়—১৯৫৮ সালের Labour Conference-এ গৃহীত এই বিশেষ উপায়কে Model Grievance Procedure বলা হয়। এই খসড়া অনুযায়ী—

১। যে কোনো কর্মী তার অভিযোগ সরাসরি সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত অভিযোগ মীমাংসাকারী অফিসারের কাছে জানাবে। এমনকি মৌখিক ভাবেও এই অভিযোগ জানানো চলে। অভিযোগ করার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সেই অভিযোগের জবাব দিতে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকে। যদি এই জবাব কর্মীকে সন্তুষ্ট করতে না পারে অথবা যদি ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কর্মীটির অভিযোগের কোনো উত্তর দেওয়া না হয় তবে সে তার বিভাগীয় উচ্চতম পদাধিকারীর কাছে এই মর্মে আবেদন করতে পারে।

২। বিভাগীয় প্রধান যে কোনো অভিযোগের প্রতিকার তিনদিনের মধ্যে করতে বাধ্য। যদি সম্পূর্ণ প্রতিকার নাও করা যায় তবুও দেরী হবার কারণ সংশ্লিষ্ট কর্মীকে জানাতে হবে। কিন্তু যদি এই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত কর্মীকে খুশী করতে না পারে সে তার অভিযোগ মীমাংসার জন্য Grievance Committee-র কাছে প্রেরণ করার অনুরোধ জানাতে পারে।

৩। Grievance Committee-র দায়িত্ব তার কাছে প্রেরিত যে কোনো অভিযোগের জবাব সাতদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজারের কাছে পাঠানো। যদি এই সময়ের মধ্যে অভিযোগ প্রতিকার সম্ভব নাও হয় তবু তার কারণ দর্শাতে হবে। এই কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রূপায়ণে পরিচালকমণ্ডলী বাধ্য থাকে। পক্ষান্তরে সদস্যদের মতভেদ থাকলে সেই মর্মে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তাদের উপর দেওয়া হবে।

৪। Grivance Committee-র সুপারিশের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অভিযোগ প্রতিকারের বিষয়াবলী তিনদিনের মধ্যে ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত সহ কর্মীর গোচরে আনা দরকার।

৫। যদি ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত কর্মীকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তবে কর্মী ম্যানেজারকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানাতে পারে। এই ক্ষেত্রে কর্মীটি শ্রমিক সংগঠনের কোনো উর্ধতন ব্যক্তিকে দিয়ে তার পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত আবেদন আলাপ-আলোচনার জন্য অনুরোধ করতেও পারে। এই ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ৭ দিনের মধ্যে কর্মীকে ফলাফল জানানো।

৬। এর পরেও যদি কর্মীটির মধ্যে অসন্তোষ থাকে তবে বিষয়টি voluntary arbitration বা স্বেচ্ছামূলক বিবেচনাধীনে মীমাংসার চেষ্টা করা যায়।

৭। এই রূপ বিভিন্ন স্তর বা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যখন কর্মীটি তার অভিযোগের প্রতিবিধান পাবার চেষ্টা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত 'বিরোধ মীমাংসা সংক্রান্ত' ব্যবস্থাবলী প্রযুক্ত হবে না। কারণ অভিযোগ ও বিরোধের মধ্যে এক সূক্ষ্ম ফাঁক আছে। একমাত্র যখন সর্বোচ্চ স্তরে গৃহীত অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কর্মী বাতিল করে দেবে তখনই অভিযোগ বিরোধের আকার নেবে এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে মীমাংসার চেষ্টা হবে।

Grievance Committee সাধারণভাবে ৪/৬ জন সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠে। এই কমিটির গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া যে কোনো সংগঠনে শ্রমিক সংগঠনের সমর্থন সাপেক্ষে পরিবর্তন করা যায়।

গ। অভিযোগ মীমাংসার বিশেষ কর্তৃত্ব—১৯৮২ সালে প্রণীত শিল্প বিরোধ (সংশোধনী) আইন অনুসারে এক পৃথক ও বিশেষ কর্তৃত্ব গড়ে তোলা যায় অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত। যে সমস্ত সংগঠনে ৫০ বা তদূর্ধ কর্মী সংখ্যা সেখানে অভিযোগসমূহের প্রতিকার ও বিরোধ মীমাংসার জন্য বিশেষ কর্তৃপক্ষ থাকা বাধ্যতামূলক। এই কর্তৃত্বের বিচারাধীনে থাকা বিষয়সমূহ অন্যান্য বিচারাধিকার সম্পন্ন কর্তৃত্ব যেমন conciliation Board, Labour Court, Industrial or National Court-এর বিবেচনায় আনা যায় না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার এই বিশেষ কর্তৃত্বের কাছে তখনই অভিযোগগুলি পাঠানো যায় যদি কর্মী সরাসরি অথবা শ্রমিক সংগঠন তার প্রতিকারের জন্য এই বিশেষ কর্তৃত্বের শরণাপন্ন হতে চায়।

২.৬ সারাংশ

এই অংশটি আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম অভিযোগসমূহ সংগঠন পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। অভিযোগ নির্মূল করা কোনো সংগঠনের ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় একমাত্র অভিযোগ প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। অভিযোগ সংগঠনের প্রেক্ষিতে কর্মী কর্তৃপক্ষ উভয় স্তরেই জন্মাতে পারে। তবে কর্মী অভিযোগই সাধারণভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রতিকারের উপায়ও বহুস্তর বিশিষ্ট এবং তুলনামূলকভাবে জটিল। অভিযোগের ইতিবাচক দিক হিসেবে বলা চলে এগুলির মাধ্যমে শ্রমিক মনোভাবের চিত্র পাওয়া যায় এবং কর্তৃপক্ষ সচেতন হয়ে চলতে পারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। অভিযোগ গড়ে ওঠার কারণ নানাবিধ হতে পারে যেকোনো সংগঠনে তবে প্রাথমিকভাবে এক ধরনের অভাববোধ বা বঞ্চনাবোধ এর মূলে কাজ করে। একইভাবে মনে রাখা দরকার অভিযোগসমূহের প্রতিকারের বন্দোবস্ত প্রথমে সংস্থায় আভ্যন্তরিন ভাবে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় করা হয় তবে এই ব্যবস্থা অপ্রতুল হলে তখন বহিঃসহযোগিতা নেওয়া হয়। যাই হোক, মূল কথা সংগঠনের অভিযোগগুলি কখনও অবহেলা করা উচিৎ নয় এবং উপযুক্ত ও সময়োপযোগী প্রতিবিধান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা প্রয়োজন। সুস্থ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদেই চেষ্টা করা দরকার যাতে অভিযোগ বিরোধে পরিণত না হয়।

২.৭ অনুশীলনী

১। সাংগঠনিক অভিযোগ কাকে বলে? এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

২। সাংগঠনিক অভিযোগ গড়ে ওঠে কী কারণে?

৩। সাংগঠনিক অভিযোগের তাৎপর্য কী?

৪। সাংগঠনিক অভিযোগ প্রতিবিধানের বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করুন।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Mohit Bhattacharya : New Horizons of Public Administration.

২। John Adair : Effective Leadership, Rupa Co, New Delhi, 1993.

৩। Robert Heller : Managing People, Dorling Kindersleag, London, 1994.

৪। Claus Moller : Employeeship, TMI Publishing, A/s 1992.

একক ৩ ❑ কর্মী কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রমিক-সংগঠনের ভূমিকা : ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ জনপ্রশাসনে শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা

৩.৩ ব্রিটেনের শ্রমিক সমস্যা মীমাংসার উপায়াবলী ও হুইটলি কমিশন

৩.৩.১ হুইটলি কাউন্সিলের উদ্দেশ্য

৩.৪ মার্কিন প্রশাসনিক বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

বর্তমানের এই এককটি আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব—

- জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা ও এর উদ্ভবের ইতিহাস।
- ব্রিটেনে কি প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে প্রশাসনিক বিরোধের মীমাংসা হয়।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিরোধের নিষ্পত্তির উপায়।

৩.১ প্রস্তাবনা

আগের এককটির সূচনাতেই আমরা বলেছিলাম নীরোগ মানবদেহের ধারণার মতোই এক অলীক কল্পনা অভিযোগ বিহীন সংগঠনের ধারনা অর্থাৎ, সংগঠনের ক্ষেত্রে অভিযোগ থাকবেই, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সাংগঠনিক অভিযোগ কি সাংগঠনিক দ্বন্দ্বের রূপ নিচ্ছে? জনপ্রশাসনের দায়িত্ব সাংগঠনিক অভিযোগ সমূহের যথা শীঘ্র প্রতিকারের ব্যবস্থা করা এবং অভিযোগগুলি যাতে বিরোধের পর্যায়ে না রূপান্তরিত হয় সেই চেষ্টা করা অবশ্যই প্রয়োজন। মূলত এই দায়িত্ব নিঃসন্দেহে কর্তৃপক্ষের, তবুও বর্তমান সময়ে শ্রমিক সংগঠন সমূহও যথেষ্ট দায়ী থাকে বিরোধসমূহের মীমাংসার ক্ষেত্রে,

এই সমস্ত কারণে নিম্নউল্লিখিত অংশ সমূহে আমরা শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা ও বিভিন্ন অন্যান্য উপায় যেগুলির মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক বিরোধসমূহের মীমাংসা সম্ভব সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

৩.২ জনপ্রশাসনে শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা

শ্রমিক সংগঠন আজকের শিল্পসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এর ভূমিকা ভিন্ন হয়। শ্রমিক সংগঠনের অধিকারসমূহ নিয়েও চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং অনেকেই মনে করেন সংগঠন গড়ে তোলার অধিকার এবং ধর্মঘটের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া অপেক্ষা স্টাফ কাউন্সিল গড়ে তুলে যৌথ আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে কর্মী-কর্তৃপক্ষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন।

জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠন বা বৃত্তিভিত্তিক সংঘ গড়ে উঠতে শুরু করে প্রধানত বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে। Staff Association বা কর্মীসংঘগুলি গড়ে ওঠে মূলত বিশেষীকৃত বৃত্তিকে ভিত্তি করে অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে সাধারণভাবে সমস্ত শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং তাদের স্বার্থ-রক্ষার নিমিত্তে, সিডনি ও বিয়াট্রিস ওয়েবের মতে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠন শ্রমিকদের এক চিরস্থায়ী সংগঠন যার মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষেরা নিজেদের কাজের পরিবেশ ও কর্মজীবনের মান উন্নত করার নিরন্তর চেষ্টা চালায়।

অন্যদিকে নামকরা সমাজবিজ্ঞানীদের মতে শ্রমজীবি মানুষরা মনে করে শ্রমিক সংগঠনের সদস্য হওয়ার মাধ্যমে তাদের মূল চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি ঘটবে। এই বোধই শ্রমিক সংগঠন সৃষ্টি করে।

শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে সার্বিক শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। কর্মী সংঘের থেকে শ্রমিক সংগঠনগুলির গঠন ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য নজরে পড়ে। প্রথমটি প্রধানত উঁচু স্তরের কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত এবং এদের খুব বেশি সংগ্রামী ভূমিকা পালনের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নগুলি একদম তৃণমূল স্তরে অবস্থিত শ্রমজীবি মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠে এবং এগুলি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে সরকারের কাছ থেকে নিজেদের দাবিদাওয়ার স্বীকৃতি আদায় করে।

শ্রমিক সংগঠনগুলি ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্র ধরে staff association বা কর্মী সংঘের পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্ট। যদিও বর্তমানে জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলি অনেক ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। শ্রমিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠার জন্য গত শতকের প্রথমভাগে আকস্মিক শ্রমিক সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি, সরকারি ব্যবস্থায় কর্মী কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক কেন্দ্রিক সংঘাত এবং মহাযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে বিরাট আকারের মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য সংযুক্ত পরিবর্তনগুলি দায়ী। প্রথমদিকে শ্রমিক সংগঠন শুধুমাত্র বেসরকারি ক্ষেত্রে স্বীকৃত ছিলো, যেহেতু মনে করা হতো বেসরকারি ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে গঠিত এবং সরকারি ক্ষেত্র সমষ্টিগত উন্নয়ন বা জনকল্যাণের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। এছাড়াও সরকারি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়মবিধি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য কিন্তু বেসরকারি উদ্যোগ দক্ষতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় নিয়মবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতা আসে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এসে দেখা যায় সংবিধানের ১৯ নং এবং ৩০৯ নং অনুচ্ছেদে সরকারি কর্মীদের শ্রমিক সংগঠনে অংশ নেবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রাষ্ট্র প্রয়োজনমত সরকারি কর্মীদের সংগঠন গড়ে তোলার অধিকারের উপর কিছু ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। কর্মী সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে সংগঠনের কর্মীদের পারস্পরিক পরিচিতি বাড়ানো এবং সাধারণ স্বার্থ ও সাধারণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা। লিওনার্ড হোয়াইটের মতে এই

ধরণের বিভিন্ন সংগঠনে যোগ দেওয়ার ফলে ব্যক্তি ভীষণভাবে উপকৃত হয়। তার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, নিজের সার্থকতা ও ব্যর্থতা উভয়ই অন্যান্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে সক্ষম হয়। তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং দক্ষতার মান বাড়ে, এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

৩.৩ ব্রিটেনের শ্রমিক সমস্যা মীমাংসার উপায়াবলী ও হুইটলি কাউন্সিল

১৯১৭ সালে ব্রিটেনে শিল্পসম্পর্ক উন্নয়নের জন্য হুইটলির নেতৃত্বাধীন কাউন্সিল বিভিন্ন পরামর্শ দেয়। এর মধ্যে উল্লেখ্য Joint council বা যুগ্ম কাউন্সিল গড়ে তোলা কর্মী কর্তৃপক্ষের সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। প্রথমে এই কাউন্সিলর—পরামর্শসমূহ কেবল বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় পরবর্তীকালে ১৯১৯ নাগাদ সরকারি কর্মীদেরও হুইটলি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে উভয় স্তরের সর্বোচ্চ সহযোগিতা অর্জনের জন্য এবং বিভিন্ন ধরনের অভিযোগের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সূত্র প্রশাসনের অভ্যন্তরেই গড়ে তোলার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। হুইটলেইসম্-এর মূল কথা হলো বিভিন্ন স্তরের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা ও বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলা করা অর্থাৎ জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা কর্তৃপক্ষ এবং কর্মী প্রতিনিধিদের পর্যায়ক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের আদানপ্রদান।

৩.৩.১ হুইটলি কাউন্সিলের (Whitley Council) উদ্দেশ্য

১। জনপ্রশাসনের অধিকর্তাদের ভাবনা চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার।

২। কর্মীর উপর অধিক দায়িত্ব প্রদান বিশেষত কাজের পরিবেশ বজায় রাখা সংক্রান্ত এবং কিছু সাধারণ বিষয়াবলী যেমন নিয়োগ, কাজের সময়সীমা নির্ধারণ, বেতন প্রভৃতি বিষয়ক।

৩। কর্মীদের বিবিধ সুযোগ প্রদান এবং কাজের পরিবেশের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন।

৪। জনপ্রশাসকদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা এবং উচ্চতর পরিচালন ও সাংগঠনিক বিষয়ে তাদের দক্ষ করে তোলা।

৫। জনপ্রশাসকদের কাজ এবং অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন।

জাতীয় হুইটলি কাউন্সিল গড়ে ওঠে সাধারণ জনকৃত্য প্রশাসক এবং বিভিন্ন বিভাগীয় প্রশাসনিক কর্মীদের নিয়ে। তবে এখানে কোনো স্তরবিন্যস্ত মর্যাদার সম্পর্ক নেই। জাতীয় কাউন্সিল বিভিন্ন বিভাগীয় কাউন্সিলের নিয়মাবলীতে সম্মতি জানায় এবং কোনো বিভাগীয় কাজ যদি জাতীয় চুক্তি সমূহের বিপরীত হয় অথবা বিভাগীয় কর্তৃত্বের এলাকা বহির্ভূত হয় তবে জাতীয় কাউন্সিলের অবহিত থাকা প্রয়োজন। কাউন্সিলের আঞ্চলিক কমিটিগুলির দায়িত্ব বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যার প্রতি যত্ন নেওয়া। জাতীয় কাউন্সিল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কর্মী কর্তৃপক্ষ উভয় গোষ্ঠীর ২৭ জন করে সভ্য থাকেন। সভাপতি নির্ধারিত হয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এবং উপ-সভাপতি কর্মীদের মধ্যে থেকে। কাউন্সিলের দুজন সচিব থাকেন উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে। কাউন্সিলের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য এক স্ট্যান্ডিং কমিটি থাকে। কর্মীদের পদোন্নতি ও কাজের পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী এই কমিটির নিয়ন্ত্রনাধীন।

বিভাগীয় কাউন্সিল সমূহের নেতৃত্বে থাকেন মন্ত্রী বা বিভাগীয় প্রধান। সভাপতি হন বিভাগীয় প্রধান এবং সচিব নিযুক্ত হন কর্মীদের তরফ থেকে। বিভিন্ন বিভাগীয় বিবাদ মীমাংসা ছাড়াও পদোন্নয়ন এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই কমিটি। ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বা জেলাস্তরের কমিটিগুলিও অনুরূপ ভাবে গড়ে ওঠে জনকৃত্যক কর্মী ও সরকারি কর্মচারীদের সমন্বয়ে। এবং এরা আঞ্চলিক স্তরে বিভাগীয় কাউন্সিলের সহায়তায় সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করে।

৩.৪ মার্কিন প্রশাসনিক বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসনিক বিরোধ মীমাংসার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলি তুলনামূলকভাবে হুইটলি কাউন্সিলের প্রথা অপেক্ষা সরলতর। এখানে বিভিন্ন সংগঠিত কর্মী সংগঠন গুলির প্রতিনিধিদের কাছে কর্মী স্বার্থ-সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে মতামত জানতে চাওয়া হয়। এই সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে নীতিটির ব্যাপক প্রচার করা হয় যাতে সমস্ত কর্মী ও সংগঠনসমূহ ভালোভাবে অবহিত থাকে বিষয়টি নিয়ে। এরপর বিভিন্ন ধরনের মতামত ও আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে কর্মী সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে। সংগঠনগুলির দায়িত্ব বিভিন্ন নীতি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা, প্রশাসনিক পরামর্শসমূহকে কর্মী স্বার্থ অনুকূলে প্রভাবিত করা। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এই ধরনের বিভিন্ন প্রস্তাব ও সুপারিশগুলির উপযুক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার মার্কিন কর্মী সংগঠনগুলি মূল উদ্দেশ্য কর্মীদের বেতন, ভাতা ও কাজের পরিবেশ উন্নত করা। একই সঙ্গে অন্যান্য শ্রমিক স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়াবলী যেমন, অবসর সংক্রান্ত নিয়মাবলী, বর্ধিত সময়ের কাজ অথবা ছুটি সংক্রান্ত নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রমিক স্বার্থকে তুলে ধরা।

একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার ৮৪তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে জনআইন ৩৩০ ধারার বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো কর্মীর অধিকার নেই—হরতাল বা কর্ম-বিরতিতে অংশ নেওয়ার। সরকারি বা আধাসরকারি কোনো সংগঠনে এমন কোনো ব্যক্তি কাজের সুযোগ পাবে না যে—

(ক) মার্কিন সাংবিধানিক সরকারকে কোনোভাবে বরখাস্ত করবার চেষ্টা করে।

(খ) যদি সে এমন কোনো সংগঠনের সদস্য হয় আর লক্ষ্য সরকারের বিরোধীতা এবং সাংবিধানিক সরকারকে উৎপাটনের চেষ্টা।

(গ) যদি সে সরকার বিরোধী কোনো ধর্মঘটে অংশ নেয়। অথবা

(ঘ) যদি সে ধর্মঘটের অধিকারকে স্বীকার করে।

৩.৫ সারাংশ

উপরের অংশটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারলাম বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা কি এবং কিভাবে প্রধানত বিংশ শতকের কর্মী সংগঠনগুলি গড়ে উঠতে শুরু করে। আজকের জনপ্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কর্মী সংগঠনগুলি নিঃসন্দেহে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে কারণ কর্মীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একই সঙ্গে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত রাষ্ট্রসমূহে কি ভাবে শ্রমিক সমস্যা মেটানোর প্রয়াস নেওয়া হয় তাও আলোচিত হল। এই অংশের আলোচনা নিঃসন্দেহে পরবর্তী এককটিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

৩.৬ অনুশীলনী

১। জনপ্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠন কী অপরিহার্য? যুক্তি সহ বিশ্লেষণ করুন।

২। জনপ্রশাসন ব্যবস্থার অংশ হিসাবে শ্রমিক সংগঠনের বিকাশের ধারাটি পর্যালোচনা করুন।

৩। শ্রমিক সংগঠনের কী ভূমিকা জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে?

৪। মার্কিন ও ব্রিটিশ ব্যবস্থার সূত্র ধরে তুলনামূলক ভাবে প্রশাসনিক বিরোধ সমূহে মীমাংসার উপায় নিয়ে টীকা লিখুন।

৫। হুইটলি কাউন্সিল কেন গড়ে ওঠে—এর গঠন ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করুন।

৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কী উপায়ে প্রশাসনিক বিরোধের নিষ্পত্তি হয়?

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Mohit Bhattacharya : New Public Management Panadigm : Public Administration in Turmoi L, Prof. P. A James Memorial Endowment Lecture, 1998.

২। Jaspal Singh (ed) : Emergent Trends of Public Administration.

একক ৪ ☐ ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কর্মী কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক উন্নয়ন

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য

৪.৩ কর্মী পর্ষদ

৪.৩.১ কর্মী পর্ষদের গঠন

৪.৩.২ কর্মী পর্ষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৪.৩.৩ কর্মী পর্ষদের কাজ

৪.৩.৪ সীমাবদ্ধতা

৪.৪ পরবর্তী ব্যবস্থা সমূহ

৪.৫ উপদেষ্টা পর্ষদ বা এ্যাডভাইসারী কাউন্সিল

৪.৬ সারাংশ

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত অংশটি পড়লে ভারতীয় প্রশাসনিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে কর্মী কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক উন্নত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহ সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। এই আলোচনার সঙ্গে পূর্ববর্তী এককগুলির একত্র আলোচনা সামগ্রিক প্রশাসনিক অভিযোগগুলির প্রতিকার ও কর্মী কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন আলোকপাত করবে। ভারতীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্টাফ কাউন্সিল, এ্যাডভাইসারী কাউন্সিলের ভূমিকা এ-প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য।

৪.১ প্রস্তাবনা

সঠিক অর্থে আধুনিক ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্ম বৃটিশ যুগে, এই কারণে কর্মী কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ভালো করার লক্ষ্যে সংগঠিত যে কোনো আলোচনার উৎস বৃটিশ ঐতিহ্য থেকে স্বাভাবিক ভাবেই আসে। স্বাধীনতা পরবর্তী

ভারতে যে সমস্ত উদ্যোগের মাধ্যমে এই সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা হয় তার মধ্যে স্টাফ কাউন্সিল বা কর্মী পর্ষদের গঠন ও কার্যাবলী এবং পরবর্তী পর্যায়ের উপদেষ্টা পর্ষদ বা এ্যাডভাইসারী কাউন্সিলের বিশেষ ভূমিকা আলোচনা করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে এই ব্যবস্থা সমূহের সীমাবদ্ধতাও আলোচনা করা হলো পরবর্তী অংশগুলিতে।

৪.২ ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য

ভারতীয় আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে ঔপনিবেশিক আমলে। সেই কারণে সামগ্রিক ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপরেই বৃটিশ প্রভাবের গভীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে ভারতে যে সমস্ত উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে কর্মী কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা হয় বৃটিশ হুইটলি কাউন্সিলের (1919) ছাপ সেগুলির মধ্যে নিয়ত উপস্থিত। এমনকি প্রথম বেতন কমিশন 1947 সনে যে রিপোর্ট দেয় সেখানেও সরাসরি হুইটলি কাউন্সিলের ধাঁচে এক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব ছিলো। দ্বিতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্টেও এধরনের আর্জি স্পষ্ট ছিলো। এখানে বলা হয় সরকারি কর্মীদের ধর্মঘট যদি নিষিদ্ধ হয় তবে তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতেই একমাত্র করা সম্ভব। অর্থাৎ, তাদের বিভিন্ন অভিযোগ, বিশেষত বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত, কাজের সময় ও অবসর সংক্রান্ত নিয়মাবলী, কর্মপরিবেশের বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক বিতর্ক ও অভিযোগসমূহের উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা আবশ্যিক। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই সমস্ত প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও সরকারি তরফে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। একমাত্র 1954 সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এক নির্দেশ জারী করে সমস্ত অন্যান্য মন্ত্রকগুলিতে Staff Committee বা কর্মী কমিটি গড়ে তোলার আদেশ দেয়। কয়েক বৎসর পরে 1957 এ এই কমিটির নাম পরিবর্তিত হয়ে Staff Council বা কর্মী পর্ষদ হয় এবং বৃটিশ ব্যবস্থা অনুসারে প্রতিটি মন্ত্রকের সঙ্গে জনকল্যাণ অফিসারের পদটি গড়ে ওঠে।

৪.৩ কর্মী পর্ষদ (Staff Council)

প্রতিটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে দুটি করে কর্মী পর্ষদ যুক্ত হয়। উর্ধতন কর্মী পর্ষদ বা দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী পর্ষদ এবং নিম্নতর কর্মী পর্ষদ বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের পরিষদ। প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মীদের এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হয় নি। উভয় কর্মী পর্ষদের সচিবালয় সংক্রান্ত কার্যসমূহ প্রায় সম্পূর্ণতই হুইটলি কাউন্সিলের ধারানুসারী হয়। পর্ষদ গুলিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অফিসার এবং অধস্তনকর্মী প্রতিনিধিদের সংখ্যাগত সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হয়। যদিও ভারতে ব্রিটেনের ন্যায় National Council or জাতীয় পর্ষদ কোনো নেই।

৪.৩.১ কর্মী পর্ষদের গঠন

উর্দ্ধতন কর্মী পর্ষদের গঠন ঃ

১। এখানে প্রথমে থাকেন এক সভাপতি, যিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রীর দ্বারা নিযুক্ত হন। সাধারণভাবে বিভাগীয় সচিব বা যুগ্ম সচিবকেই এই পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়;

২। সচিব পর্যায়ের অন্যান্য সদস্যরাও মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হন। এছাড়াও মন্ত্রকের অধীনস্ত বিভিন্ন বিভাগের উর্ধতন ব্যক্তিরাও সদস্য হন।

৩। সাধারণ কর্মী প্রতিনিধিরা আসেন বিভিন্ন স্তর থেকে যেমন ক) সেকশন অফিসাররা, খ) সহায়করা, গ) স্টেনোগ্রাফার, ঘ) প্রতি ২০ জন করণিকের জন্য একজন প্রতিনিধি।

৪। পর্ষদের সচিবকে মনোনয়ন করেন সভাপতি কর্মী প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে।

নিম্নস্তর কর্মী পর্ষদের গঠন ঃ ডেপুটি সেক্রেটারী স্তরের একজনকে এখানকার সভাপতি মনোনীত করা হয়। এছাড়াও কর্মী প্রতিনিধি হিসেবে থাকেন ক) দপ্তরী ও রেকর্ড কিপার, খ) জমাদার, পিওন, ফরাস, চৌকিদার এবং ঝাড়ুদার প্রতিনিধি। এঁরা সরাসরিভাবে নিজেদের স্তর থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হন। এখানেও সচিবকে নিযুক্ত করেন সভাপতি কর্মী প্রতিনিধিদের সম্মতি অনুসারে।

৪.৩.২ কর্মী পর্ষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই পর্ষদের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল ঃ

(ক) কর্মমান উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব বিবেচনা করা।

(খ) কাজের শর্তাবলী সম্পর্কে কর্মীদের মতামত সরকারকে জানানো।

(গ) অফিসার এবং সাধারণ কর্মীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার কর্মী পর্ষদ মূলত এক পরামর্শদানকারী সংস্থা এবং এই ভূমিকা থেকে কতগুলি সাধারণ কাজ এই পর্ষদ পালন করে।

১। সমস্ত কর্মী প্রতিনিধিদের কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা।

২। কাজের শর্তাবলী সংক্রান্ত সাধারণ নিয়ম সমূহ।

৩। কর্মী কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়।

৪। কাজের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

৪.৩.৩ কর্মী পর্ষদের কাজ

যদিও কর্মী পর্ষদের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে তবুও বাস্তবে এর কার্যকারিতা খুব উৎসাহপ্রদ নয়। একদম সূচনা লগ্নে অবশ্য এর কার্যকারিতা কিছুটা লক্ষ্য করা গেছে এবং তথ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী 1959 এ রাজ্যসভার রিপোর্ট অনুযায়ী উর্ধতন কর্মী পর্ষদের ক্ষেত্রে 763 টি প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র চুয়ান্নটি সরকার বাতিল করে এবং একুশটি কার্যকরী করা হয়নি।

কিন্তু সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই চিত্র পাল্টে যায় এবং দ্বিতীয় বেতন কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে পর্ষদের কাজ কোনোমতেই মান অনুযায়ী নয়। উপরন্তু এই কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় সরকারের তরফে ব্যাপক অনীহা রয়েছে কমিশনের সুপারিশ গ্রহণের ক্ষেত্রে। যৌথ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বিবাদ সমূহের মীমাংসার ব্যাপারেও উপযুক্ত উদ্যোগের অভাব লক্ষণীয়। এছাড়াও নিয়মিত পর্ষদের সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও গাফিলতি লক্ষ্য করে এই রিপোর্ট। হুইটলী কাউন্সিলের বহুপোকত্ত ইংল্যান্ডে যে রূপ এক মর্যাদা পায় প্রশাসনিক বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে, ভারতের কর্মী পর্ষদ সেই স্তরে পৌঁছতে দৃশ্যতই ব্যর্থ। এখানে কর্মী সংগঠনগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ আরো বাড়ানোর দাবি অনেক ক্ষেত্রে তোলে। এছাড়াও একটি স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তুলে তার মাধ্যমে সমস্যা নিষ্পত্তির এক প্রয়াসও নেওয়া হয়।

৪.৩.৪ সীমাবদ্ধতা

কর্মী সংগঠনের গঠন ও কার্যাবলীর মধ্যেই এর সীমাবদ্ধতা নিহিত থাকে।

প্রথমত, সংশ্লিষ্ট অফিসাররা অনেক ক্ষেত্রেই পেশাদারী ভাবে হুইটলিসের ন্যায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার দক্ষতা দেখাতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত, কর্মী সংগঠনের সভা অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে সংগঠিত।

তৃতীয়ত, পর্ষদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ রূপায়ণের ক্ষেত্রে সরকারি গাফিলতি লক্ষণীয়।

চতুর্থত, এখানে ইংল্যান্ডের ন্যায় জাতীয় পর্ষদের উপস্থিতি না থাকায় কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের সাধারণ বা সার্বিক স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়াবলী যথেষ্ট অবহেলিত হয়।

পঞ্চমত, পর্ষদের সুপারিশ বা প্রস্তাব রূপায়ণ সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়, ফলত মৌখিক আশ্বাস ভিন্ন কার্যকরী কিছু ঘটানো অনেক সময়ই হয় না।

এই সমস্ত ত্রুটি দূর করার জন্য দ্বিতীয় বেতন কমিশন এক কেন্দ্রীয় যুগ্ম পর্ষদ গড়ে তোলার কথা বলে যার আওতায় শিল্প ও অশিল্প উভয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই আনা প্রয়োজন। এছাড়াও আবশ্যিকে মীমাংসাকারী ট্রাইবুনাল গড়ে তোলাও দরকার, বিশেষত বেতন, কর্মসময় এবং ছুটি সংক্রান্ত নিয়ম তৈরির ক্ষেত্রে। একই সঙ্গে বলা হয় শ্রম মন্ত্রককে অনেক বেশি সক্রিয় হতে হবে।

৪.৪ কর্মী পর্ষদ পরবর্তী ব্যবস্থা সমূহ

1960 সালে ভারতীয় সরকার কর্মী পর্ষদকে হুইটলি কাউন্সিলের সমমর্যাদা সম্পন্ন করে ঘোষণা করে। এক নতুন ত্রিস্তর ব্যবস্থা গড়ে তার মাধ্যমে কর্মী কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা হয়। স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্ষদ, বিভাগীয় পর্ষদ এবং জাতীয় পর্ষদ এইভাবে সামগ্রিক ব্যবস্থাকে বিন্যস্ত করা হয়। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মীমাংসার জন্যে স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্ষদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিভাগীয় পর্ষদের আওতায় নির্দিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব পড়ে এবং প্রতি মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত এরূপ এক পর্ষদ থাকা আবশ্যিক করা হয়। জাতীয় পর্ষদের কর্মক্ষেত্রে আসে কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাবলী এবং কর্মী কল্যাণ ও কাজের মান বৃদ্ধি করার বিষয়সমূহ।

একটি arbitration committee বা মধ্যস্থতাকারী কমিটি গড়ে তোলার কথাও বলা হয় পাঁচ সদস্যের এই কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধিদের পাশাপাশি কর্মী প্রতিনিধি থাকার বন্দোবস্তও করা হয়। 1966 সাল থেকে জাতীয় পর্ষদ যে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসায় ব্যর্থ হয় সেগুলি এই arbitration committee তে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। জাতীয় বিভাগীয় ও আঞ্চলিকস্তরে Joint consultative council বা যুগ্ম পরামর্শদানকারী পর্ষদও গড়ে তোলা হয়। কাজের পরিবেশ, শর্তাবলী, কর্মী কল্যাণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কাজের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তাব রাখার অধিকার এদের থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নিয়োগ বা পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি এদের আওতার বাইরে থাকে।

৪.৫ উপদেষ্টা পর্ষদ

বর্তমানকালের যে কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় উপদেষ্টা পর্ষদ বা এ্যাডভাইসারী কাউন্সিল সমূহ কর্মী কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক উন্নত করার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন যুগেও এই পরামর্শদানকারী গোষ্ঠীর উপস্থিতি প্রশাসনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও উপদেষ্টামণ্ডলীর কথা আমরা পাই।

বর্তমানের উপদেষ্টা পর্ষদগুলির গঠন ও কার্যাবলী মূলত জনসম্পর্ক উন্নত করা এবং প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরণের প্রশাসনিক বিতর্ক মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। উপদেষ্টা পর্ষদ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরকারকে নানান পরামর্শ দেয়। বিশেষত কর্মী কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে।

Pfiffner-র মতানুসারে, 'উপদেষ্টা পর্ষদ বলতে এক বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীকে বোঝায় যাঁর স্বেচ্ছামূলকভাবে পরামর্শদানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশাসনিক সমস্যা ও প্রক্রিয়ার সদুত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন, সাধারণভাবে উপদেষ্টা পর্ষদে সরকারি সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের সমমর্যাদা দেওয়া হয়।

আভ্যন্তরিন দিক থেকে উপদেষ্টা পর্ষদ দুই প্রধান কাজ করে। প্রথমত—সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে পরামর্শ দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত—সিদ্ধান্ত ও পদ্ধতি সমূহের যথাযথ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা।

বাহ্যিক দিক থেকে জনগণের কাছে সংগঠনের কাজ ও লক্ষ্য ব্যখ্যা করা। সংগঠনের জন্য অর্থসংগ্রহ এবং সংগঠনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার দায়িত্বও অনেকটাই উপদেষ্টা পর্ষদের। এছাড়াও কর্মী গোষ্ঠীর মানসিকতা ও দাবিদাওয়া পর্যালোচনার কাজও এরা করে থাকেন।

প্রসঙ্গত, পঞ্চম বেতন কমিশনে কিছু যুগান্তকারী ধ্যানধারণার অবতারনা করা হয়েছে। প্রশাসনে কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জনমুখী করা এবং গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মোটকথা, কর্মীবৃন্দকে শুধু আভ্যন্তরিন কাজ দেখলেই হবে না, জনগণের সন্তুষ্টির দিকেও নজর রাখতে হবে। গণতন্ত্রে প্রশাসণের দায়বদ্ধতা মূলত সাধারন মানুষের কাছে। সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়ের প্রতি যত্নশীল থাকা দরকার।

৪.৬ সারাংশ

বর্তমান এককটি সম্পূর্ণই ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রচিত। এখানে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে কর্মী কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে তারই এক ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, আধুনিক ভারতীয় প্রশাসনের জন্ম বৃটিশ যুগে। স্বাভাবিকভাবেই এই কারণে স্বাধীনতা উত্তর যুগেও ভারতীয় প্রশাসনিক কাঠামোয় স্পষ্টত বৃটিশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কর্মী পর্ষদ ও উপদেষ্টা পর্ষদের গঠন ও কার্যাবলীর উপর ১৯১৯ এ গড়ে তোলা হুইটলি কমিশনের ছাপ পাওয়া যায়। কর্মী পর্ষদ, উপদেষ্টা পর্ষদ এবং বিভিন্ন বেতন কমিশনের মাধ্যমে সরকারি কর্মীবৃন্দের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত সমস্যাগুলির উপযুক্তভাবে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা বিভিন্ন সময়ে করা হয়। কারণ নিঃসন্দেহে কর্মী কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক উন্নত করার জন্য এটি প্রয়োজনীয়। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। এই সমস্ত বিভিন্ন পদক্ষেপের কোনোটিই কিন্তু সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে কর্মীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করা এবং সংগঠনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে এই প্রতিটি ব্যবস্থারই সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব আছে। উপসংহারে মনে রাখা দরকার বর্তমান সময়ে প্রশাসনের গণতান্ত্রিকরণের সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের কর্মস্পৃহা বাড়ানো, কর্মী কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জনমুখী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার বিষয়টিও সমান্তরাল প্রাধান্য পাচ্ছে।

৪.৭ অনুশীলনী

১। ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কর্মী-কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপগুলির পর্যালোচনা করুন।

২। ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের ভূমিকা ভারতীয় প্রশাসনের কর্মী-কর্তৃপক্ষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতীয়মান?

৩। হুইটলি কমিশনের গঠন, কার্যাবলী এবং বর্তমানের প্রশাসনের উপর এর প্রভাব আলোচনা করুন।

৪। কর্মী পর্ষদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য কি? এর কার্যাবলী এবং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এক টীকা লিখুন।

৫। উপদেষ্টা পর্ষদের গুরুত্ব পর্যালোচনা করুন।

৬। কর্মী পর্ষদ এবং উপদেষ্টা পর্ষদের তুলনামুলক আলোচনা করুন।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Mohit Bhattacharya : From Good Government to good Governance : changing profiles of Public Administration in developing countries.

২। Mohit Bhattacharya : 'conceptualizing Good Governance; in IJPA, Vol-XLIV, July-Sept, 1998, No : 3

৩। Sofi Ali & Anita Rao : Reinventing Public Administration for 21st Century.

ই. পি. এ.-৫
জনপ্রশাসনের ঐচ্ছিক পাঠক্রম
পর্যায় ঃ ২০

৪.৭ অনুশীলনী

১। ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কর্মী-কতৃপক্ষ সম্পর্ক উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপগুলির পর্যালোচনা করুন।

২। ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের ভূমিকা ভারতীয় প্রশাসনের কর্মী-কর্তৃপক্ষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতীয়মান?

৩। হুইটলি কমিশনের গঠন, কার্যাবলী এবং বর্তমানের প্রশাসনের উপর এর প্রভাব আলোচনা করুন।

৪। কর্মী পর্ষদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য কি? এর কার্যাবলী এবং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এক টীকা লিখুন।

৫। উপদেষ্টা পর্ষদের গুরুত্ব পর্যালোচনা করুন।

৬। কর্মী পর্ষদ এবং উপদেষ্টা পর্ষদের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Mohit Bhattacharya : From Good Government to good Governance : changing profiles of Public Administration in developing countries.

২। Mohit Bhattacharya : 'conceptualizing Good Governance; in IJPA, Vol-XLIV, July-Sept, 1998, No : 3

৩। Sofi Ali & Anita Rao : Reinventing Public Administration for 21st Century.

ই. পি. এ.-৫

জনপ্রশাসনের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ২০

একক ১ ☐ অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা

১.৩ অনুশাসন এবং দায়বদ্ধতা

১.৪ ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনুশাসনের পদ্ধতি

১.৫ বাহ্যিক অনুশাসন

১.৫.১ আইন বিভাগীয় অনুশাসন

১.৫.২ সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে প্রশাসনিক যন্ত্রের উপর অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ

১.৬ আভ্যন্তরীণ অনুশাসন

১.৬.১ দুর্নীতি নিরোধক সতর্কীকরণ সংস্থার ব্যবস্থা

১.৭ সামাজিক পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণ

১.৭.১ সাংস্কৃতিক বিরোধ

১.৭.২ রাষ্ট্রকৃত্যকগণের সামাজিক ভিত্তিজনিত সমস্যা

১.৭.৩ প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাঠামোগত সমস্যা

১.৮ সারাংশ

১.৯ অনুশীলনী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনারা জানতে পারবেন ঃ

- অনুশাসন কাকে বলে
- অনুশাসন এবং দায়বদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য কি
- ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনুশাসন ও দায়বদ্ধতার নীতি
- সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ
- সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ
- ভারতীয় সামাজিক পরিবেশ এবং নিয়ন্ত্রণ
- উপসংহার।

১.১ প্রস্তাবনা

জন-প্রশাসনের ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে আপনাদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনুশাসন ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। জনপ্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কর্মীগণ সর্বজ্ঞ নন। তাঁদের কাজকর্মে নানারকম ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে। অজ্ঞাতে তাঁরা যে সকল ভুল করে থাকেন তা সাধারণত ক্ষমা করা হয়। কিন্তু যদি তাঁরা সজ্ঞানে এবং স্ব-ইচ্ছায় কোন গর্হিত কাজ করেন, যার ফলে সরকারের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কখনই তা ক্ষমা করা যায় না। এই ধরনের গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারী কর্মীগণের উপর কতগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। উক্ত অধ্যায় পাঠ করলে আপনারা সরকারী বিধিনিষেধগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

প্রশ্ন : ১) রাজনীতিক প্রশাসক এবং স্থায়ী প্রশাসক এর মধ্যে পার্থক্য কি? ২) রাজনীতিক প্রশাসক এর দায়িত্ব বলতে কি বোঝায়? ৩) মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব কোথায়? ৪) প্রশাসক-এর দায়িত্ববোধ এবং কর্মপ্রচেষ্টায় সততার গুরুত্ব কোথায়?

১.২ অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা

সরকারী কর্মচারীগণ স্বপদে বহাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের উপর কতগুলি বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। এই বিধি নিষেধগুলির মধ্যে অন্যতম হল নিয়ন্ত্রণ বা অনুশাসন। ইংরাজি Control শব্দটির অর্থ নিয়ন্ত্রণ। শাসন অর্থেও Control শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তবে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ বা শাসন অর্থে এখানে 'অনুশাসন' শব্দটি ব্যবহৃত হলো। প্রশাসনিক কর্মীগণ তাদের যোগ্যতার দ্বারাই প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্জন করেন। কাজেই প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিগণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হন এবং তাদের ক্ষমতার সীমারেখা সম্পর্কে সচেতন থাকেন বলেই ধরে নেওয়া সঙ্গত। কাজেই পেশাগতভাবে তাদের উপর যে সকল বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় সেগুলিকে ঠিক শাসন বলা চলে না। অতএব 'নিয়ন্ত্রণ' বা 'অনুশাসন' এই দুটি শব্দ এক্ষেত্রে অনেকখানি প্রাসঙ্গিক।

বর্তমান যুগে জনপ্রশাসন বা লোক প্রশাসন জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের বিরাট এলাকা জুড়ে স্থিত। কার্যভারের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসকের দায়িত্বভারও বেড়েছে। কাজেই শুধু কতকগুলি লিখিত রীতিনীতি বা আইন-কানুন মান্য করেই একজন প্রশাসক তাঁর দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন না। তাঁর নিজস্ব দায়িত্বভার সম্পন্ন করার পিছনে তিনি নিজেও আন্তরিক ভাবে জড়িত থাকেন এবং তাঁর উপর প্রদান করা দায়িত্বভার সুষ্ঠু এবং সৎভাবে সম্পন্ন করতে চান। তাঁর ভিতরের এই সৎ ইচ্ছাই স্বেচ্ছারোপিত শাসন। কোন ব্যক্তির উপর আরোপ করা আভ্যন্তরীণ শাসনই হল 'নিয়ন্ত্রণ'।

১.৩ অনুশাসন এবং দায়বদ্ধতা

অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে যে বিষয়টির উপর কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন তা হল প্রশাসকের দায়বদ্ধতা। আগেই বলা হয়েছে যে একজন প্রশাসক পেশাগত ক্ষেত্রে কতকগুলি নিয়মকানুন বা বিধিনিষেধের দ্বারা পরিচালিত হন [এক্ষেত্রে প্রশাসক শব্দটির দ্বারা রাজনৈতিক (Political ex- ...) এবং স্থায়ী (Permanent executive) প্রশাসক উভয়কেই বোঝায়]। কিন্তু একজন প্রশাসক যদি

নিজের ইচ্ছায় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে তাঁর উপর আরোপ করা এই বিধিনিষেধগুলি তার কাছে মূল্যহীন বলেই মনে হয়। কারণ নির্ধারিত বিধিনিষেধের দ্বারা তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তাকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করা যায় না। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, একজন দায়িত্ববান প্রশাসক অবশ্যই একজন নিয়ন্ত্রিত প্রশাসক।

সাধারণত একজন সরকারী কর্মচারী কর্মক্ষেত্রে যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গেই তার উপরে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এবং তিনি তার চাকরি জীবনে এই বিধিনিষেধগুলি মেনে চলেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একজন সরকারী কর্মচারী কাজে যোগ দেওয়া মাত্রই তাঁর উপর প্রথমেই কিছু নিয়ম আরোপ করা। তিনি সকাল দশটায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে হাজিরা দেবেন এবং বিকেল পাঁচটা অথবা পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উক্ত কর্মস্থলে উপস্থিত থাকবেন। কোন কর্মীর উপর আরোপ করা এইরূপ নিয়ম কর্মচারীকে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে বাধ্য করতে পারে কিন্তু কাজের প্রতি দায়িত্বশীল করতে পারে না। তিনি সরকারী অনুশাসন মানেন। কিন্তু তিনি কতটা কাজ করলেন তার হিসাব নিলে দেখা যাবে যে তাঁর উপস্থিতির সময়ের তুলনায় তার কার্য সম্পাদনের হার অত্যন্ত নগণ্য। অর্থাৎ তিনি শারীরিকভাবে উপস্থিত কিন্তু মানসিকভাবে তিনি সকল রকমের বাধা-বন্ধন থেকে মুক্ত। অর্থাৎ কাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠেনি। পাশাপাশি অপর একজন সরকারী কর্মচারীর উপস্থিতি এবং কাজের পরিমাণ পরিমাপ করলে দেখা যাবে যে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন তা প্রশংসনীয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কেবল সরকারী অনুশাসনই মানছেন না তিনি নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে তাঁর দায়বদ্ধতাকে যুক্ত করতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন সৎ কর্মীই নন প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে তার মত একজন কর্মীর উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কাজেই প্রশাসনের সার্থকতার পেছনে সরকারী কর্মচারীর দায়বদ্ধতা এবং কর্মীদের উপর আরোপ করা নিয়ন্ত্রণ দুটিরই গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য। অবশ্য দায়বদ্ধতার স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই কর্মীগণ আরোপিত নিয়ন্ত্রণকে স্বেচ্ছাকৃতভাবেই গ্রহণ করে থাকেন।

স্বাধীন ভারতের ন্যায় সংসদীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কর্মীগণের দায়বদ্ধতা অনেকটা সনাতন রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত। এই ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নাগরিকগণ জন প্রতিনিধি অর্থাৎ সাংসদগণকে অনুশাসন করেন। সাংসদগণ মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণকে অনুশাসন করেন এবং মন্ত্রীগণ স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দকে প্রভাবিত করেন। এই ধরনের সনাতন অনুশাসন পদ্ধতি প্রায় চার যুগ ধরে চলে আসছে। প্রশাসনিক নিয়ম নীতি এবং বিচারবিভাগীয় রীতিনীতির মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে এখনও মেনে চলা হচ্ছে।

তবে সনাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে ধরনের দায়বদ্ধতার নীতি অবলম্বন করা হয় (মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতা এবং রাষ্ট্রকৃত্যকগণের পর্দার আড়ালে থেকে নীতি নির্ধারণ করা) দিনে দিনে তা অকেজো হয়ে পড়ছে। মন্ত্রীগণের দায়বদ্ধতা এখন শুধুমাত্র নথিভুক্ত ঘটনা। সনাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ কেবল সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতেন না, কোন একটি সিদ্ধান্তের জন্য নিজেদেরকে দায়ী মনে করতেন এবং প্রয়োজনে উক্ত সিদ্ধান্তের ভুলত্রুটির জন্য পদত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। কিন্তু আজ এই ব্যবস্থা লুপ্ত প্রায়। কারণ আধুনিক মন্ত্রীগণ প্রশাসনিক দোষত্রুটির জন্য নিজেকে দায়ী করতে নারাজ। এমন কি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়েও তারা উদাসীনতা অবলম্বন করেন। বহু ক্ষেত্রে তাদের উপর আরোপ করা দায়িত্বের বোঝা প্রশাসকগণের (অর্থাৎ স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দের)

উপর চাপিয়ে দেন এবং প্রশাসকগণের দ্বারা প্রবর্তিত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই প্রশাসনিক কার্যভার সম্পন্ন করার আদেশ দেন। এবং নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত বলে মনে করেন। এই অবস্থায় আজ প্রশাসকগণের উপর আরোপ করা প্রশাসনিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা নিজেদের বিচার বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এই সকল সিদ্ধান্তের দায়িত্ব ভার বহন করেন। প্রয়োজনে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ সংসদীয় কমিটিগুলির নিকট বিশ্লেষণ করেন। কার্যত ভারতীয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সচিবগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে শুরু করে ক্যাবিনেট সচিবালয় এবং বিভাগীয় সচিবগণ সকলেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করছেন। এই ধরনের সর্বশক্তিমান প্রশাসকগণের প্রভাব প্রশাসনিক আবহাওয়াকে কেবল দুষিতই করেনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সততা এবং দায়বদ্ধতাকে বিদ্ধ করেছে। ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বা অনুশাসন যন্ত্র প্রায় অকেজো হতে বসেছে। আধুনিক যুগে প্রশাসকগণের মধ্যে বা উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রকৃত্যকগণের মধ্যে সততার অভাব এবং ক্ষমতার লিপ্সা বেড়ে যাওয়ার পেছনে এই ধরনের দায়িত্বহীন প্রশাসনিক ব্যবস্থাই দায়ী বলে মনে করলে ভুল হবে না।

এই ধরনের প্রশাসনিক অবক্ষয় এবং ক্ষমতালিপ্সা বেড়ে যাওয়ার বহু নিদর্শন ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দীর্ঘ দিন ধরে রয়েছে। তা সত্ত্বেও সনাতন প্রশাসনিক কাঠামো এবং প্রক্রিয়া পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আজও ঠিকমত উপলব্ধ হয় নি। আজও বিভাগীয় কোন নথিপত্র পর্যালোচনার প্রশ্ন দেখা দিলে মন্ত্রীগণ তা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসতে দ্বিধা বোধ করেন। আধুনিক লোক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক সংস্থার দায়িত্বভার উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে মন্ত্রীগণের উপর আরোপ করা কাজের চাপও বেড়ে গেছে।

প্রশাসনিক স্তরে এই দেশে এমন বহু নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে যেগুলি সম্পর্কে মন্ত্রীগণ ওয়াকিবহাল নন। আধুনিক যুগে প্রযুক্তিগত বিষয়ের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অনেক দায়িত্ব প্রশাসনিক প্রযুক্তিবিদগণের উপর অর্পণ করা হচ্ছে। ফলে ব্যবহারিক স্তরে মন্ত্রীগণের প্রয়োজনীয়তা প্রায় নগণ্য হয়ে পড়ছে। আজ যে ভিত্তির উপর প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে তাতে বহু জনপ্রশাসনবিদগণ জনশাসন সংস্থাকে জন আমলাতান্ত্রিক সংস্থা বলে বর্ণনা করতে পছন্দ করেন। এই অবস্থায় প্রশাসনিক স্তরে মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতা একটি অকেজো প্রথায় পরিণত হয়। তবে কোন কোন ইতিবাচক প্রশাসনবিদগণের মতে মন্ত্রীপরিষদ এবং রাষ্ট্র-কৃত্যকের যৌথ প্রচেষ্টায় উক্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।

১.৪ ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনুশাসনের পদ্ধতি

ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনুশাসনের নীতি কি ভাবে প্রয়োগ করা হয় উক্ত এককে আমরা তাই নিয়ে আলোচনা করব।

ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনুশাসন পদ্ধতিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।

(১) বাহ্যিক অনুশাসন : অর্থাৎ প্রশাসনিক কাঠামোর উপর আরোপ করা নিয়ন্ত্রণগুলি কি কি এবং কি উপায়ে এই বাহ্যিক অনুশাসন ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হয় তাই হবে এই এককের প্রতিপাদ্য বিষয়। কয়েকটি মাধ্যমের সাহায্যে প্রশাসনের উপর বাহ্যিক অনুশাসন আরোপ করা হয়। আইন বিভাগীয় অনুশাসন, বিচার বিভাগীয় অনুশাসন এবং সংসদীয় অনুশাসন, প্রশাসনের উপর জনগণের অনুশাসন বা জনগণের প্রতি প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি।

এই সমুদয় বিষয়গুলিকে আইন বিভাগের, বিচার বিভাগের, সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া হিসাবেই অবশ্য দেখা হয়ে থাকে।

(২) আভ্যন্তরীণ অনুশাসন ঃ প্রশাসনের উপর আরোপ করা আভ্যন্তরীণ অনুশাসন হল প্রশাসনিক কাঠামোগত অনুশাসন। এই পর্যায়ে একজন প্রশাসকের আচরণবিধি কি ধরনের হওয়া উচিত তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

যে দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের প্রশাসনিক অনুশাসন আরোপ করা হয় তা হলো ঃ (১) আনুষ্ঠানিক অনুশাসন; (২) অনানুষ্ঠানিক অনুশাসন

১.৫ বাহ্যিক অনুশাসন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুলত আইন বিভাগীয় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে প্রশাসনের উপর আইনী অনুশাসন প্রয়োগ করা হয়।

১.৫.১ আইন বিভাগীয় অনুশাসন

শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগের দ্বারা প্রয়োগ করা অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ নীতিকে প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক অনুশাসন বলেই ব্যাখ্যা করা হয়। কারণ আমরা সকলেই জানি যে, লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যগণ সাধারণত প্রশাসনিক দায়িত্বভার পরিচালনা করেন, কাজেই উক্ত ক্ষেত্রে আইনী অনুশাসন বলতে সরকারী দলের উপর বিপক্ষ দলের রাজনৈতিক চাপকেই নির্দেশ করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে দলীয় নিয়ন্ত্রণকেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হয়ে থাকে।

মধ্যযুগীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় একটি সনাতন ধারণা ছিল যে আইন বিভাগের প্রধান কাজ হল আইন প্রণয়ন করা। এই ধারণা আজ এখন আর বৃহত্তর অর্থে কার্যকরী নয়। কারণ আইন প্রণয়ন ছাড়াও সরকারী কার্যাবলীর উপর কড়া নজর রাখা এবং সরকারী সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা আধুনিক যুগে আইন বিভাগের একটি অন্যতম কাজ। আইন প্রণয়ন এখন রাজনৈতিক শাসন বিভাগের ইচ্ছাধীন। তবে তা আইন বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষ। আইন প্রণয়ন আইন বিভাগের অনেক কাজের মধ্যে একটি কাজ।

প্রশাসনের উপর আইনী অনুশাসন প্রসঙ্গ সম্পর্কে দুটি ধারণার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমটিকে সাধারণ রাজনৈতিক অনুশাসন বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, অথবা একে সরকারী কার্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বলেও বর্ণনা করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক অনুশাসন হল সরকারী কার্যাবলী পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাকে মেনে নেওয়া অথবা তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা। Westminster এর ধাঁচে তৈরি করা যে সকল দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামো যে সকল দেশে গৃহীত হয়েছে সেখানে আইন বিভাগ মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতার নীতির মাধ্যমে বা অনাস্থা প্রস্তাব প্রয়োগ করার অজুহাতে প্রশাসনের উপর তার অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ জারি রাখতে পারে। কারণ আমরা সকলেই জানি যে মন্ত্রীপরিষদের স্থায়িত্ব সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থার উপর নির্ভরশীল। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় এই ধরনের অনুশাসন পদ্ধতিকেই রাজনৈতিক অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়।

২) সংসদীয় অনুশাসন ব্যবস্থার দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সরকারী কার্যাবলীর উপর সংসদীয় অনুশাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। এই ধরনের অনুশাসন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের শুরুতেই আরোপ করা যেতে পারে অর্থাৎ কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বেই উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করা যায়। এছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সেই সিদ্ধান্তের দোষত্রুটিগুলি পর্যালোচনা করা যায় অর্থাৎ এই ধরনের অনুশাসনের মাধ্যমে সরকারী দলকে নিজ পদে বহাল থেকে প্রশাসন পরিচালনা করার সুযোগ প্রদান করা হয় এবং প্রশাসনিক স্তরে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সাহায্য করা হয়। তবে প্রশাসনিক স্তরে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তা খোলাখুলি করা হবে এবং প্রশাসকগণ তাদের প্রশাসনিক বক্তব্য দৃঢ়ভাবে পেশ করতে সক্ষম হবেন। নিম্নে উল্লেখ করা লাইন কয়টির মাধ্যমে প্রশাসনের উপর আইন বিভাগের অনুশাসনের মূল অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব।

Barnard Crick নামক প্রশাসনবিদের মতে আইন বিভাগীয় অনুশাসন হল প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করা নয়। অনুশাসন হল উপদেশ প্রদান করা, নির্দেশ করা নয়। অনুশাসন অর্থাৎ ব্যাখ্যা করা, বাধা সৃষ্টি করা নয়। অনুশাসন হল অনুধাবন করা, নতুন কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা নয়। অনুশাসন হল প্রচার করা গোপনীয়তা বজায় রাখা নয়। সংসদীয় অনুশাসন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য সরকারী কাজের সাহায্য করা বাধা সৃষ্টি করা নয়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উপর কল্যাণমূলক কার্যাবলীর চাপ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সংসদীয় হস্তক্ষেপ অনেকটা কমে এসেছে। "ইদানীং কল্যাণমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংসদের অনুশাসন মূলক ভূমিকার পরিবর্তন অত্যন্ত লক্ষণীয়।" উক্ত ব্যবস্থায় "সংসদের দায়িত্ব হ'ল প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিদর্শন করা", তবে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশাসনের উপর সংসদের অনুশাসন পূর্ব প্রচলিত অনুশাসন নীতির দ্বারাই পরিচালিত । এক্ষেত্রে সংসদীয় Estimate বা হিসাব সংক্রান্ত কমিটি এবং হিসাব সংরক্ষক কমিটি বা Public Accounts Committee অর্থ তহবিলের উপর কড়া নজর রাখে। এই কমিটিগুলি প্রশাসনিক বিভাগগুলির আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে প্রয়োজনে প্রশাসকগণকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। এই কমিটি দুটি ছাড়াও আর যে সকল কমিটির মাধ্যমে আইন বিভাগ প্রশাসনের উপর নজরদারি করে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত কমিটিগুলি অগ্রগণ্য (১) Committee on Government Assurance বা সরকারী নিশ্চয়করণ কমিটি (২) Parliamentary Select Committee on Legislation বা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদীয় নির্বাচিত কমিটি (৩) নিম্নতর আইন বিভাগীয় কমিটি বা Committee on Subordinate Legislation (৪) আবেদন কমিটি বা Petition Committee প্রভৃতি। (See for details, Chaudhuri's, *Legislative Control*, etc.)

এই কমিটিগুলি নিজ নিজ এলাকায় বহাল থেকে প্রশাসনিক কার্যাবলীর উপর কড়া নজর রাখে। তবে আইন বিভাগীয় অনুশাসন দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার রীতি রয়েছে ভারতবর্ষে তা প্রচলিত নয়। ফলে প্রশাসনিক কার্যাবলীর উপর অবিরত নজরদারি করা সম্ভবপর হয় না। ভারতীয় কমিটি ব্যবস্থার প্রায় সবটা ব্রিটেনের পার্লামেন্টের ধাঁচে গড়ে উঠেছে। তবে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতে কিছু নতুন কমিটি সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলি সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় ব্যবস্থার উদ্ভাবন। আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থার দেশীয় অবদান।

১.৫.২ সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে প্রশাসনিক যন্ত্রের উপর অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ

ভারতে সাম্প্রতিককালে প্রশাসনের উপর সংসদের অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়তর করার প্রচেষ্টা চলছে। তাছাড়া প্রশাসনিক নীতিগুলি পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে সংসদীয় কর্মসূচী নিরূপণ করা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। তবে প্রশাসনিক কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান এবং রীতিনীতিগুলি সংশোধনের প্রশ্নে সাংসদগণের মনোভাব অনেকটা অস্পষ্ট। যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ভারতীয় সাংসদগণ উপভোগ করেন কিনা সে বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন স্থির ও নিশ্চিত ধারণা গড়ে ওঠে নি। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাংসদগণ কোন আলোচনার উত্থাপন করেন না। উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন আলোচনার সূত্রপাত হলেও বিষয়টিকে সন্তর্পণে এড়িয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সেনেটরগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অবশ্যই জানা যাবে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম স্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটরগণ বিজয়ীদলের সাথে মিলিত হন এবং যুদ্ধশেষে সন্ধিচুক্তি স্থাপনের প্রথম স্তরে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন (উইলসন চুক্তি প্রস্তাবিত উক্তির পক্ষে একটি উদাহরণ)। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসনিক বিষয়ের উপর অনুশাসনের একমাত্র হাতিয়ার হ'ল জনপ্রতিনিধি সভা। কাজেই প্রতিটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে এই সংস্থার মতামত যত্ন সহকারে অনুধাবন করা প্রয়োজন এবং তাদের মতানুসারে প্রশাসনিক নীতিনির্ধারণ করাই কাম্য।

অনেকেই মনে করেন যে, সংসদীয় অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ প্রণালী আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজনীয় কিন্তু অবিতর্কমূলক বিষয়গুলিকে দলগত আলোচনায় অংশ হিসাবে গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়াও সংসদে আলোচ্য কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে দলগত মনোভাব অগ্রাহ্য করাই কাম্য। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সব দলই মিলিতভাবে আলোচনায় বা সমালোচনায় যোগদান করবে এটাই কাম্য। প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলগত মনোভাব বা দ্বন্দ্ব কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করবে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ইদানীং কালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদে প্রস্তাবিত হয়েছে। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রস্তাবিত বিলগুলি জনগণের মনোভাবের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করবে তা বিবেচনা করেই প্রস্তাবিত বিলগুলি সাংসদগণের দ্বারা সমর্থিত বা অসমর্থিত হচ্ছে। সংসদে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল এদের মধ্যে অন্যতম। মহিলা বিলটির গুণাগুণ সম্পর্কে সাংসদরা অবশ্যই সচেতন। কিন্তু প্রস্তাবিত বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পায়নি কারণ সংসদের উভয় কক্ষের বহু পুরুষ সাংসদ এই বিলটির বিপক্ষে। অনুমান করা বোধ হয় ভুল নয় যে, নিজ নিজ সংসদীয় আসন হারানোর আশংকাই বেশ কিছু সাংসদের মহিলা বিলের প্রতি এক্ধরনের নেতিবাচক মনোভাবের কারণ।

শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব উঠেছে। এই প্রস্তাবে যে সকল বিষয় উত্থাপিত হয়েছে তা এরূপ : (১) শিক্ষাকে ১৯(১) নম্বর ধারার অন্তর্ভুক্ত করা। (২) এই প্রস্তাবে নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত ৪৫ নম্বর ধারাকে সংশোধিত করে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা। এই ব্যবস্থার ৫ বছর বয়স থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটি বালক বালিকার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা। (৩) এই ব্যবস্থায় আবার প্রস্তাবিত হয়েছে যে যদি কোন পিতামাতা তার শিশুকে অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

যেহেতু উক্ত বিলটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিল। এই বিলটি সংসদে উত্থাপিত হলে পাশ করানো দুরূহ হবে না। কিন্তু প্রস্তাবিত বিলটিতে কতগুলি অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব রয়েছে (১) ৫ বছর থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন দরিদ্র পরিবারের শিশুগণের বিদ্যালয়ে যোগদান করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে কারণ ভারতের মত দরিদ্র দেশে এমন বহু পরিবার আছে যেখানে শিশুগণ তিন বছর বয়স থেকেই মাতা পিতার সঙ্গে রোজগারে সামিল হয়। ফলে অর্থ উপার্জন করার সুযোগ একবার গ্রহণ করলে তারা আর বিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করবে না। (২) আদি প্রাথমিক স্তরে শিশুগণকে যে পুষ্টিজনক খাদ্য বিতরণ করা হয়ে থাকে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ এই আইনে আদি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করা হয়নি। (৩) এই ধরনের প্রস্তাবে ছাত্রীগণের বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতাগুলি দুর করার ব্যবস্থা করা হয়নি, অর্থাৎ বিদ্যালয়ের সুস্থ পরিবেশ সম্পর্কে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে মূক। (৪) শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করার জন্য পিতামাতার শাস্তির ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিপক্ষে। এই ধরনের স্পর্শকাতর প্রস্তাব খুব সহজেই অনুমোদিত হয়ে আসতে পারে কিন্তু এই বিল প্রণয়নের ফলে সামাজিক অবস্থার অগ্রগতি নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত নির্দেশিত দুটি বিলই সংসদীয় অনুশাসন ব্যবস্থায় ত্রুটিগুলিকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বিল দুটি উল্লেখ করা হল।

সংসদীয় সদস্যগণের অবশ্যই মনে রাখা কর্তব্য যে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রকৃত অনুশাসন প্রয়োগ অথবা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হলে দলগত মনোভাব বর্জন করা উচিত কিনা অথবা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নির্দলীয় মনোভাব বজায় রেখে সিদ্ধান্তের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা কতদুর সম্ভব তার বিচার বিবেচনা প্রয়োজন। কারণ দলগত মনোভাব পোষণ করা সংসদীয় ব্যবস্থায় নৈতিক স্তরে বিতর্কমূলক হলেও, জরুরী।

ইদানীংকালে ব্রিটিশ কমন্স সভায় এই ধরনের নির্দলীয় আলোচনার পথ সুগম করে দেওয়া হয়েছে। যে সকল বিষয়ের উপর নিঃস্বার্থ আলোচনার এবং নির্দলীয়ভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে সেই সকল বিষয়গুলি এরূপ ঃ (১) ইউরোপীয় অর্থ সংক্রান্ত কমিটিতে ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তি; (২) গর্ভপাত সম্পর্কিত আইন; (৩) প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব; (৪) রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত নাটকের উপর সরকারী অনুমোদন; (৫) বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় এই ধরনের পদক্ষেপ সরকারী সিদ্ধান্তের উপর নীতিগত অনুশাসন আরোপ করতে পারে কিনা তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

সংসদে উত্থাপিত সরকারী বিলগুলি সম্পর্কে আলোচনা হলে সাধারণত সরকারী সদস্যগণ উত্থাপিত বিলটির উপর পাঁচমিশালি আলোচনা চালিয়ে যেতে উৎসাহ প্রদর্শন করেন, কারণ এ ক্ষেত্রে বিলটির উপর স্তর ভিত্তিক আলোচনা করার সুযোগ থাকে না, তাছাড়া স্তর ভিত্তিক আলোচনা উত্থাপিত হলেও বিলটির উপর পূর্ণ ভোটের প্রশ্নে সরকারী এবং বেসরকারী দল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। যেহেতু সরকারী দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা উপভোগ করে তাই বিলটি পাশ হয়ে যায়। বিলটির গুণাগুণ সম্পর্কে জনগণ বা সাংসদগণ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞই থেকে যান। সংসদীয় অনুশাসন ব্যবস্থার এই ধরনের চরিত্রই প্রশাসকগণকে নির্ভীকভাবে বিভিন্ন কেলেঙ্কারির সঙ্গে হাতমেলাতে প্রবৃত্ত করে।

আধুনিক সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের উপর সংসদীয় অনুশাসন আরও দৃঢ় করার প্রশ্ন উঠছে। সংসদীয় অনুশাসনের হাতিয়ার আরও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সংসদের অভ্যন্তরে একজন স্থায়ী পরামর্শদাতা বা একটি

সংসদীয় কমিশন গঠন করার কথাও বলা হয়েছে। কারণ উক্ত সংস্থাগুলির উপস্থিতি অনুশাসনের পদ্ধতিগুলিকে আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে সাহায্য করবে এবং প্রয়োজনে উন্নত ধরনের অনুশাসন ব্যবস্থা প্রচলন করতে সক্ষম হবে। ইদানীংকালে একটি গবেষণার ফলে স্থির করা হয়েছে যে সংসদীয় অনুশাসন বহাল রাখার উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী দপ্তর গঠন করা যেতে পারে এবং এই দপ্তরটিকে সংসদীয় সচিবালয়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। কারণ এই ব্যবস্থায় সংসদীয় অনুশাসন নিশ্চিত করা যাবে এবং প্রশাসনিক সংস্থার উপর প্রকৃত অনুশাসন বজায় রাখা সম্ভব হবে।

সংসদের কার্যকরী উত্থাপিত বিষয়গুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে সাংসদগণের মধ্যে সিংহভাগ সদস্যই কোন আলোচনায় যোগদানে উৎসাহী নন। তাছাড়া তাঁরা তাদের বরাদ্দ সময় সংসদীয় কমিটি বা অন্যান্য কমিটির উপস্থিত থেকে নষ্ট করেন। বিপক্ষদলের সদস্যগণ বা পেছনের বেঞ্চের সদস্যগণ আবার নিজেদের উপেক্ষিত মনে করেন বলে বহু প্রয়োজনীয় আলোচনায় যোগদান করেন না। সংসদীয় অনুশাসন পদ্ধতিতে এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা প্রশাসনিক সংস্থাকে কিছুটা স্বৈরাচারী করে তোলে। তার ফলে অনুশাসনের ক্ষেত্রে গঠনমূলক মনোভাবের অভাব প্রকৃত অনুশাসনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

১.৬ আভ্যন্তরীণ অনুশাসন

আভ্যন্তরীণ অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীগণের দায়বদ্ধতা দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত। প্রথম পদ্ধতিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অধস্তন কর্মচারীর কার্যাবলীর উপর তদারকি করেন এবং বিভাগীয় কার্যাবলীর উপর নজর রাখেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটি বিভাগীয় পদাধিকারী প্রধান অপর একটি পদাধিকারীর কাজের উপর তদারকি করেন। তাদের কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। এই ধরনের অনুশাসন সমান্তরালভাবে (horizontal) বা উল্লম্বভাবে (vertical) পরিচালিত হয়।

প্রথম ধরনের আভ্যন্তরীণ অনুশাসন অনেকটা আনুষ্ঠানিক যেমন উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ নিম্নস্তরের কর্মচারীকে নির্দেশ দেন। তার আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি রাখেন। উপদেশ প্রদান করেন, তদারকি করেন, পরিদর্শন করেন এবং মূল্য নির্ধারণ করেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, প্রয়োজনে শাস্তি প্রদান করেন। এই ধরনের প্রশাসনিক অনুশাসনের ব্যবস্থা সাধারণত আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। এই ধরনের অনুশাসন পদ্ধতি বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে তার নিম্নস্তরের কর্মীগোষ্ঠীর সম্পর্কের মধ্যে পরিচালিত হয়। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে এই ধরনের অনুশাসন উচ্চপদস্থ কর্মীর সঙ্গে তার অধস্তন কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের আনুষ্ঠানিক অনুশাসন ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় কাজের এলাকা বা সীমানা নির্ধারণ, দেয় অর্থের সদ্ব্যবহার এবং কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের অনুশাসন পদ্ধতিকে প্রতিষেধক (preventive) পদ্ধতি বলা যেতে পারে। (১) কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পরে কাজটি নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তাকে বলা হয় দণ্ডমূলক অনুশাসন (punitive) ব্যবস্থা। এই ধরনের অনুশাসন পদ্ধতি যে সকল মাধ্যমের দ্বারা গ্রহণ করা হয় তা হলো, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, টাকার হিসাব গ্রহণ করা, কাজের বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

অনুশাসনের প্রতিষেধক পদ্ধতিটি সাধারণত সমান্তরাল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই প্রচলিত। এই ধরনের অনুশাসন পদ্ধতি সকল বিভাগের ক্ষেত্রে একই ভাবে প্রচলিত। যেমন ব্রিটেনের ট্রেজারি বিভাগ (রাজস্ব বা অর্থের ভারপ্রাপ্ত বিভাগ) এবং ভারতের অর্থ দপ্তর এই ধরনের প্রতিষেধকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ভারত সরকারের অর্থ ক্ষমতা সংক্রান্ত আইন ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৭৫-৭৬ দ্বারা সরকারী ব্যয়ভার সংক্রান্ত বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে। অনুদান গ্রহণ করার অনুমতি দেয়। সরকারী আয় সংক্রান্ত বিষয়ে বা বৃত্তি প্রদান করার বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত কর্মচারী বিভাগ বা প্রশাসনিক সংশোধনী বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিটি বিভাগের জন্য এই ধরনের নিয়োজন, প্রশিক্ষণ, পদোন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সঙ্গতিপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করে। অন্য দিক দিয়ে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন সাধারণ উন্নয়নমূলক নীতিনির্ধারণে হস্তক্ষেপ করে। বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনামূলক বা উন্নয়নমূলক কার্যভার গ্রহণে সাহায্য করে।

(২) সরকারি ক্ষেত্রে যে সকল দণ্ডমূলক সংস্থা দ্বারা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখা হয় সেই সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম সনাতন সংস্থা হল Comptroller and Auditor General বা (CAG)। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় সরকারী তহবিল-এর ব্যয়ভার নিরীক্ষণ করা। সরকারী অর্থের অপচয় বন্ধ করা। সরকারী নির্দেশনামা না মেনে টাকা ব্যয় করা বা আত্মসাত করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা।

অনুশীলনী : ১) অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায়? অনুশাসন কয়প্রকার? ২) রাজনীতিক অনুশাসন ও সরকারী কর্মী অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে? ৩) অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ কিভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে? ৪) রাজনীতিক অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয়ে ওঠে না কেন, উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

১.৬.১ দুর্নীতি নিরোধক সতর্কীকরণ সংস্থার ব্যবস্থা

ভারত সরকারের অধীনে দুর্নীতি নিরোধক কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ দুটি সংস্থা আছে। যেমন কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ বা Central Vigilance Commission এবং কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থা বা Central Bureau of Investigation। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে শান্তানাম কমিটির (Santhanam Committee) সুপারিশক্রমে গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ সংস্থার মূল দায়িত্ব হ'ল সরকারী কর্মচারীদের সততা সম্পর্কে সচেতন থাকা। সাধারণত এই সংস্থাটি একটি অনুযোগ গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে। সতর্কীকরণ আয়োগের নিকট বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের বিপক্ষে আসা অনুযোগগুলিকে খতিয়ে দেখাই হ'ল এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। তবে ভারতবর্ষের মত সনাতনপন্থী দেশে বিভাগীয় দপ্তরের পদাধিকারীগণের এবং সার্বিক প্রশাসনিক সচিবগণের অদৃশ্য হস্তক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রে সতর্কীকরণ সংস্থার স্বাধীন সত্তাকে দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া মন্ত্রীদের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব তাদের কাজে বাধা সৃষ্টিও করে থাকে। ফলে সতর্কীকরণ আয়োগের কাজে অস্বাভাবিক দেরি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দোষী কর্মচারীদের বিপক্ষে আনা অনুযোগের শাস্তি হিসেবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান আয়োগ (Central Bureau of Investigation)- এর মূল দায়িত্ব হ'ল ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইন বা নিয়মাবলী অনুসারে কালোবাজারী, মদতদারী এবং লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তির উপর কড়া নজর রাখা। তাছাড়া এই সংস্থার আরও একটি কাজ হ'ল দেশজুড়ে গুপ্তচর নিয়োগ করা এবং দেশের ভিতর বিশেষ ধরনের অপরাধ সম্পর্কে সতর্কীকরণ করা ও খবরাখবর সংগ্রহ করা। ইদানীং কালে ভারতে সরকারের অধীনে "ওমবুডস্‌মান" জাতীয় সংস্থা গঠনের চেষ্টা চলছে। "ওমবুডস্‌মান" শব্দটি পশ্চিম ইয়োরোপ এবং বিশেষ

করে স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলির সরকারী দুর্নীতি নিরোধক ব্যবস্থার প্রয়োগগত রূপ। ব্রিটেনে এই ওমবুডসমান হলো পার্লামেন্টারীয় কমিশনার। এই ব্যবস্থার অনুকরণেই ভারতে "লোকপাল" কেন্দ্রীয় স্তরে এবং "লোকায়ুক্ত" রাজ্যস্তরে প্রবর্তন করা চেষ্টা চলছে গত তিন দশক যাবৎ। ওমবুডস্মান গঠন করার মুল উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতার অপব্যবহারের বিপক্ষে নালিশ গ্রহণ করা। তবে এই ওমবুডস্মান বা লোকপাল গঠন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন বিল সংসদে উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এখনও এই বিল সরকারী অনুমোদন লাভ করেনি। কাজেই কেন্দ্রীয় স্তরে এই সংস্থা গঠন করা সম্ভব হয়নি। বিলের প্রকৃতি, প্রসার এবং কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে প্রচণ্ড রাজনৈতিক মত-দ্বৈধতায় এই বিল লোকসভায় শুধু উত্তাপই সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে লোকায়ুক্ত নামে দু-একটি সংস্থা রাজ্যস্তরে গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এই সংস্থাগুলি এখনও কোন ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

প্রশ্নমালা : ১) দুর্নীতি নিরোধক বা সতর্কীকরণ সংস্থার প্রয়োজন কেন? ২) সতর্কীকরণ সংস্থাগুলি ভারতবর্ষে কি রূপ? কেন? ৩) সতর্কীকরণ সংস্থার কাজের পরিধি কি রূপ?

১.৭ সামাজিক পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণ

ভারতীয় সামাজিক অবস্থায় আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর উপর, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সম্ভব হয়নি কারণ এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কতগুলি অন্তরায় রয়েছে।

এগুলো হলো :

১.৭.১ সাংস্কৃতিক বিরোধ

ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক কাঠামো উনিশ শতাব্দীর ব্রিটিশ রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত। এই ব্যবস্থা নতুন প্রশাসনিক রীতিনীতির পরিপন্থী। ভারতীয় প্রশাসনিক নিয়মকানুন, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা সবই প্রায় ব্রিটিশ নিয়মকানুন বা ব্যবস্থার প্রসার।

ভারতে প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে এবং প্রকরণগত দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে যথেষ্টই। তবে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে যে নতুনত্বের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল তা পরিপূর্ণ হতে পারে নি। সামাজিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে অনড় কিছু বাধা এখনো রয়ে গেছে। হয়ত সংস্কৃতিগত কারণেই এই বাধার মূলোচ্ছেদ এখনও সম্ভব হয়নি।

১.৭.২ রাষ্ট্রকৃত্যকগণের সামাজিক ভিত্তিজনিত সমস্যা

ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থা এক অসম সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে রেখেছে।

ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার ন্যায় ভারতীয় উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রকৃত্যকগণ অর্থাৎ উচ্চবর্গীয় আমলাগণ এখনও অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি বলে গণ্য হয়ে থাকেন। তাদের উপর আরোপ করা রীতিনীতিগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে প্রায় সবটুকু নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা তাদেরই হাতে। নীতিগতভাবে একজন রাষ্ট্রকৃত্যক বা উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা তার দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বাধ্য। কিন্তু কার্যত তা হয় না এবং নিয়মবহির্ভূত কাজের জন্য তারা শাস্তিও পান না। রাষ্ট্রকৃত্যকের বা সরকারী প্রশাসন পরিচালনার নিয়মকানুনগুলি যতই ন্যায়পরায়ণতা

এবং সমতার নীতির উপর নির্ভরশীল হোক না কেন কার্যত সেগুলি কিছু অধরা আদর্শ রূপায়ণের নিয়মাবলী মাত্র। ভারতীয় প্রশাসকগণ আত্মসুখসন্ধানী। প্রায়শই জনগণের প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন। গোপনীয়তা তাদের নিকট সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জনমতের কোন স্থান নেই। যেহেতু ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ওয়েবারীয় (Weber) নীতির উপর নির্ভরশীল তাই প্রশাসনিক পরিকাঠামো ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস বা (Hicarchical System) দ্বারা পরিচালিত। ফলে অনমনীয়তা ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু আমলাগণের মধ্যে সম্পর্কে বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতার স্থান নেই তাই প্রশাসনিক কাঠামো অনেকটা দমনমূলক নীতির দ্বারা পরিচালিত। এই ধরনের সনাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেবলমাত্র প্রশাসনিক রীতিনীতির পরিপন্থীই নয় তা আমলাগণের উপর আরোপ করা নিয়ন্ত্রণ নীতির অন্তরায়। প্রকৃত অনুশাসনের অভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কেলেঙ্কারি (scam) ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করেছে।

১.৭.৩ প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাঠামোগত সমস্যা

ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার আরেকটি অন্তরায় হ'ল তার কাঠামোগত চরিত্র। এই ব্যবস্থা কেন্দ্র এবং রাজ্যস্তরে এমনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে প্রযুক্তিগত দিক থেকে সাধারণ কর্মীর সংখ্যা বিশেষজ্ঞদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। ফলে লাজুক, অকর্মণ্য, স্বার্থপর ও স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয় কর্মচারীর সংখ্যা অচিন্তনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত উদ্যোগী, কর্মঠ এবং ন্যায়নীতিজ্ঞ প্রশাসকের সংখ্যা কমে এসেছে। এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব।

১.৮ সারাংশ

অতঃপর বলা যেতে পারে যে সরকারী কার্যভার পরিচালনার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা একজন কর্মচারীকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা দক্ষতা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িত্বভার সম্পন্ন করা পথে বাধা সৃষ্টি করে তা হলো নিয়ম ও পদ্ধতির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা। সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যগুলিতে সর্বাগ্রে যে বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হ'ল পারদর্শিতা বা দক্ষতা। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যগুলির ক্ষেত্রে একজন দক্ষ কর্মী আইনী সিদ্ধান্ত অপেক্ষা যুক্তিবাদী নীতির উপর বিশেষ নজর দেন। কিন্তু সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে আইন এবং নিয়মকানুনই প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার প্রথম স্তর। ফলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এছাড়াও প্রশাসনিক স্তর বিন্যাসের ব্যবস্থা নিম্নস্তরের কর্মীগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে বাধার সৃষ্টি করে। প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশই প্রয়োজনীয়। ফলে বিভাগীয় প্রধানের উপর চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের বোঝা এতই বেড়ে যায় যে সকল বিষয়কে তিনি সমান গুরুত্ব দিতে পারেন না। এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রদানেও অতিরিক্ত সময় নষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা প্রয়োজনীয় নথিপত্র পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসে যে যদি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করতে অস্বাভাবিক দেরি না হতো তবে জাতীয় তহবিলে আরও ১,২০,০০০ কোটি টাকা জমা পড়ত। রপ্তানি ব্যবসা থেকে জমা পড়ত ৯৬,০০০ কোটি টাকা। খাদ্য উৎপাদন আরও ৫৪ লক্ষ টন বেড়ে যেত, অসংখ্য বেকারের চাকরির সংস্থান হতো এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় আরও তিন গুণ বেড়ে যেত। কর্মচারীদের মধ্যে কাজের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করেছে ভারতীয় নাগরিকগণের মধ্যে এই বিশ্বাসই সৃষ্টি হচ্ছে যে

ভারতীয় সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো প্রায় অসম্ভব। ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণী, রাজনীতিক আমলা অথবা শিক্ষক শ্রেণীর নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটেছে। জনগণের মধ্যে অনৈতিক কার্যাবলীর প্রতি দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। প্রশাসকগণ এমনভাব স্বজনপোষণ, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন যে তারা উন্নততর সামাজিক অবস্থায় নিজেদের উন্নীত করতে অসমর্থ প্রায়। এই ধরনের দ্রুত সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে প্রশাসনিক অনুশাসন ব্যবস্থা বা নিয়ন্ত্রণ প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে প্রশাসনিক কর্মচারীর উপর আরোপ করা নীতিসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে সকল সংস্থা গঠন করা হয়েছিল সেগুলি কার্যকরী থাকছে না বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

আজকের ভারতের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দের সামনে যে সামাজিক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে সেই অবস্থার উন্নতির একমাত্র পথ হ'ল প্রশাসনিক রীতিনীতি উন্নত করা। প্রশাসকের দায়িত্বভার আরও বিস্তৃত করা, রাজনৈতিক পরিবেশ দূষণ মুক্ত করা এবং প্রশাসনিক কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সরিয়ে নেওয়া।

১.৯ অনুশীলনী

১) সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ-এর সম্পর্ক কি?

২) আমাদের শাসনব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কতটুকু সার্থক?

৩) যে যে কারণগুলির জন্য নিয়ন্ত্রণ বা অনুশাসন প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়ে ওঠেনি, সেই কারণগুলি কি?

৪) বিশেষ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আমলা শ্রেণীর ভূমিকা কিভাবে দেখা হয়ে থাকে?

৫) দুর্নীতির সঙ্গে আমলা শ্রেণী ও রাজনীতিকদের সম্পর্ক কি ভাবে গড়ে ওঠে?

৬) প্রকৃত অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে প্রশাসন পরিচালনা শর্ত কি?

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1) Bernard Crick, *The Reform of Parliament*, (London, Weidenseld Nicolson, 1968), pp. 79-80.

2) Amiya K. Chaudhury, *Legislative Control Over Public Administration*, Minerva, 1993.

3) R. B. Jain, O. P. Dwivedi (eds.), *Public Service Accountability – A Comparative Perspective*, Kumaran Press, Delhi 1988.

একক ২ □ শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ নিয়মানুবর্তিতার অর্থ বা সংজ্ঞা

২.৩ ভারতে সরকারী কর্মচারী ও আচরণবিধি

২.৪ সরকারী নীতি-নিয়মভঙ্গকারী কর্মীবৃন্দকে শাস্তিপ্রদান

২.৪.১ অনানুষ্ঠানিক শাস্তিদান

২.৪.২ আনুষ্ঠানিক শাস্তিদান

২.৪.৩ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণকারী সংস্থা

২.৪.৪ সমালোচনা

২.৫ সারাংশ

২.৬ অনুশীলনী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন --

- নিয়মানুবর্তিতার প্রকৃত অর্থ এবং সংজ্ঞা
- ভারতে সরকারী কর্মচারীদের আচরণবিধি
- সরকারী নীতি নিয়মভঙ্গকারী কর্মীবৃন্দের শাস্তিপ্রদান
- আনুষ্ঠানিক নিয়মানুবর্তিতা
- শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণকারী সংস্থা
- সমালোচনা
- উপসংহার।

২.১ প্রস্তাবনা

প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে প্রশাসকগণের উপর যেমন কিছু বাধা নিষেধ, কিছু শৃঙ্খলা আরোপ করা হয়, ঠিক তেমনি প্রশাসনিক কাজকর্ম সময়মত সম্পন্ন করার জন্য এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের উপর কতগুলি নিয়মকানুন আরোপ করা হয়। এই নিয়মকানুনের অনুবর্তী হয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম করার প্রক্রিয়াই প্রশাসনিক নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙখলা।

২.২ নিয়মানুবর্তিতার অর্থ বা সংজ্ঞা

একজন নিয়মানুবর্তী প্রশাসক তিনিই যিনি দায়িত্বভার পরিচালনার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক এবং তার উপর প্রদান করা দায়িত্ব তিনি সময়মত সম্পন্ন করতেই অভ্যস্ত। সময়মত কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা এবং প্রদেয় দায়িত্বভার সম্পন্ন করে যথা সময়ে কর্মস্থান ত্যাগ করা একজন নিয়মানুবর্তী প্রশাসকের ধর্ম। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশাসকের উপস্থিতি কেবলমাত্র প্রশাসনিক সংস্থার স্বার্থেই প্রয়োজনীয় নয়। অধস্তন কর্মচারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বা নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা প্রদান করার জন্য এবং সরকারী সংস্থাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্যেও এই ধরনের প্রশাসনিক উপস্থিতি প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একজন সরকারী পদাধিকারী যদি তার সংস্থায় সময় মত হাজিরা দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকেন তবে তার অধস্তন কর্মচারীগণও সেই বিষয়ে সতর্ক হবেন এবং সময়মত কাজে আসতে চেষ্টা করবেন। কাজেই একজন নিয়মানুবর্তী প্রশাসকের ভূমিকা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের দেশে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত কর্মীগণের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা শব্দটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ। উক্ত প্রতিষ্ঠানে যে বিষয়ের উপর সর্বাপেক্ষা বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয় তা হল নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবদ্ধতা। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের বক্তব্যকে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদেশ বলে মনে করেন। উচ্চস্তর থেকে কোন ধরনের নির্দেশ বা আদেশ পাওয়া মাত্রই তাঁরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কাজেই ব্যবহারিক জগতে নিয়মানুবর্তিতা শব্দটির গুরুত্ব নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে আমরা সামরিক নিয়মানুবর্তিতা বা Military discipline শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। কারণ নিয়মানুবর্তিতা এবং সামরিক বাহিনী শব্দ দুটি শুধু ওতপ্রোতভাবে জড়িতই নয়, একটি অপরটির পরিপূরকও বটে। একজন নিয়মানুবর্তী প্রশাসক প্রশাসনিক সংস্থার একটি বিশেষ সম্পদ। প্রশাসক বা সংস্থার সঙ্গে সংলগ্ন কর্মীবৃন্দের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবদ্ধতা আরোপ করা প্রশাসনিক সংস্থার কার্যাবলীর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সরকারী কর্মচারীগণের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধতা বা নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারী সংস্থাগুলিতে বিশেষ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই নীতি-নিয়মগুলি বা বিধিনিষেধগুলি প্রশাসকগণ বা উক্ত সংস্থার সঙ্গে জড়িত কর্মচারীগণ মেনে চলতে বাধ্য। যদি কোন একজন সরকারী কর্মচারী প্রশাসনিক রীতিনীতি বহির্ভূত কোন কাজ করেন তবে তাকে শাস্তি প্রদান করারও ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, শাস্তি পাবার ভয়েই প্রশাসকগণ নিয়মানুবর্তিতার নীতি মেনে চলেন এবং প্রশাসনিক সংস্থা দ্বারা আরোপ করা সরকারী রীতি ও নিয়মগুলির মধ্যে থেকেই প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালনা করেন।

নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবদ্ধতার নীতি কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বেসরকারী সংস্থাগুলিও নিয়মানুবর্তিতার নীতি কর্মীগণের উপর আরোপ করে থাকে। তবে তাদের ক্ষেত্রে আরোপ করা নিয়মানুবর্তিতার নীতি অত্যন্ত কঠোর। কোন কর্মীর উপর আরোপ করা নিয়মানুবর্তিতার নীতি লঙ্ঘন করার দায়ে সেই কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হতে পারে।

সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আরোপ করা নীতিসমূহ যদিও এতটা কঠোর নয় তবুও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে একজন কর্মীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। কাজেই সকল সংস্থায় কর্মচারীদের উপর কিছু কিছু নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আরোপ করে তাদেরকে প্রকৃত নিয়মানুবর্তিতার নীতি মেনে চলতে বাধ্য করতে চেষ্টা করে।

সরকারী কর্মচারীগণের উপর আরোপ করা নিয়মানুবর্তিতার নীতিগুলি সাধারণত বিভিন্ন সময়ে সরকারী হুকুমনামার (Government order) মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীগণের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল নীতির পরিবর্তন সাধন করা হয়। পরিবর্তিত নিয়মাবলী সরকারী দপ্তরগুলিতে প্রেরণ করা হয়। সরকারী সংস্থার সর্বোচ্চ পদাধিকারগণকে উক্ত বিধিনিষেধগুলি মেনে চলা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে তত্বাবধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নিয়মানুবর্তিতার যে বিশেষ নীতি ইদানীং কালে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীগণকে বিশেষ করে প্রভাবিত করেছে, তা হ'ল কাজে উপস্থিতির সময়সীমা নির্ধারণ করা। উক্ত সময়সীমা মানা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে নজর রাখা এবং শাস্তি প্রদানের ভয় দেখানো। সাধারণত সরকারী কর্মচারীগণ সকাল সাড়ে দশটায় কাজে যোগদান করবেন। তবে অভাবনীয় অবস্থার বিবেচনায় হাজিরা দেওয়ার সময়টিতে অনেক সময় কিছু ছাড় দেওয়া হয়। তবে হাজিরার উপর যে সাময়িক ছাড় প্রয়োগ করা হয় ক্ষেত্র বিশেষে বা ব্যক্তি বিশেষে তা প্রয়োগ করা হতে পারে। কিন্তু সেই সকল ক্ষেত্রেও নির্দেশ করা হয় যে যদি কোন কর্মী একাধিক বার তার কর্মস্থানে হাজিরা দিতে দেরি করেন তবে শাস্তি হিসাবে তার প্রাপ্য ছুটির জমা হওয়া অংশ থেকে তা কেটে নেওয়া হয়। এই ধরনের শাস্তির কারণ হ'ল সরকারী কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ে কাজে হাজিরা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

এই নিয়মানুবর্তিতার নীতি প্রকাশকগণের কর্মজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেবলমাত্র চাকরি জীবনের শুরুতেই নয় চাকরি জীবনের প্রত্যেকটি স্তরেই তাকে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবদ্ধতার নীতি মেনে চলতে হয়। সাধারণত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই কিছু কর্মীর মধ্যে কাজের প্রতি অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের মানবিক চরিত্রের কথা চিন্তা করেই নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কিত কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। যে সকল মাধ্যমের সাহায্যে সতর্কতামূলক বা নিয়মানুবর্তিতার নীতি আরোপ করা হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল।

(১) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

(২) ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করা।

(৩) কর্মচারীদের কর্মজীবনে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা।

(৪) রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে কর্মীগণকে বিরত রাখা ইত্যাদি।

প্রশাসকগণের কর্মজীবনে অতিরিক্ত মাত্রায় নিয়মানুবর্তিতার রীতি-নিয়মগুলি প্রচলিত হলেও একজন প্রশাসক বা সরকারী কর্মচারীর ব্যক্তিগত অধিকার বা স্বাধীনতার উপর তা কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করে না, তবে প্রশাসনিক নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া কোন সংস্থাই কাজে উন্নতিসাধন করতে সক্ষম হয় না।

কর্মী হিসেবে সকল ব্যক্তিরই তার কর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা থাকে। কর্মী সবসময়ই তার কর্ম প্রতিষ্ঠানকে একটি বর্ধিত পরিবার বলে মনে করবেন। ফলে তার উপর আরোপ করা কোন বিধিনিষেধই তার উপর চাপিয়ে দেওয়া কোন বাহ্যিক নিয়ম বলে তিনি মনে করবেন না। তিনি যেমন পরিবারের সদস্য হিসাবে তার পরিবারের ভালমন্দর কথা চিন্তা করেন, সেইভাবেই তিনি তার সংস্থার ভালমন্দর কথা ভাববেন। একজন পরিবারের সদস্য হিসেবে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীগণকে একইভাবে প্রভাবিত করবেন। কারণ কর্মসংস্থার প্রতি তার ভালবাসা সংস্থার সদস্য হিসেবে তাকে উক্ত সংস্থার নিয়মাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে শেখায়। প্রশাসনিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত কর্মীবৃন্দের উপর আরোপ করা প্রশাসনিক নিয়মানুবর্তিতা বা আচরণবিধিগুলি সম্পর্কে তাঁকে বার বার

মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি উক্ত নীতি-নিয়মগুলি মেনে নেবেন। তার উপর আরোপ করা দায়িত্বভার তিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এটাই সর্বাংশে কাম্য।

তবে একথাও মনে করা বাঞ্ছনীয় যে প্রশাসনিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত সকল কর্মীই নিজস্ব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে একই দৃষ্টিতে দেখে না। প্রতি প্রতিষ্ঠানেই কিছু কর্মী রয়েছেন যাদের উপর নিয়মানুবর্তিতার নীতিগুলি বাহ্যিকভাবে চাপিয়ে দিতে হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ধরনের অসংখ্য কর্মী রয়েছেন যারা এই সকল লিখিত বিধি-নিষেধগুলিকে ফাইলের লাল ফিতেয় বাঁধা নিয়মাবলী বলেই গণ্য করেন। নিজের ইচ্ছায় চলতে চেষ্টা করেন। তাঁরা কেবল সুষ্ঠুভাবে সরকারী কার্যভার সম্পন্ন করতেই অক্ষম হন না, বিভিন্ন উপায়ে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারও করেন। ক্ষমতার সুযোগে বিভিন্ন ধরনের বেআইনী কাজে লিপ্ত হতেও দ্বিধাবোধ করেন না। এই সকল সরকারী কর্মচারীর বেআইনী কাজকর্মের কথা মনে রেখেই সরকারী সংস্থাগুলির উপর এই নিয়মানুবর্তিতার নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। অন্যভাবে একথাও বলা যায় যে, সংস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার উদ্দেশ্যেই প্রতিটি অংশেই যাতে ঠিকমত কার্যকরী হয়ে ওঠে তার জন্যেই সকল অংশগুলিকেই নিয়ম এবং শৃঙ্খলার বাঁধনে রাখতে হয়।

অনুশীলনী ঃ

১) নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবদ্ধতা বলতে কি বোঝায়?

২) সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম নীতিগুলি বাধ্যতামূলক করার যুক্তি কি?

৩) সতর্কতামূলক নিয়মানুবর্তিতার নীতিগুলি কি কি?

২.৩ ভারতের সরকারী কর্মচারী ও আচরণবিধি

ভারতীয় আমলা শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি বা স্বজনপোষণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী কর্মীবৃন্দের মধ্যে আচরণবিধির কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। উক্ত বিধিনিষেধগুলির এরূপ ঃ

(১) কর্তব্যপরায়ণতা সততা ও ন্যায়পরায়ণতা।

(২) সরকারের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রকৃত্যকের কোন সদস্য কোন ব্যবসায়ীকে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেন লিপ্ত হতে পারবেন না। যে সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারের ব্যবসায়িক লেনদেন রয়েছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানে নিজের কোন নিকটতম আত্মীয়কে চাকরিতে নিয়োগ করতে পারবেন না।

(৩) কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যদি রাষ্ট্রকৃত্যকের কোন নিকট আত্মীয় অর্থাৎ সন্তান বা স্ত্রী কার্যরত থাকেন বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিগোচর করবেন। উক্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব অন্য রাষ্ট্রকৃত্যকের হাতে আরোপ করার জন্য অনুরোধ করবেন।

(৪) কোন ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরিতে নিয়োগ, লেনদেন বা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হবে।

(৫) কোন রাষ্ট্রকৃত্যকে সরকারের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যবসা বাণিজ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিযুক্ত হাতে পারবেন না।

(৬) সরকারী অনুমোদন ছাড়া ফটকা বাজারে টাকা নিয়োগ করবেন না।

(৭) সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রাখা, ক্রয়-বিক্রয় করা, দান করা বা উপহার দেওয়া যাবে না।

(৮) চাকরিতে নিয়োগের পর থেকেই স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব সরকারের নিকট পেশ করবেন।

(৯) কর্মীর কোন ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাকরি গ্রহণের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হলে, উক্ত বিষয়টির ক্ষেত্রে একদা সান্থানাম কমিটিকে (Santhanam Committee) সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছিল। উক্ত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে, বিষয়টি উত্থাপিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতানুসারে বলা হয় যে, যদি কোন সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণ করার দু'মাসের মধ্যে কোন বেসরকারী সংস্থায় চাকরি গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তাকে উক্ত বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করা যাবে, তবে এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কিংবা তিনি যে মন্ত্রকের অধীনে কাজ করতেন সেই মন্ত্রকের মন্ত্রীর অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

তিনি যদি অবসর গ্রহণ করার দু'বছর পর বেসরকারী সংস্থায় চাকরি গ্রহণ করেন তবে সে ক্ষেত্রে কোনরকম সরকারী অনুমোদনের প্রশ্ন আসবে না। তবে অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী চাকরিতে অবসর গ্রহণের পর কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী যদি বেসরকারী উদ্যোগে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে বা স্বমন্ত্রকের মন্ত্রীর নিকট এ বিষয়ে সুপারিশ করেন তবে তাকে বেসরকারী সংস্থায় যোগদান করার অনুমোদন দেওয়া শর্তসাপেক্ষ। যেমন,

(১) উক্ত কর্মী কর্মরত অবস্থায় প্রস্তাবিত সংস্থার সঙ্গে কোন যোগাযোগ রেখেছিলেন কিনা;

(২) যে সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত হবেন সেই সংস্থায় কি ধরনের বাণিজ্যিক কাজ হয়;

(৩) উক্ত কর্মচারীকে এই কাজে কিভাবে ব্যবহার হতে পারে;

(৪) যদি কোন সংস্থা অসদুপায়ে উপার্জন করে সেই সংস্থায় উক্ত কর্মীকে চাকরি গ্রহণের অনুমোদন দেওয়া যাবে না;

(৫) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণ করলে উক্ত কর্মীর সঙ্গে সরকারের কোনরূপ নীতিগত মতানৈক্য সৃষ্টি হবে কি না।

রাষ্ট্রকৃত্যকের উপর আরোপ করা অন্যান্য নিয়মাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল রাষ্ট্রকৃত্যকের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা। একজন প্রশাসক বা সরকারী কর্মী কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি ঝুকে পড়বেন না। তাঁদের প্রধান দায়িত্ব হ'ল সরকারের কার্য পরিচালনা করা। সরকারী কার্যভার পরিচালনা করার দায়িত্ব যে রাজনৈতিক দলের উপর বর্তাক না কেন রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রধান কাজ হ'ল সেই সরকারী দলের দ্বারা নির্ধারিত নীতিগুলিকে কার্যে পরিণত করা। সরকারী কর্মচারীগণ রাজনৈতিক স্রোতের সঙ্গে নিজেদের ভাসাবেন না। রাষ্ট্রকৃত্যকের মধ্যে রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্যদের জন্য কতগুলি নিয়মাবলী নির্দেশ করেছে।

(১) সরকারী কর্মীগণ রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবেন না। তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকবেন না। সরকারী কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই সকল বিষয়ে বিস্তারিত খবরাখবর নেওয়ার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে।

(২) যে সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে সেই সকল দলের দলীয় কার্যাবলীতে যোগদান করা চলবে না এবং আর্থিক সাহায্যদানও নিয়ম বহির্ভূত।

(৩) রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা যাবে না বা কোনরূপ সহযোগিতা করা যাবে না। কোনরূপ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখা যাবে না।

(৪) কৃত্যকের কোন সদস্য আইনবিভাগে পঞ্চায়েতের বা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, নির্বাচনী প্রচারে যোগদান করবেন না, সরকারী ক্ষমতার প্রভাব নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করতে পারবেন না।

(৫) কৃত্যকের সদস্যগণ তাঁর পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হতে বা অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করবেন এবং এই কাজে যদি তিনি অকৃতকার্য হন, তবে তিনি বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিগোচরে নিয়ে আসবেন।

(৬) কৃত্যকের কোন সদস্য নামে বা বেনামে সরকারী ভাষণের বিষয়ে কোন মন্তব্য করবেন না।

(৭) সরকারের আদেশ ছাড়া কোন সরকারী তথ্য বা দলিল সরকারের অন্য কোন সদস্য বা অন্য কোন বহিরাগতের হাতে তুলে দিতে পারবেন না এবং এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

রাষ্ট্রকৃত্যকের কর্মীগণের নিরপেক্ষতার বিষয়ে বেতন কমিশনের সদস্যদের মতামত এইরূপ "যেহেতু একজন প্রশাসনিক কর্মী সরকারের দ্বারা অনুসৃত নীতিগুলির বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেই হেতু সরকারী নীতির গুণাগুণ বিশ্লেষণ-এর ক্ষমতা থেকে তাঁদেরকে বিরত রাখাই উচিত। সাধারণত রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্যগণ সমাজের উচ্চশিক্ষিত ও মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁদের যেকোন রাজনৈতিক মন্তব্য সমাজের উপর বিশেষ ছাপ ফেলতে পারে। কাজেই রাজনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে তাদের মন্তব্য সমাজের পক্ষে বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের তাই রাজনৈতিক বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই বিধেয়।

অনুশীলনী :

১) সরকারী কর্মচারীর আচরণবিধিগুলির উল্লেখ করুন।

২) সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা রক্ষায় কি কি নিয়মাবলীর নির্দেশ করা হয়?

২.৪ সরকারী নীতি-নিয়ম ভঙ্গকারী কর্মীবৃন্দকে শাস্তি প্রদান

সরকারী কর্মচারীর আচরণবিধির উপর আলোচিত উপরোক্ত নিয়মকানুনগুলি বিচার করলে প্রথমেই যে প্রশ্নটি সবার মনে দ্বিধা সৃষ্টি করে তা এরূপ : (১) সরকারী কর্মচারীর উপর আরোপ করা নিয়মাবলী একজন কর্মী মেনে চলছেন কি না তা তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব কার উপর বহাল হয়েছে? সরকারী কর্মীর চালচলনের উপর

তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যে সংস্থার হাতে আরোপ করা হয়েছে সেই সংস্থাটি কতখানি কার্যকরী হয়েছে? এই তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা যদি সত্যিই তাদের দায়িত্বভার সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় তবে প্রশাসনিক বিভাগের সদস্যগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কেলেঙ্কারির বোঝা কেন বেড়ে চলেছে ইত্যাদি।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে সাস্থানাম (Santhanam Committee) কমিটি দুর্নীতি নিরোধক নিয়মাবলীর ক্ষেত্রে ফাঁক এবং বিচ্যুতির কথা বলেছেন। এই কমিটির মতে –

(১) সরকারী প্রশাসনিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দায়িত্ব হ'ল উক্ত বিভাগীয় কর্মীগণের কাজের তদারকি করা। কিন্তু এই তদারকি শব্দটির কোন বিশদ ব্যাখ্যা কোথাও পাওয়া যায় না, তবে ধরে নেওয়া হয় যে দুর্নীতিমূলক কোন রকম কাজের সঙ্গে লিপ্ত থাকার অজুহাতে বিভাগীয় প্রধান তার অধস্তন কর্মচারীর বিপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন। উক্ত ব্যক্তির যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হ'ল যে, সরকারী দায়িত্ব পালন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণ এই দুটি বিষয়ের উপর কোনরকম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে সরকারী প্রশাসকের আচরণ কি ধরনের হবে তা নিয়ে কোন মন্তব্য করা হয় নি।

২) চাঁদা প্রদান বা দান সংগ্রহ, উপহার গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, উক্ত বিধিনিষেধগুলি শাস্তি প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত নয়। অবশ্য সাস্থানাম কমিটির সুপারিশক্রমে পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কৃত্যকের কর্মচারীগণের শাস্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু সংশোধিত নিয়মাবলী উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সাধারণত একজন অভিযুক্ত কর্মচারীর উপর আরোপ করা শাস্তি ব্যবস্থাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় (১) অনানুষ্ঠানিক শাস্তি; (২) আনুষ্ঠানিক শাস্তি।

২..৪.১ অনানুষ্ঠানিক শাস্তিদান (Informal Punishment)

নিয়মানুবর্তিতামূলক ব্যবস্থায় শাস্তিপ্রদানের পদ্ধতি হিসেবে যে সকল ব্যবস্থা প্রথম করা হয়েছে তা এরূপ : (১) বিভাগ পরিবর্তন, সুযোগ সুবিধা হ্রাস, সুবিধা প্রত্যাহার ইত্যাদি। যে সকল কর্মীর অপরাধের সূক্ষ্ম বিচার সম্ভব নয় বা যে সকল কর্মীর ক্ষেত্রে বিচার প্রমাণ করা দুরূহ তাদের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। (২) কোন সরকারী কর্মচারীর ঘুষ গ্রহণ বা রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ, স্বজনপোষণ, বিশেষ কোন বেসরকারী সংস্থার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন প্রভৃতি অনুযোগের সত্যতা অনুমান করা গেছে কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, উক্ত রাষ্ট্রকৃত্যকের জন্য উপরোক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। এই ধরনের শাস্তি প্রদানের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, উক্ত ব্যক্তির জন্য এই ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা ভবিষ্যতে তাকে একই ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়ার থেকে বিরত করবে। সরকারী কর্মচারীর উপর আরোপ করা এই ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময়ই এই ধরনের দুর্নীতিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে কোন রাষ্ট্রকৃত্যককে মূল প্রশাসনিক বিভাগ থেকে সরকারী নিগমে প্রেরণ করা হয়।

২.৪.২ আনুষ্ঠানিক শাস্তিদান (Formal Punishment)

যে সকল সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ আইনত প্রতিষ্ঠিত সেই সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যে ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা নিয়ে বর্ণিত হলো :

(১) বাৎসরিক মহার্ঘভাতা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা বা পদোন্নয়ন বন্ধ রাখা।

(২) পদমর্যাদার হ্রাস

(৩) কাজে উপেক্ষার ফলে সরকারী তহবিলের যে ক্ষতি হয়েছে তা প্রমাণিত হলে সেই ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

(৪) সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা বা ছুটিতে যেতে বাধ্য করা।

(৫) বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দেওয়া (Forced retirement)।

তাছাড়াও আরও দুই ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে—

(১) চাকরি থেকে বরখাস্ত করা এবং ভবিষ্যতে চাকরি গ্রহণের অযোগ্য বলে প্রমাণিত করা।

(২) চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে তবে তিনি ভবিষ্যতে আবার চাকরি গ্রহণ করতে পারবেন।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে কৃত্যকের সদস্যগণের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রমাণ করা বা শাস্তি প্রদান করার দায়িত্ব একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই দেওয়া হয়েছে। অন্য কোন সংস্থা কৃত্যকের সদস্যদের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা উপভোগ করেন না।

অনুশীলনী :

(১) শাস্তির প্রকৃতি কয় ধরনের?

(২) অনানুষ্ঠানিক শাস্তির ব্যবস্থাগুলির উল্লেখ করুন।

(৩) আনুষ্ঠানিক শাস্তির প্রকৃতি কি? এই শাস্তি কি প্রকার হতে পারে?

২.৪.৩ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণকারী সংস্থা

রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হলে অথবা নিয়মানুবর্তিতার প্রশ্নে যে সংকট আজও প্রশাসকগণকে বিচলিত করে তা হ'ল যে, কে এই রাষ্ট্রকৃত্যকগণের দুর্নীতিমূলক কাজ প্রমাণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

আগেই বলা হয়েছে, একজন প্রশাসনিক কর্মীর সততার অভাব বা দুর্নীতিমূলক কার্যাবলীর বিপক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দায় বিভাগীয় প্রধানের উপরই আরোপ করা হয়। অনেকেই অবশ্য প্রশাসনিক পদাধিকারীর উপর আরোপ করা এই দায়িত্বকে ভাল চোখে দেখেন না। এই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে বিভাগীয় পদাধিকারীর সঙ্গে উক্ত অপরাধীর সুষ্ঠু সম্পর্ক থাকলে ছলেবলে তিনি তাঁর কৃতকর্মের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন। কাজেই নিয়মানুবর্তিতার নীতি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে গেলে সবার আগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব অন্য কোন স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রশাসনিক সংস্থাগুলি এই ধরনের যুক্তির বিপক্ষে মন্তব্য করেন যে, অনেকক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও অপরাধ নির্ণয়কারী সংস্থার পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে প্রশাসকগণ এই ধরনের অপরাধমূলক কার্যাবলীর জন্য দায়ী ব্যক্তিকে অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সংস্কারের চেষ্টা করেন। তবে এক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগের নামে ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা প্রবল। তবে ইদানীং কালে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে শাস্তিপ্রদানের দায়ও কেন্দ্রীয়

স্তরে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিচারালয় (Central Administrative Tribunal) নামক সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হ'ল প্রশাসনিক কর্মীদের অপরাধমূলক কার্যাবলীর বিচার করা। তবে প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দের অপরাধমূলক কার্যাবলীর বিচার করা তখনই সম্ভব যখন কোন প্রশাসক বা প্রশাসনিক সংস্থা উক্ত বিষয়ের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে এই সংস্থার নিকট আপিল করেন।

কাজেই আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মীগণের বিচারের দায়িত্ব এখনও প্রশাসনিক পদাধিকারীর শাসনাধীন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোন পদাধিকারী যাতে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ না পান সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কতগুলি নিয়মাবলী আরোপ করা হয়েছে। যেমন ঃ

(১) কারণ না দেখিয়ে সরকারী কর্মচারীর উপর কোন অপরাধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না।

(২) অপরাধী কর্মীর বিরুদ্ধে তার অপরাধের তালিকা যথাযথভাবে পেশ করতে হবে।

(৩) ন্যূনতম পক্ষে দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে দিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা যাবে, এবং এই কমিটির অনুসন্ধান অনুসারে অপরাধের মাত্রা অনুধাবন করে তার বিপক্ষে শাস্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে উপরোক্ত দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মীর মধ্যে অবশ্যই একজন অপরাধী কর্মীর ঊর্ধ্বতন পদাধিকারী হবেন। কারণ শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের উপর অনুসন্ধান প্রয়োজন সেই সকল বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ একমাত্র তিনিই উপস্থাপিত করতে সক্ষম হবেন।

(৪) যদি অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধানকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর তার অপসারণ পদচ্যুতি, পদমর্যাদার হ্রাস বা বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের ন্যায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তবে উক্ত ব্যক্তির বিষয়ে অনুসন্ধান সংক্রান্ত বিবরণের অনুলিপি অভিযুক্ত কর্মচারীকে প্রদান করা হবে। ঐ রিপোর্টের কমিটির দ্বারা নির্ধারিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পক্ষে কিছু যুক্তিও প্রদান করা অবশ্যই প্রয়োজন।

(৫) কৃত্যকের কোন অভিযুক্ত কর্মচারীর বিপক্ষে অভিযোগগুলির সত্যতার প্রমাণ হিসাবে কমিটির বিবরণের সঙ্গে যুক্তিসংগত তথ্য, সাক্ষ্য নথিভুক্ত থাকবে। তবে উক্ত কমিটির হাতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয় না।

(৬) রাষ্ট্রকৃতক্যের বিপক্ষে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা কোন দণ্ডাদেশ জারি করার পূর্বে অপরাধী কর্মীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে। এই সুযোগ তাকে দুইবারই দেওয়া যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কোন অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য চলতে থাকাকালীন। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ অনুসন্ধান-কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তির সুপারিশ করা হয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রদত্ত শাস্তি নির্ধারণের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারটিকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা বিধান বা স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা বর্ণিত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কেবলমাত্র অনুসন্ধান পর্বেই সাক্ষপ্রমাণের ভিত্তিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী প্রয়োগের পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ সংবিধানের ৩১১(২) নং অনুচ্ছেদে যে দুটি পর্যায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল করা হয়েছে।

আবার ক্ষেত্র বিশেষে যদি কোন কর্মী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়েও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তার ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের পূর্বেও কোনরূপ অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজন হয় না। তবে সরকারের গাফিলতির ফলে তিনি যদি সময়মত কোর্টে হাজিরা দিতে ব্যর্থ হন তবে এক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতি প্রয়োগ করা হবে না।

তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকৃত্যকগণ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন না। (১) কোন ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত কোন সরকারী কর্মচারী আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসংগত সুযোগ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। (২) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে বিশেষ কোন কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন করবার সুযোগ যুক্তিসংগতভাবে দেওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে আত্মস্বার্থ রক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে না। সংবিধানের ৩১১(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে এই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার প্রদান করা হয়েছে কিনা তা বিচার করার অধিকার আদালতেরও থাকবে না। কর্মীর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা একমাত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগের হাতেই তুলে দেওয়া হবে। (৩) রাষ্ট্রপতি বা ক্ষেত্র বিশেষে রাজ্যপাল যদি মনে করেন জনস্বার্থের খাতিরে বা দেশের নিরাপত্তার খাতিরে অভিযুক্ত কর্মচারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া উচিত নয়, সেক্ষেত্রে কর্মী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন না।

২.৪.৪ সমালোচনা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই ধারণা হয় যে সরকারী কর্মচারীগণের চাকরির শর্তাদি সরকারী কর্মচারীর আচরণবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভারতীয় কোন নাগরিক সরকারী পদে নিয়োজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কর্মজগতে দক্ষতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হলে কর্মপদে অবসর গ্রহণের সময়সীমা পর্যন্ত সরকারী চাকরিতে বহাল থাকতে পারেন। নিয়মানুযায়ী তাঁর পদোন্নয়ন হবে এবং কর্মজীবনে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদেও আসীন হতে পারেন। দক্ষতা প্রদর্শন এই শব্দ সম্পর্কে অবশ্য বিতর্ক দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। যেহেতু ভারতবর্ষে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, সেই হেতু এখানে মন্ত্রিপরিষদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সাধারণত রাষ্ট্রপতির নাম নিয়ে প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ এই মন্ত্রিপরিষদ দ্বারাই পরিচালিত হয়। সরকারী কর্মীগণও তাদের কৃতকর্মের জন্য মন্ত্রিপরিষদের নিকটই দায়ী থাকেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীগণ নির্দলীয় কৃত্যকের মুখোশ পরে মন্ত্রিপরিষদের দলীয় রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হন। এবিষয়ে অন্যথা হলে এই রাষ্ট্রকৃত্যকগণই মন্ত্রীগণের রোষদৃষ্টিতে পরেন। ফলে কর্তব্যপরায়ণ নির্ভীক রাষ্ট্রকৃত্যকগণ অনেক সময়ই অন্যায়ভাবে শাস্তি পান। এই নিয়মানুবর্তিতামূলক শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে যেহেতু আদালতের ভূমিকা নগণ্য, সেই হেতু এই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের আত্মপক্ষ সমর্থনেরও বিশেষ সুযোগ থাকে না। ফলে তাঁদেরকে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয় কিন্তু এই ধরনের অন্যায় শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা সরকারী কৃত্যকগণের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার ইচ্ছাকে নষ্ট করে। নিজস্ব স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁরা সরকারের বিপক্ষে জনস্বার্থেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধা বোধ করেন। ফলত জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং নির্দলীয় স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ ব্যবস্থার মূল আদর্শ সার্থক হয় না। এখানে সরকারী কর্মচারীর নির্ভীকতার উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের একটি উন্নয়নমূলক নিগমের সচিব হিসাবে একজন রাষ্ট্রকৃত্যক ইদানীং কালে উক্ত নিয়োগের নিয়মাবলীর কিছু পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করেন এবং আইন বহির্ভূত যে সকল কাজকর্ম চলছিল তা বন্ধ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত নিগমের নীতিবহির্ভূত কার্যাবলীর উপর হস্তক্ষেপের ফলে কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

সেই হেতু উক্ত সচিবকে উল্লেখিত বিভাগ থেকে অপসারণ করা হয় এবং ভিন্ন একটি দপ্তরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই ধরনের উদাহরণের অভাব নেই এখন। ফলে আধুনিক কালে নির্ভীক একদল নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকৃত্যক আধুনিক ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রায় বিরল প্রজাতি। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুপ্রশাসনের মুলমন্ত্রই হ'ল নির্ভীক, দক্ষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ কর্মচারীর উপস্থিতি। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সৎ পথে পরিচালনা করতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী, ন্যায়পরায়ণ এবং নির্ভীক কর্মীগোষ্ঠী। আমাদের প্রশাসনিক কর্তাদেরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, দেশের প্রকৃত উন্নতির দিকে নজর দিতে হলে রাজনৈতিক স্বার্থপরতা ভুলে গিয়ে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ কর্মচারীকে রক্ষা এবং পোষণ করা প্রয়োজন। এবং তখনই সম্ভব একটি সুস্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি।

২.৫ সারাংশ

এই এককে প্রধানত আলোচিত হয়েছে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে কর্মচারীবর্গের নিয়মানুবর্তিতা। একথা তর্কাতীত যে, কর্মচারীবর্গের নিয়মানুবর্তিতা প্রশাসনের দক্ষতা ও পরিষেবার মান বৃদ্ধি করে। সরকারী বিধি ও আইন উপেক্ষা করলে সরকারী কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে না। তাই প্রয়োজন এমন এক পদ্ধতির উদ্ভাবন যা শৈথিল্য ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্তে কর্মচারীবর্গকে নিয়মানুবর্তী হতে বাধ্য করবে।

২.৬ অনুশীলনী

১) নিয়মানুবর্তিতার অর্থ ও সংজ্ঞা নির্ণয় করে প্রশাসনে তার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২) সরকারী নিয়মভঙ্গের অপরাধ নিবারণে সান্থানাম কমিটির সুপারিশগুলি আলোচনা করুন।

৩) সরকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে-হলে কি কি শর্তে তা করা সম্ভব?

৪) শাস্তি-উদ্যোগে সরকারী কর্মী কোন কোন তিনটি ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন?

৫) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নষ্ট হতে পারে কখন?

৬) সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনায় এবং সংরক্ষণে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার ভূমিকা কি রূপ?

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(1) D. Basu, *Constitution of India.*

(2) Maheswari, S., *Indian Administration.*

(3) *Indian Journal of Public Administration;* New Delhi.

একক ৩ ❑ কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিরোধক ব্যবস্থা

৩.৩ প্রযুক্তি পরীক্ষক সংস্থা (**Chief Technical Examiner's Organisation**)

৩.৪ কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ

৩.৫ কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের কার্যাবলী

৩.৬ কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের গঠন

৩.৭ অনুযোগ গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের ভূমিকা

৩.৮ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত সতর্কীকরণ আয়োগের কাজ

৩.৯ প্রশাসন পরিচালন ব্যবস্থায় সতর্কীকরণ যন্ত্রের প্রভাব

৩.১০ সতর্কীকরণ সংস্থার কাঠামো এবং কার্যাবলীতে নীতিগত পরিবর্তন

৩.১১ সারাংশে

৩.১২ অনুশীলনী

৩.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- প্রশাসনিক দুর্নীতি নিরোধক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা
- কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ
- কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের গঠন
- অনুযোগ গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে সতর্কীকরণ আয়োগের ভূমিকা
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্তে সতর্কীকরণ আয়োগের কাজ
- প্রশাসনিক পরিচালন ব্যবস্থায় সতর্কীকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাব।

৩.১ প্রস্তাবনা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতার দর্পণে দেখা গেছে যে ক্ষমতার অপব্যবহার মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। অতিরিক্ত ক্ষমতা যাঁর হাতেই অর্পণ করা হোক না কেন তিনি কোন না কোনভাবে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে শুরু করেন। এই সত্য কেবল ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয় বরং দেশ ও কাল নির্বিশেষে ক্ষমতাসীন ব্যক্তির ক্ষমতার অপব্যবহারের কাহিনী শোনা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার ব্রিটেন-এ রাজতন্ত্রের ক্রমহ্রাসমান ক্ষমতার মূল কারণ। হিটলার এবং মুসোলিনির ন্যায় ক্ষমতাশীল নায়কের অবসানের পেছনেও ক্ষমতার অপব্যবহারই মুখ্য কারণ হিসেবে আলোচিত।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও এই ধরনের ক্ষমতাবান ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। আমেরিকান রাষ্ট্রপতি নিক্সনের (Nixon) Watergate কেলেঙ্কারি বা রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের 'চারিত্রিক কেলেঙ্কারি' ক্ষমতার ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনার মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষের ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কেলেঙ্কারির কাহিনী বিশ্বের বহু আলোচিত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। ইদানীং কালে ভারতীয় প্রশাসকগণ (স্থায়ী এবং অস্থায়ী প্রশাসক দল) প্রায়শই বিভিন্ন কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছেন। বোফোর্স কেলেঙ্কারি, সিকিউরিটি কেলেঙ্কারি, চিনি কেলেঙ্কারি, হাওয়ালা, গাওয়ালা কেলেঙ্কারি ইত্যাদি ভারতীয় প্রশাসনের ইতিহাসে এই ঘটনাগুলি দুর্নীতির এক একটি বড় মাপের অধ্যায় হিসেবে অভিহিত। এই সকল কেলেঙ্কারির হাত থেকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কি উপায়ে মুক্ত করা যায় তার জন্য নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত। ভবিষ্যতে প্রশাসকগণকে এই ধরনের কেলেঙ্কারির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কি ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং কি উপায়ে এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করাই উক্ত এককের মূল উদ্দেশ্য।

৩.২ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিরোধক ব্যবস্থা

রাষ্ট্রকৃত্যকগণের মধ্যে দুর্নীতি বন্ধ করার প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দিল্লিতে একটি "বিশেষ পুলিশ সংস্থা" (Special Police Establishment) গঠন করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় কৃত্যকের সদস্যদের ঘুষ গ্রহণ এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক অপরাধ দমন করা। উক্ত ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে 'দিল্লি বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠান আইন'টি (Delhi Special Police Establishment Law) প্রণীত হয়। এর এক বছর বাদে দুর্নীতি নিরোধক আইন (Prevention of Corruption Act) পাশ করা হয় এবং উক্ত আইনকে পরে ব্যবস্থা বিভাগ কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করা হয়।

তবে স্থায়ীভাবে প্রশাসনিক কর্মীগণের কার্যাবলীর উপর সতর্ক দৃষ্টি ও প্রহরার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে প্রশাসনিক সতর্কীকরণ বিভাগ গঠন করা হয়। উক্ত সতর্কীকরণ বিভাগের উপর যে সব দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তা হ'ল নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রশাসনিক কর্মীগণের মধ্যে বেআইনী কার্যাবলী বন্ধ করা;

(২) প্রশাসনের মধ্যে দুর্নীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করা;

(৩) বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা;

(৪) দুর্নীতিমূলক কার্যাবলী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা নীতিসকল বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে প্রচার করা।

৩.৩ প্রযুক্তি পরীক্ষক সংস্থা

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রধান প্রযুক্তি পরীক্ষক সংস্থা (Chief Technical Examination's Organisation) নামক একটি সংস্থা গঠন করা হয়। উক্ত সংস্থাটিকে পূর্ত, গৃহনির্মাণ এবং সরবরাহ মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রধান প্রযুক্তি পরীক্ষক সংস্থাটি গঠন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের প্রযুক্তিমূলক কার্যাবলীর হিসাব পরীক্ষা করা, প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা। প্রযুক্তি বিষয়ে উন্নততর নীতি অবলম্বন করা এবং প্রয়োজনে উক্ত বিভাগের ব্যয় সংকোচন করা। উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করার দায়িত্ব প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বিভাগের উপর আরও কিছু দায়িত্ব প্রদান করা হয় যেমন ঃ

(১) কোন প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন হওয়ার পর উক্ত কাজের মান নির্ণয় করা ও কোন নতুন প্রযুক্তিমূলক কাজ শুরু হলে সেই কাজের অগ্রগতির উপর নজর রাখা। কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা নির্ধারণ করা। কাজটি করার সময় নির্ধারিত চুক্তি মেনে চলা হচ্ছে কি না, সেই বিষয়ে নজর রাখা।

(২) বিভাগীয় কার্যাবলী পরিদর্শন করা এবং কাজটি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মানবসম্পদ এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহারের পরিমাপ নির্ধারণ করা ইত্যাদি।

(৩) চুক্তি অনুসারে সম্পাদন করা কাজের হার নির্ধারণ করা। আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা চুক্তিগুলিকে মেনে নেওয়া হচ্ছে কিনা তা দেখা। চুক্তিপত্রে ধার্য করা সামগ্রীর মুল্য ন্যায়সঙ্গত কিনা এবং এই চুক্তির বিবরণ স্পষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করা।

(৪) চুক্তিপত্রে নির্ধরিণ করা মুল্য কত ভাগ লিখিত চুক্তি অনুসারে করা হয়েছে তা যাচাই করা এবং চুক্তি-মুল্য পত্রে নির্ধারিত মুল্য এবং কাজের উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা তা নিরূপণ করা।

(৫) পূর্ত, গৃহনির্মাণ এবং সরবরাহ দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা।

(৬) হিসাব পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত অধ্যায়গুলির হিসাব পরীক্ষা করা।

(৭) বিশেষ পুলিশ দপ্তরের দ্বারা প্রযুক্তিগত বিষয়গুলিকে বিশদভাবে পর্যালোচনা করা।

এইরূপ অবস্থায় কে সান্থানাম-এর সভাপতিত্বে ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি 'দুর্নীতি নিরোধক কমিটি' গঠন করে। যে উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠন করা হয় তা এইরূপ ঃ রাষ্ট্রকৃত্যকগণের দুর্নীতি বন্ধ করার পথ নির্দেশ করা এবং দুর্নীতি নিরোধক প্রক্রিয়াগুলিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা। এই সান্থানাম কমিটির সুপারিশ ক্রমে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ (Central Vigilance Commission) গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের প্রধানকে বলা হয় কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ কমিশনার (Central Vigilance Commissioner)।

৩.৪ কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ

কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের এলাকা বা ক্ষমতা সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যে সকল সরকারী কর্মচারীকে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সরকারী কর্মচারীবর্গ, কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত গণ উদ্যোগ নিগমের কর্মচারীগণ, ভারতীয় খাদ্য নিগম, ভারতীয় তৈল নিগম প্রভৃতির কর্মচারীবৃন্দ এবং ব্যাঙ্ক কর্মীগণ। তাছাড়া যে সকল সংস্থার কর্মচারীবৃন্দ কোন না কোন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত তারা সকলেই কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের শাসনাধীন থাকবেন। দিল্লি পৌর নিগম এবং নতুন দিল্লি পৌর কমিটির কর্মীগণও উক্ত সতর্কীকরণ আয়োগের নিয়ন্ত্রণাধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণকেও উক্ত সতর্কীকরণের আয়োগের অধীনে রাখা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় এই আয়োগ তার নিজস্ব কার্যভার পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতির দ্বারা শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ। এই সীমা নির্দেশক নীতিগুলি কিন্তু সান্থানাম কমিটির দ্বারা নির্ধারিত দুর্নীতি নিরোধক নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়নি। ফলে সতর্কীকরণ কমিটির কার্য সম্পাদনে কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে, নির্ধারিত সরকারী নীতিগুলি সরকারী কর্মচারীগণের নীতিবহির্ভূত কাজের ক্ষেত্রগুলিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছে। কাজেই এই কমিশন তার পঁয়ত্রিশ বৎসরের জীবনে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের দুর্নীতি দূরীকরণে কতখানি সক্ষম হয়েছেন সে সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে।

৩.৫ কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের কার্যাবলী

(১) যে সকল সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী কোন দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত রয়েছেন বলে সন্দেহ করা হয় তাদের গতিবিধির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা।

(২) যে সকল সরকারী পদাধিকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করছেন বলে সন্দেহ করা হয় কিংবা যদি মনে হয় যে তিনি দুর্নীতিমূলক কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দ্বিধাবোধ করছেন তবে উক্ত সরকারী কর্মচারীর কার্যাবলীর উপর কমিশন কড়া নজরদারি জারি রাখে। তাছাড়া যদি কোন সরকারী কর্মচারীর বিপক্ষে দুর্নীতি, অসদাচরণ, সততার অভাব ইত্যাদি বিষয়ে কোন অভিযোগ আসে তবে সতর্কীকরণ কমিশন তার হালচালের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখে।

(৩) এই আয়োগ বিভিন্ন সংস্থাগুলির দ্বারা প্রচারিত সংবাদগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে এবং বিচার করে। দুর্নীতির বিপক্ষে সংবাদমাধ্যমগুলি কোনরকম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রকাশ করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণও এই সংস্থার একটি কর্তব্য।

(৪) এই সতর্কীকরণ আয়োগ আবার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অনুযোগ গ্রহণ করার পর প্রত্যক্ষভাবে বিষয়টির উপর খোঁজখবর নেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রয়োজনে সেই দায়িত্ব (ক) কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান আয়োগের (Central Bureau of Investigation) হাতে তুলে দেয় কিংবা (খ) বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান আয়োগের (Central Bureau of Investigation) অনুসন্ধানের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে। কখনো প্রয়োজনবোধে অন্য কোন সংশ্লিষ্ট সংস্থার হাতেও উক্ত বিষয়টিকে সমর্পণ করতে পারে।

(৫) সতর্কীকরণ আয়োগের আর একটি কাজ হলো কোন প্রশাসনিক সংস্থার কার্যকরণ প্রক্রিয়ার উপর কড়া নজর রাখা এবং উক্ত প্রশাসনিক সংস্থাটির কার্যাবলীর ধারা বিশ্লেষণ করা।

সতর্কীকরণ আয়োগ তার কার্যাবলীর বাৎসরিক বিবরণী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিকট পেশ করে যে সকল বিষয়ের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন তা নির্দেশ করে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কি ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত তা উল্লেখ করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক উক্ত বিবরণীকে সংসদীয় অধিবেশনে পেশ করেন।

কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ বিভিন্ন ধরনের নীতিবহির্ভূত কখনো বা বেআইনী কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে সাতাশটি বিশেষ ধরনের দুর্নীতিমূলক কাজকে উল্লেখ করেছে। সেগুলি হলো ঃ

(১) নিম্নমানের কার্যাবলী বা মজুত দ্রব্য গ্রহণ করা।

(২) জাতীয় অর্থের বা মজুতদ্রব্যের অপব্যবহার করা।

(৩) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে মজুতদারী ব্যবসায় সরকারী সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার অজুহাতে বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করা।

(৪) যে সকল ঠিকাদার বা ঠিকাদারী সংস্থা সরকারী সংস্থাগুলিকে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যোগান দেয় সেই সকল সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট সরকারী কর্মচারী হওয়ার অজুহাতে টাকা ধার নেওয়া।

(৫) কোন একটি ঠিকাদার বা ঠিকাদারী সংস্থাকে বিশেষ সুযোগ করে দেওয়া।

(৬) মিথ্যা ভ্রমণভাতা বা বাড়ি ভাড়া দাবি করা।

(৭) অনুপযোগী সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা।

(৮) সরকারের অনুমতি বিনা বা সরকারকে না জানিয়ে সম্পত্তি ক্রয় করা।

(৯) কাজের গাফিলতির ফলে সরকারী সম্পত্তির অপচয় করা।

(১০) সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করা।

(১১) কোন একজন কর্মীর নিয়োজন, নির্দিষ্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা, বদলি বা পদোন্নয়নের সুযোগ করে দিয়ে ঘুষ গ্রহণ করা।

(১২) সরকারী কর্মচারীকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী পুলিশ বিভাগের উচ্চপদাধিকারীগণ বিভাগীয় আর্দালিগণকে তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। এই ঘোষণা থেকে বোঝা যায় যে, নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের রীতি এখনও সরকারী উচ্চপদাধিকারীগণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

(১৩) বয়স, জন্ম তারিখ এবং জাত এই সকল ক্ষেত্রে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করা।

(১৪) ট্রেন বা প্লেনে যাত্রায় আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়মবহির্ভূত পন্থা অবলম্বন করা।

(১৫) অর্থবিষয়ক বিধিসম্মত দায়িত্বগুলি পালন না করে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা।

(১৬) নতুন ডাকটিকিট সরিয়ে পুরনো শীলমোহরযুক্ত ডাকটিকিট ব্যবহার করা।

(১৭) আমদানি এবং রপ্তানি দ্রব্যের বিষয়ে মিথ্যা ছাড়পত্র প্রদান করা।

(১৮) কোন সরকারী কর্মচারীর প্ররোচনায় আমদানি দ্রব্যের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে নির্ধারিত অংশ প্রদান করা হয়েছে তা অন্য কোন সংস্থাকে প্রদান করা।

(১৯) দূরভাষ যন্ত্রের সংযোজনের ক্ষেত্রে অনিয়মিত পথ অবলম্বন।

(২০) চারিত্রিক দোষ

(২১) উপহার গ্রহণ করা

(২২) আয়কর এবং সম্পত্তি কর ফাঁকি দেওয়া।

(২৩) গাড়ি বা স্কুটার ক্রয় করার উদ্দেশ্যে প্রদেয় টাকার অপব্যবহার করা।

(২৪) বরখাস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের দাবি অগ্রাহ্য করা বা ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদানে অবাঞ্ছনীয় সময় হরণ করা।

(২৫) বরখাস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের টাকার হিসাবে গরমিল করা।

(২৬) গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় বা বিক্রয়ের সময় ঠকানো।

(২৭) বিনা অনুমতিতে সরকারী বাসস্থান ব্যবহার করা বা ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি।

৩.৬ কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের গঠন

কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ একটি সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। উক্ত আয়োগের কর্মী সংখ্যা ১০০। এই আয়োগের প্রধানকে বলা হয় কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ কমিশনার। ভারতের রাষ্ট্রপতি তাকে নিযুক্ত করেন। তিনি ছয় বৎসরের জন্য কিংবা ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক আয়োগের অধ্যক্ষের ন্যায় উক্ত কমিশনারকেও তাঁর পদ থেকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যতিরেকে অপসারণ করা যায় না। রাষ্ট্রকৃত্যকের অধ্যক্ষকে যেমন দুর্নীতিমূলক কাজের জন্য অপসারণ করা যায়, সেইভাবেই কমিশনারকেও অপসারণ করা যেতে পারে। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে আর কোন চাকরি গ্রহণ করতে পারেন না।

যেহেতু কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের দ্বারা গঠিত সেই হেতু এই সতর্কীকরণ আয়োগকে একটি আইনানুগ সংস্থা বলে গণ্য করা হয় না। সতর্কীকরণ আয়োগকে একটি পরামর্শ প্রদানকারী সংস্থা বলা যেতে পারে। অনেকটা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের মতই।

সতর্কীকরণ আয়োগ একটি "স্বাধীন এবং স্বশাসনিক সংস্থা"। প্রশাসনিক সততা সম্পর্কে এই সংস্থার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত মূল্যবান। যে সকল প্রশাসনিক সংস্থা এই আয়োগের দ্বারা গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত অমান্য করেছে সেই সকল প্রশাসনিক সংস্থাগুলির নাম বাৎসরিক বিবরণীতে উল্লেখ করার অধিকার এই সংস্থার আছে।

এই সংস্থা প্রশাসনিক কর্মীগণের বিপক্ষে আনীত সকল রকমের অনুযোগই গ্রহণ করে থাকে। জনসংযোগের মাধ্যমগুলির দ্বারা বা সংসদীয় সদস্যগণের দ্বারা সরকারী কৃত্যকের বিপক্ষে উত্থাপিত দুর্নীতির খবরাখবর সংগ্রহ করা এবং বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব আয়োগকে দেওয়া হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা দেয় বিবরণী

বা সংসদীয় কমিটিগুলির দ্বারা উত্থাপিত খবরাখবর কিংবা কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার দ্বারা সংগ্রহ করা সংবাদগুলিকে এই আয়োগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে। কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ সংস্থা প্রয়োজনে অন্যান্য সেবামূলক সংস্থাগুলির সাহায্যও সাদরে গ্রহণ করে। অনেক ক্ষেত্রেই কিছু নামীদামী ব্যক্তিত্ব বা কোন সংবাদ প্রদানকারী সংস্থাও এই সতর্কীকরণ আয়োগের কাজে সাহায্য করে। যদি কোন একটি বিষয়কে রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বাধীন বলে মনে করা হয় এবং উক্ত বিষয়ে সতর্কীকরণ আয়োগ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে সেই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে উক্ত আয়োগকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রেরণ করতে বলা হয়। আবার প্রয়োজনীয় কোন বিষয় সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্ব রাজ্য সতর্কীকরণ আয়োগের হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে। একইভাবে যদি রাজ্য সতর্কীকরণ আয়োগ কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণে আয়োগের এলাকাভুক্ত কোন বিষয়ের উপর অনুযোগ গ্রহণ করে তবে সেই বিষয়টির উপর প্রয়োজনীয় খবরাখবর গ্রহণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের উপর আরোপ করা যেতে পারে।

৩.৭ অনুযোগ গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের ভূমিকা

অনুযোগ গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের ভূমিকা নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল।

(১) কোন প্রশাসনিক কর্মীর বিপক্ষে গ্রহণ করা অনুযোগগুলিকে সতর্কীকরণ আয়োগ উক্ত সংস্থার নিকট কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অথবা কর্মীর স্ববিভাগ উক্ত বিষয়ের সম্পর্কে প্রারম্ভিক অনুসন্ধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের নিকট বিশদ বিবরণী প্রেরণ করে।

(২) অনেক সময় আবার কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থার (Central Investigation Commission) নিকট বিশেষ কোনও ঘটনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করতে পারে। এবং কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থার অনুসন্ধান সংক্রান্ত কাজটি সম্পন্ন করে উক্ত ঘটনাটি সম্পর্কিত তথ্যের বিশদ বিবরণ কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের নিকট পেশ করে। অনুসন্ধান সংস্থার দ্বারা বর্ণিত বিবরণীর উপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ প্রশাসনিক মন্ত্রককে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করে।

(৩) কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থার পরিচালককে কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে নথিভুক্ত করে তার উপর অনুসন্ধানমূলক কাজ চালাতে অনুরোধ করতে পারে। অনুসন্ধানের ফলাফল কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের নিকট পেশ করা হয়। সতর্কীকরণ আয়োগের সিদ্ধান্ত অনুসারে অভিযুক্ত কর্মী সম্পর্কে আরও বিশদভাবে অনুসন্ধানের পরামর্শ দেওয়া হয়।

(ক) কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান আয়োগ তাদের অনুসন্ধান বিবরণী কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিকট পেশ করেন। অভিযুক্তের বিপক্ষে যদি কোন মামলা রুজু করার প্রশ্ন আসে তবে একমাত্র রাষ্ট্রপতির নামেই এই মামলা উত্থাপিত হতে পারে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে মামলা রুজু করা হবে কিনা সেই বিষয়ে পরামর্শ দেন। তবে এ বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত একমাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকই গ্রহণ করতে পারে।

(খ) যদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ছাড়া আর কোন যোগ্য ব্যক্তি মামলা রুজু করার প্রস্তাব উত্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ কমিটির পরিচালক তার অনুসন্ধান বিবরণী উক্ত সংস্থার নিকট প্রেরণ করতে পারেন। এই বিবরণীর ভিত্তিতেই মামলা দায়ের করার প্রস্তাব পাশ করা হয়। তবে যদি উক্ত বিভাগের অভিযুক্ত পদাধিকারীর বিপক্ষে মামলা দায়ের করার ক্ষমতা না থাকে তবে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সহ উক্ত অভিযোগ পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রকের কাছে পেশ করা হয়।

প্রশাসনিক মন্ত্রক/বিভাগ যদি কোন কর্মীর বিপক্ষে কোন অভিযোগ প্রমাণ করে, তবে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ সংস্থাকেই নির্দেশ করা হতে পারে। বিভাগীয় সমস্যাগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রশাসনিক সততা বজায় রাখার জন্য যে সকল বিষয়ের উপর নজর দেওয়া কর্তব্য সেই বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বিভাগের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থিত করতে নির্দেশ দিতে পারে। উক্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং তত্ত্বাবধানের জন্য চেয়ে পাঠাতে পারেন। এই তথ্যগুলি বিচার করার মূল উদ্দেশ্য হ'ল সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রক সরকারী পদাধিকারীগণের চালচলনের উপর নজর রাখছে কিনা বা দুর্নীতির বিপক্ষে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে কিনা তা বিচার করা। ক্ষেত্র বিশেষে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ আবার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক/বিভাগের নিকট উক্ত সংস্থার ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানগুলি চেয়ে পাঠাতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ প্রয়োজনে কিছু অভিযোগ প্রত্যক্ষভাবে অধিগ্রহণ করতে পারেন। এই সকল ক্ষেত্রে পরবর্তী স্তরে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যখন কোন একটি বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বিভাগ অভিযোগ গ্রহণ করে এবং সেই অনুসারে প্রাথমিক অনুসন্ধান সম্পন্ন করে তখন সেই অনুসন্ধানের ফলাফল উক্ত কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হয়। বিষয়টিকে কিভাবে বিবেচনা করা হবে এবং অভিযোগের মোকাবিলা কিভাবে করা যেতে পারে সেই বিষয়ে উক্ত কমিশন পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৩.৮ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত সতর্কীকরণ আয়োগের কাজ

সান্থানাম কমিটির সুপারিশক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে প্রতিটি প্রশাসনিক মন্ত্রক বিভাগের অভ্যন্তরে একজন করে প্রধান সতর্কীকরণ আধিকারিক পদ সৃষ্টি করা হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক (Chief Vigilance Officer) / বিভাগের কর্মচারীর কার্যাবলীর উপর নজর রাখবেন। অর্থাৎ তাঁর প্রধান দায়িত্ব হবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারীগণের মধ্যে সততা বজায় রাখা। তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক / বিভাগ এবং সতর্কীকরণ আয়োগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবেন। সরকারী নিগম বা সরকারী উন্নয়ন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলিতেও এই শ্রেণীর সতর্কীকরণ পদাধিকারী নিয়োগ করা হয়।

প্রধান সতর্কীকরণ পদাধিকারীর অধীনে আবার অধীনস্থ প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সতর্কীকরণের অধীনস্থ পদাধিকারীগণ থাকেন। প্রধান সতর্কীকরণ পদাধিকারীর সঙ্গে আলোচনা করে এই সকল কর্মীগণকে নিযুক্ত করা হয়।

৩.৯ প্রশাসনিক পরিচালন ব্যবস্থায় সতর্কীকরণ যন্ত্রের প্রভাব

প্রায় দুই যুগেরও বেশিদিন ধরে ভারতীয় সতর্কীকরণ যন্ত্র অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগ, কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান আয়োগ, বিভাগীয় সতর্কীকরণ সংস্থাগুলি এবং রাজ্য সতর্কীকরণ আয়োগ যৌথভাবে তাদের দায়িত্বভার সম্পন্ন করে চলেছে। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত এবং পেশাদারি চরিত্র প্রবলভাবে গজিয়ে ওঠার ফলে প্রশাসকগণের মধ্যে সততার অভাব লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে। তার ফলে সতর্কীকরণ যন্ত্রের ভূমিকাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সতর্কীকরণ যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। তবে কোন কোন প্রশাসনিকের মতে সতর্কীকরণ যন্ত্রের প্রয়োগ রাষ্ট্রকৃত্যকগণের স্বাভাবিক আচরণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। সতর্কীকরণ যন্ত্রটি একটি অতিসূক্ষ্ম দু'মুখো কার্যনির্বাহী সংস্থা। কারণ এই যন্ত্রের কোনরূপ ভ্রান্তিমূলক পদক্ষেপ কোন একজন কৃত্যকের জীবনে সর্বনাশের কারণ হতে পারে। তাছাড়া প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্নীতিমূলক কাজের মধ্যে একটি সুক্ষ্ম বিভাজন থাকা প্রয়োজন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৯৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে লোহার আকাল হয়। সরকারী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে লোহার সরবরাহ পরিমিত করা হয়। সেই সময় সরকারের অধীনে কতগুলি প্রয়োজনীয় কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কর্মপ্রকল্পগুলি গড়ে তুলতে প্রচুর পরিমাণে লোহার প্রয়োজন হয়। সরকারীভাবে পরিমিত লোহা সরবরাহের প্রস্তাবে দেখা যায় যে এই ব্যবস্থাতে প্রয়োজনীয় লোহার ১০ ভাগের একভাগ লোহা জোগান দেওয়া সম্ভব। এ দিকে কাজটি সম্পূর্ণ করা আবশ্যিক ছিল। উক্ত কর্মপ্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সরকারী পদাধিকারীকে আঞ্চলিক বাজার থেকে লোহা ক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তিনি আঞ্চলিক বাজার থেকে বেশি দামে লোহা ক্রয় করেন এবং সময়ের মধ্যেই কর্মপ্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়। এদিকে প্রকল্পটির খাতে ব্যয় করা অর্থের পরিমাণ অনুমান করে সতর্কীকরণ আয়োগ উক্ত পদাধিকারী এবং তার অধীনস্থ এলাকার কর্মীর বিপক্ষে অনুসন্ধান শুরু করেন। তদন্তে উভয় সরকারী কর্মচারীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। উভয়কেই সরকারী অর্থের অপব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বিভাগীয় পদাধিকারী এবং তার অধীনস্থ কর্মী তাদের বক্তব্য পেশ করেন। যেহেতু উক্ত কর্মীগণের বিপক্ষে কোন দুর্নীতিমূলক অপরাধ প্রমাণ করা যায়নি সেহেতু বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তবে এক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টির উপর সতর্কীকরণ আয়োগের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে কতগুলি অভিযোগ আনা যেতে পারে।

অভিযোগগুলি এরূপ ঃ

১) চার বছর ধরে বিষয়টি সতর্কীকরণ আয়োগের অধীনে ছিল এবং সতর্কীকরণ আয়োগের কোন কর্মীই এই বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। এই বিষয়টি খতিয়ে দেখলে খুব সহজেই তারা নির্ধারণ করতে পারত যে কোন অবস্থায় একজন সরকারী পদাধিকারীকে বেশি দামে খোলা বাজার থেকে লোহা ক্রয় করতে হয়েছিল।

২) জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মপ্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা বিচার করা হয়নি। আয়োগের কোন কর্মীই এই বিষয়ে খবরাখবর নিতে উৎসাহ দেখাননি।

৩) সরকারী সচিবের লিখিত নির্দেশের উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি অর্থাৎ এক্ষেত্রে উক্ত কর্ম প্রকল্পটি শীঘ্র সম্পূর্ণ করার জন্য এবং আঞ্চলিক বাজার থেকে লোহা ক্রয় করার জন্য যে আগাম নির্দেশ আসে সেই নির্দেশটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

৩.১০ সতর্কীকরণ সংস্থার কাঠামো এবং কার্যাবলীতে নীতিগত পরিবর্তন

সতর্কীকরণ যন্ত্রের কার্যাবলীর নীতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কয়েকটি বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হ'ল ঃ

ক) সরকারী কর্মীর বিপক্ষে উত্থাপিত অভিযোগগুলি অধিগ্রহণের পূর্বে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করা উচিত এবং একজন সরকারী কর্মচারীকে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ বিশ্লেষণ করার সুযোগ প্রদান করা উচিত। সরকারী স্তরে এমন অনেক বিষয়ের উপরই প্রয়োজনীয় তথ্য পেশ করার সুযোগের অভাবে অভিযুক্ত সরকারী কর্মীর কর্মজীবনে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়।

খ) অনেক সময় সতর্কীকরণ যন্ত্রটিকে নির্দোষ কর্মীর বিপক্ষে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফলে একজন কর্মীর চাকরি জীবনে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তাঁর চাকরি ক্ষেত্রে সুনাম নষ্ট হয়।

গ) অভিযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কীকরণ যন্ত্রটি প্রশাসনিক বিষয় এবং কার্যনির্বাহী বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে অক্ষম। এমন বহু কারিগরি সিদ্ধান্তের উপর সতর্কীকরণ আয়োগের অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ প্রযুক্তি-গত কাজে বাধার সৃষ্টি করে।

ঘ) কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থার মূল কাজ হ'ল পুলিশ পদাধিকারীগণকে উক্ত আয়োগের অন্তর্ভুক্ত করা এবং দুর্নীতিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত সরকারী কর্মীগণের শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কি ধরনের দুর্নীতির জন্য কি প্রকার শাস্তি প্রদান করা হবে উক্ত সংস্থাটি সেই বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়।

১৯৬৮-৬৯ সালে হিসাব নির্বাহী কমিটি (Estimate Committee) তার ৭৮তম বিবরণীতে নির্দেশ করে যে ভারতীয় অনুসন্ধান সংস্থা শুধুমাত্র সরকারী কর্মীর দুর্নীতিমূলক কার্যাবলীর অনুসন্ধান করে। অন্যদিকে ব্রিটেনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এফ.বি.আই. ডাকাতি, দুর্নীতিমূলক কাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি প্রভৃতির বিষয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখে। ভারতীয় অনুসন্ধান আয়োগ এই সকল কাজের দায়িত্ব সচেতনভাবে এড়িয়ে যায়। অল্পসংখ্যক পুলিশ আধিকারিক ছাড়া ভারতীয় অনুসন্ধান আয়োগের কর্মীবৃন্দকে পুলিশের নিম্নস্তরের কর্মীদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়। ফলে তাদের উপস্থিতি এবং নিম্নমানের অভিযোগ গ্রহণ করার স্পৃহা অনুসন্ধান আয়োগের সুনাম নষ্ট করে। সতর্কীকরণ যন্ত্রের বর্তমান কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন অত্যন্ত আবশ্যিক। ত্রুটিপূর্ণ অনুযোগের উপর নির্ভর করে সরকারী কর্মীর বিপক্ষে অভিযোগ অধিগ্রহণের দায়ে উক্ত সংস্থার সুনাম ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়।

অনেক সময়ই এই আয়োগের উপস্থিতি সরকারী কর্মীর সৎ এবং নির্ভীক মনোভাব নিয়ে কাজ করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে আরোপ করা অভিযোগের অনুসন্ধান দীর্ঘমেয়াদী হয় ফলে উক্ত অভিযুক্ত কর্মীর পদোন্নয়ন, বিদেশ ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ প্রভৃতি সকল সুযোগ সুবিধে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোনো সরকারী কর্মী অনুসন্ধানের পর নির্দোষ সাব্যস্ত হলে তাঁর উপর আরোপ করা বিধিনিষেধগুলি

যদিও তুলে নেওয়া হয়, কিন্তু তার হৃত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। বিপক্ষে আনা মিথ্যা মামলার জন্য কোনো রকম ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। সরকারী কর্মীর হাতে সতর্কীকরণ আয়োগের বিপক্ষে মোকাবিলারও কোনো পথনির্দেশ থাকে না। উক্ত রাষ্ট্রকৃত্যক এক্ষেত্রে সরকারের বিপক্ষে মামলা রুজু করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু এটি একটি সময় এবং ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার ফলে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ কদাচিৎ ঘটে। যদিও সতর্কীকরণ আয়োগ গঠন করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সরকারী কর্মীর দুর্নীতি বন্ধ করা, কিন্তু দেখা যায় উক্ত সংস্থার উপস্থিতি সরকারী কর্মীর নীতিবহির্ভূত বা বেআইনী কাজের পরিমাণ সীমিত করতে অক্ষম। আধুনিক কালে সরকারী কর্মী বেড়ে ওঠায় কেলেঙ্কারির হার উক্ত সংস্থারই অকৃতকার্যতার নিদর্শন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কারণগুলির প্রতিও দৃষ্টিনিক্ষেপ জরুরী।

৩.১১ সারাংশে

এই এককে ভারতবর্ষের সরকারী প্রশাসনে দুর্নীতি নিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের কার্যাবলী আলোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের আওতাভুক্ত সব বিভাগের কর্মচারী এই আয়োগের সতর্ক দৃষ্টির অধীনস্থ। যদিও এই আয়োগকে নানারকম জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, দুর্নীতি নিরোধক সংস্থা হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৩.১২ অনুশীলনী

১) কেন্দ্রীয় সতর্ককরণ আয়োগ কি ধরনের দায়িত্ব পালন করে?

২) প্রধান পরীক্ষক সংস্থার অতিরিক্ত দায়িত্বের ৭ দফা তালিকার ৪টি বিষয় উল্লেখ করুন।

৩) সান্থারাম (Santharam) কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য কি ছিল?

৪) কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ সংস্থা কিভাবে গঠিত হয়?

৫) কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ সংস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী খুব সংক্ষেপে লিখুন।

৬) কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ সংস্থার সীমাবদ্ধতার কারণ নির্দেশ করুন।

৭) কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ সংস্থা কি ধরনের অনুসন্ধান পরিচালনা করে?

৮) অনুসন্ধান-এর প্রতিবেদন এবং সুপারিশ কোথায় কিভাবে পেশ করা হয়?

৯) সতর্কীকরণ আয়োগ-এর যে বিশেষ ২৭টি দুর্নীতিমূলক কাজের তালিকা ওপরে দেওয়া হয়েছে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ ৫টি কাজের উল্লেখ করুন।

১০) অনুযোগ / অভিযোগ গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সতর্কীকরণ আয়োগের ভূমিকা খুব সংক্ষেপে লিখুন।

১১) সতর্কীকরণ সংস্থার বর্তমান কাঠামো এবং প্রক্রিয়া পরিবর্তনের নীতিগত প্রয়োজন-এর স্বপক্ষে দুটি যুক্তি দেখান।

৩.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

1) S. Maheswari, *Indian Administration;* New Delhi.

2) S. Maheswari, *Administrative Reform in India;* New Delhi.

3) *Indian Journal of Public Administration;* New Delhi; Selected Volumes.

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নুতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

–Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata - 700064 & Printed at Gita Printers, 51A, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009.